এমিল্ জোলা

সম্ভাবনার পথে

এমিল জোলা

Germinal-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ :

অশোক গুহ

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬২
প্রকাশক
বিপুল সাহা
ভারতী লাইব্রেরী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদপট
পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

বাঁধাই
ইস্ট এন্ড ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পাকিস্তান এজেন্ট
নওরোজ কিতাবিস্তান
৩৭, বাংলাবাজার
ঢাকা

তিন টাকা আট আনা

সম্ভাবনার পথে

দ্বিতীয় ভাগ

পঞ্চম খণ্ড

এক
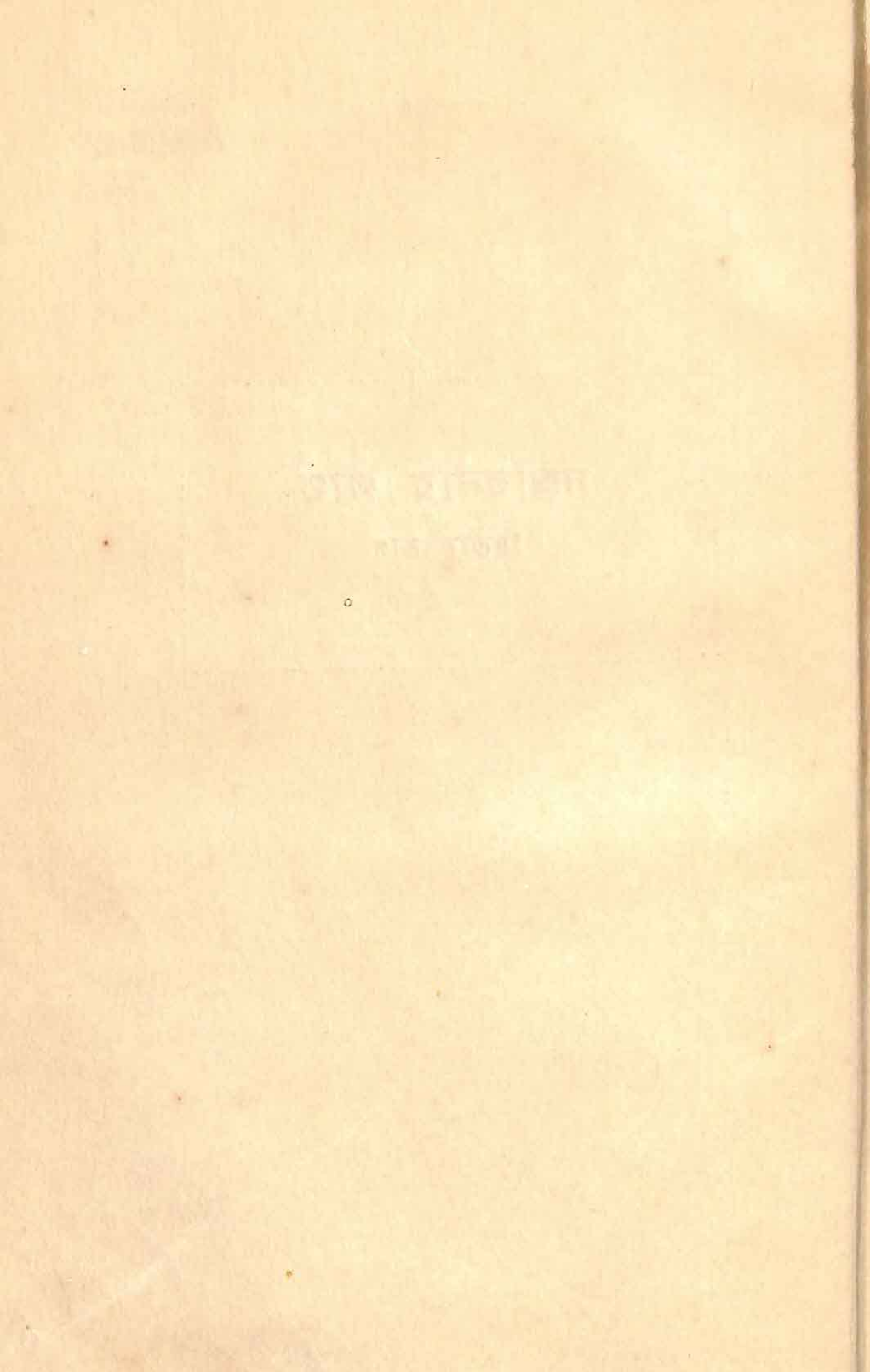
চারটে বাজল। চাঁদ অস্ত গেছে। রাত এখন ঘন আঁধার। দেনেউলি'র বাড়িতে সবাই ঘুমে বিভোর। পুরানো ইটের বাড়িটা বোবা, আঁধারময়। দরজা-জানালা বন্ধ। বাড়িটা একখানা ছন্নছাড়া বাগানের শেষপ্রান্তে—তার পরেই জাঁ-বার্তের খনির শুরু। অপর দিকে মুখিয়ে আছে ভান্দামের সড়ক। তিন কিলোমিটার দূরে বনের আড়ালে আর আছে একখানা বড়সড়ো গ্রাম।

দেনেউলি' আগের দিনটার কিছুটা সময় কাটিয়েছিলেন পিটের নীচে, তাই এখন তিনি ক্লান্ত; দেয়ালের দিকে মুখ করে নাক ডাকাচ্ছেন। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন, কেউ যেন তাকে ডাকছে। স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সত্যিই স্বর শুনতে পেলেন। জানালা দিলেন খুলে। একজন সর্দার এসেছে। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

কি ব্যাপার? শুধালেন।

আর কি কর্তা, হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে, আদ্ধেক লোক নাপাট জবাব দিয়েছে, কাজ করবে না। বাকি আদ্ধেককেও পিটে নাবতে দেবে না।

কথাটা যেন বুঝতে পারলেন না। এখনো মাথাটা ভারি, ঘুমে ভরা। বাইরের দুরন্ত শীত যেন তুষারধারার মতো এসে গায়ে লাগছে।

ওদের নাবতে বল, নাবিয়ে দাও! কোনরকমে বললেন তিনি।

ঘণ্টাখানের হ'ল হাঙ্গামা শুরু হয়েছে, সর্দার বলতে লাগল, তাই ভাবলাম —আপনাকে খপর দিই কর্তা। আপনার বাত ওরা হয়তো শুনবে।

বেশ, আমিই যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিলেন। এখন মাথাটা হালকা হয়েছে। তবে বড় উদ্বিগ্ন তিনি। এতক্ষণ তো বাড়িখানা ছিল নিঃসাড়, রাঁধুনী বা পরিচারক এখনো ওঠেনি। কিন্তু এরই মধ্যে, সিঁড়ির ওধারে ভয়ার্ত ফিসফিসানি শোনা

যাচ্ছে। তিনি দরজা খুলতেই তাঁর মেয়েদের কামরার দরজাটিও খুলে গেল। সাদা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে ওরা বেরিয়ে এল।

বাপি, কি হয়েছে?

বড় মেয়ে লুসির বয়েস বাইশের কোঠায় এরই মধ্যে এসে গেছে। লম্বা, তামাটে তার রং, আভিজাত্যও আছে আচারে-ব্যবহারে। আর ছোট জিনির সবে উনিশ বছর বয়েস—ছোটখাটো মেয়ে, স্বর্ণকেশী—সুশ্রী—সুন্দরী।

তিনি ওদের নিশ্চিন্ত করে দিলেন, এমন কিছু নয়। কতগুলো বাজে লোক ঘোঁট পাকিয়েছে আর কি। আমি যাই—গিয়ে দেখি—

কিন্তু ওরা চেঁচিয়ে উঠল, একটু গরম কিছু না খেয়ে তাঁকে যেতে দেবে না। কিছু খেয়ে না গেলে, অসুখ করে বাড়ি ফিরবেন। যেমন আখছার হয় তেমনি হবে, পেটের গোলমাল বাড়বে। তিনি মেয়েদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলেন, বললেন তাঁর তাড়া আছে।

জিনি গলা জড়িয়ে ধরে বললে, শোন বাপি, এক গেলাস অন্তত রম্ আর কয়েকখানা বিস্কুট মুখে দিয়ে যাও। যদি না খাও তো, আমি গলা জড়িয়ে ধরে রইলাম। আমাকে সুদ্ধ নিয়ে চল!

বাপকে রাজি হতে হ'ল। তবু ওজর-আপত্তি তুললেন, বিস্কুট নাকি তাঁর গলায় বেধে যায়। ওরা তাঁকে নিয়ে নীচতলায় এল। দুজনের হাতেই দুখানা মোম। খাবার ঘরে ওরা বাপকে পরিবেশন করতে লেগে গেল। একজন গেলাসে রম্ ঢেলে দিলে, আর-একজন ছুটল রান্নাঘরে বিস্কুট আনতে। ওরা যখন খুব ছোট তখন মা মারা যান। তখন থেকেই বাপের আদরে নিঃসঙ্গভাবে বেড়ে উঠেছে। একটু বা এলোমেলো হয়ে পড়েছে তাদের জীবনধারা। বড়টি তো থিয়েটারে যোগ দেবার স্বপ্নে ভরপুর; আর ছোটটি ছবি আঁকা নিয়ে পাগল। ছবি আঁকায় তার ঝোঁকও যথেষ্ট। অঙ্কন পদ্ধতিতেও আছে সাহস। কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে লোকসানি হতেই তারা ছাঁটাই করে দিয়েছে লোকজন। এমনি তো উড়নচণ্ডী, খরচে মেয়ে, কিন্তু হঠাৎ যেন ওরা একেবারে সংসারী, পাকা গৃহিণী হয়ে উঠেছে। হিসেবের খাতায় একটি পয়সাও গড়বড় হলে তারা টের পায়। যতই উড়নচণ্ডী হোক, এখন তারা টাকার থলেটার ফাঁসটা শক্ত করেই এঁটে রাখে, প্রতিটি পয়সার হিসেব নেয়—দোকানীদের সঙ্গে দরাদরি করে, নিজেদের পুরানো পোষাক অবিরাম অদল-বদল করে পরে। দারিদ্র্য বাড়ছে দিনের পর দিন, তবু ওরা সেই দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখছে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের মুখপাত দিয়ে। সত্যিই ওরা এ ব্যাপারে সফল হয়েছে।

লুসি বললে, খাও বাপি, খাও!

বাপ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন, কি যেন ভাবছেন। মেয়ে ভয় পেয়ে গেছে।

তাহলে ব্যাপারটা বেশ খারাপ। নইলে অমন গোমড়া হয়ে আছ কেন? আমাদের বল; আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব—আমাদের ঐ নিমন্ত্রণে না গেলেও চলবে।

আজ সকালের নিমন্ত্রণের কথাই সে বললে। কথা ছিল হানাবু-গিন্নী গাড়ি নিয়ে এসে প্রথমে সিসিলিকে তুলে নেবেন, তার পরে আসবেন ওদের নিতে। তার পরে ওরা মার্সিয়েনেয় গিয়ে ফোর্জের রেস্তরাঁয় দুপুরে সবাই

খাবেন। ম্যানেজার-ঘরনীই ওদের ভোজ দিচ্ছেন। আর এই সুযোগে কারখানা ব্লাস্টফার্নেস, গ্যাস-কয়লার চুল্লীগুলোও দেখে নেওয়া হবে।

জিনির পালা এবার। সে বললে, হাঁ, আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব বাপি।

রেগে উঠলেন বাপ।

চমৎকার! বলেছি তো কিছুই হয় নি। যাও এখন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো দুজনেই গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়। তার পর যেমন কথা আছে, নটার আগেই সেজেগুজে তৈরী হয়ে থেকো!

তিনি ওদের চুমু খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। ওরা শুনতে পেল, বাগানের বরফ-ঢাকা জমির উপর তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে।

জিনি সাবধানে রমের বোতলে ছিপি এঁটে দিলে, লুসি বিস্কুট তুলে রাখলে চাবি বন্ধ করে। ঘরখানা ফাঁকা, ঝকঝকে তক্‌তকে—দেখেই মনে হয় এখানে ভূরিভোজের আয়োজন নেই। শুধু খাবার টেবিলখানাই পাতা। তাড়াতাড়ি নীচে এসেছে, এই সুযোগে ওরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলে—রাতের কোন জিনিস পড়ে আছে কিনা টেবিলে। একখানা ঝাড়ন তোলা হয় নি বটে। এর জন্যে পরিচারক বকুনি খাবে। এবার ওরা উঠে এল উপরতলায়।

সবচেয়ে সোজা পথে চলেছেন দেনেউলিং—খিড়কির বাগানের এটা সরু পথ। তাঁর ভাগ্যের কথাই ভাবছেন। মঁতসু দিনেয়ার বেচে— লাখ টাকা তুলে নিলেন। দশগুণ করবারই তখন তাঁর স্বপ্ন—আজ তো সেই টাকাগুলো বরবাদ হতে বসেছে। এ যেন অবিরাম দুর্ভাগ্যের মিছিল। আগে বুঝতে পারেন নি। বহু টাকা ব্যয় হ'ল বিরাট মেরামতিতে। কয়লা তোলার কাজে অসম্ভব খরচ হতে লাগল—একেবারে নিঃস্ব করে দিলে—তার পরে এসেছে এই শিল্পসংকটের বিপর্যয়—যখন মুনাফা হতে শুরু হয়েছে—তখনি এল। যদি এখানেও ধর্মঘট শুরু হয়, তিনি উৎখাত হয়ে যাবেন। তিনি একটা ছোট্ট ফটক ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আলকাতরা-কালো অন্ধকারে কয়লা-কুঠী দেখা যায় না। ঘন ছায়াময় কুঠী। শুধু দু-একটা লণ্ঠনের ঝলসানিতে আঁচ করে নেওয়া যায়।

ভোরোর মতো জাঁ-বার্ত এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়, কিন্তু আহেলি বিলায়েত সাজসরঞ্জামে এখন পিটটি বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। ইঞ্জিনিয়াররা তো তাই-ই বলেন। শুধু পিটের মুখটা দেড় মিটার চওড়া আর সাতশো আট মিটার খাই করে দিয়েই তাঁরা খুশী হননি, একটা নতুন ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিন, নতুন 'কেজ'ও আমদানি করেছেন।

পুরোপুরি নতুন সাজসরঞ্জাম, আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বসানো। বাড়িগুলিতেও একটু স্থাপত্য-রচিত আমদানি হয়েছে। স্ক্রিনিং শেডে কার্নিসের ধারে ধারে নানা কারুকার্য; একটা আছে ঘড়ি-ঘর—উপরে উঠে এলে মনে হয় যেন নবজাগৃতি যুগের গির্জা—আছে মোজাইক-করা লাল আর কালো ইটের চিমনি। পাম্পটা এখন অন্য স্যাফটে বসানো হয়েছে। গ্যাস্তঁ-মারি পিটটা এখন এই কাজেই ব্যবহৃত। এই স্যাফট-এর ডানে বাঁয়ে জাঁ-বার্তের আরো দুটি নিঃসরণী পথ আছে—একটি দিয়ে স্টীম বার হয়ে যায়, আর একটিতে আছে মইগুলি।

সকালে সাভাল এসেছে সবার আগে—একেবারে তিনটের সময়। এসেই ভাই-বেরাদরদের মন বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। ওদের সে বোঝাচ্ছে, মঁতসুর সাথীদের মতোই ওরাও টবগাড়ি পিছু পাঁচ সেন্ট বাড়াবার দাবি তুলুক। ব্যাপারটা এমনি ঘটল, দেখতে-দেখতে চারশো মজুর শেড থেকে একেবারে পিটের মুখে এসে জমা হ'ল। চীৎকার, উঠছে আর সঙ্গে সঙ্গে নানা অঙ্গ-ভঙ্গী। হই হই ব্যাপার। যারা কাজ করতে রাজি, তারা বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খালি পা, শাবল বা গাঁইতি আছে হাতে; আর সবার পায়েও কাঠের জুতো, শীতের জন্যই কাঁধে ওভার-কোট জড়ানো। তারা স্যাফ্‌ট-এর মুখ জুড়ে আছে। সর্দাররা হই চই থামাতে ব্যস্ত, গলা ভেঙে গেছে। ওদের বুঝদার হতে বলছে, কেউ যদি পিটে নামতে চায়—বাধা দিতে বারণ করছে।

কিন্তু সাভাল ক্যাথেরিনকে দেখে রেগে গেল। ছুঁড়িটা ট্রাউসার আর কোর্তা পরে এসেছে, মাথার নীল টুপির আড়ালে চুল ঢাকা। সে তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে বারণ করেছিল, কিন্তু ছুঁড়িটা পেছু পেছু এসেছে। কাজ থেমে আছে দেখে ওর ভারি দুঃখ। সাভাল তো তাকে একটা পয়সা কখনো দেয় না, সে দুজনেরই রুজি চালায়—এখন যদি রোজগার বন্ধ হয়ে যায়—কি উপায় হবে? মার্সিয়েনের গণিকা-পল্লীর ভয় তাকে হানা দিলে। রুজি আর ডেরা হারিয়ে পিটের কুলি-কামিনরা গিয়ে তো শেষে ঐখানেই ওঠে।

তুই হেথায় মরতে এলি কেন? সে শুধালে।

ক্যাথেরিন বিব্রত; জানালে, তার তো আর উপরি আয়ের পথ নেই, তাই সে কাজে এসেছে।

ওরে কুত্তি, তাহলে মোর সাথে লাগতে এয়েছিস? যা, এখুনি ফিরে যা, নইলে পাছায় লাথ্ মারতে মারতে যেথা থেকে এয়েছিস, হেথায় ফেরত পেঠিয়ে দেব!

ভয়ে পেছু হটে গেল বটে, চলে গেল না। কি ব্যাপার দাঁড়ায় সে দেখতে চায়।

দেনেউলিঁ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। লণ্ঠনের আলো অস্পষ্ট হলেও তিনি একবার চোখ বুলিয়েই ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। ছায়াময় জনতার ভিড়। ওদের প্রতি লোকটাকেই তিনি চেনেন—ওরা মজুর, গাড়ি-চালিয়ে, কুলি-কামিন, কয়লা-চালুনী মেয়ের দল; এমন কি খালাসীরাও এসে জমা হয়েছে। বিরাট শেডে কাজ এখন বন্ধ; থেমে আছে। ইঞ্জিনের বাষ্প এখন মৃদু গুঞ্জন তুলছে—শিস দিচ্ছে; কেজগুলো তারের সঙ্গে স্থির হয়ে ঝুলছে। গাড়িগুলো পরিত্যক্ত—ধাতুর মেঝে জুড়ে পড়ে আছে। সবসুদ্ধ আটটা বাতিও মজুররা হাতে তুলে নিয়েছে কিনা সন্দেহ—বাতি-ঘরে জ্বলছে অন্য বাতিগুলি। কিন্তু তবু তিনি নিশ্চিত যে, তাঁর মুখের একটা কথাই যথেষ্ট, আবার চালু হবে মেহনতি জীবনধারা।

তিনি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কি হে, কি ব্যাপার? তোমরা এত চটে উঠলে কেন? আমাকে বল। দেখি, তোমাদের কথায় সায় দেওয়া যায় কি না।

নিজের খনির মজুরদের প্রতি তাঁর ব্যবহার পিতৃতুল্য, আবার কঠোর পরিশ্রমের দাবিও তিনি করেন। কর্তৃত্বের কড়া ভঙ্গী তাঁর, কিন্তু প্রথমে

তিনি বন্ধুর মতো আবেদনে বিস্ফূর্ত হয়ে পড়েন—সে আবেদনও যেন বিউগলের ভেঁপুর মতো চড়া। এতে কাজও হয়। প্রায়ই ওদের ভালবাসা আদায় করে নেন। তাঁর সাহস দেখে ওরা তাঁকে ভক্তিও করে। সব সময়েই তিনি কাটিং-এ ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। যখন কোন দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে পিট, তিনিই পয়লা বিপদের মুখে ছুটে যান। দু-দুবার এমনি ব্যাপার দেখা গেছে। ফায়ার-ড্যাম্প গেল ফেটে। নিতান্ত যারা ডাকাবুকো —তারাও পিছিয়ে এল। কিন্তু বগলের তলায় দড়ি বেঁধে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হ'ল পিটে।

তিনি বলে চললেন, তোমাদের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস, তার জন্যে অনুতাপ করতে হবে—এ বোধ হয় তোমরা চাও না? তোমরা তো জান, পুলিস এনে খনি পাহারা দেবার প্রস্তাব পর্যন্ত আমি বাতিল করে দিয়েছি।......তোমরা আস্তে আস্তে সব কথা বল......আমি শুনব।

সবাই নীরব; কেমন বিব্রত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। শেষে সাভাল দলের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়াল।

হুজুর, ব্যাপারটা এই। মোদের দাবি ফি-টবগাড়ি পিছু পাঁচ সেন্ট, এর কমে মোরা কাম করতে নারব।

শুনে বুঝি অবাক হলেন মঁসিয়ে দেনেউলিঁ।

কি, কি বললে! পাঁচ সেন্ট? কেন-এ দাবি কেন? আমি তো কাঠের ব্যাপার নিয়ে হৈ-হল্লা করি নি। আবার মঁতসু কোম্পানির মতো নয়া রেটও চালু করিনি।

তা আপনি করেন নি। কিন্তু মঁতসুর সাঙাৎদেরও তো হকের দাবি। নয়া রেট ওরা নেবে নি, পাঁচ সেন্ট চড়াতে হবে গাড়ি পিছু দর। নইলে এই চুক্তি মতো কাম হবে নি। মোরা আরো পাঁচ সেন্ট চাই। এই মোদের দাবি— তাই না সাথীরা?

বহু স্বরে সমর্থন উঠল; গোলমাল আবার শুরু হয়ে গেছে। আবার অঙ্গভঙ্গী সহকারে প্রচণ্ড হুমকি। ওরা এবার মালিকের কাছে এগিয়ে এল। এক ক্ষুদ্র ব্যূহ রচনা করেছে তাঁর চার দিকে।

দেনেউলি'র চোখে দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন; তাঁর হাত মুষ্টিবন্ধ। তিনি কড়া সরকারের পক্ষপাতী—নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন, কি জানি কাউকে হয়তো ঘাড় ধরে টেনেই আনবেন। কিন্তু তিনি তো চান না; যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনাই তাঁর কাম্য।

তোমরা পাঁচ সেন্ট চাও, আমি তোমাদের সঙ্গে একমত—তোমাদের এ দাবি ঠিকই। কিন্তু আমি দিতে অপারগ। যদি দাবি মেনে নিই—আমি শেষ হয়ে যাব। তোমাদের বোঝা উচিত—তোমাদের বাঁচাতে হলে আমাকে আগে বাঁচতে হবে। আমি তো প্রায় চরমে এসে ঠেকেছি—আর যদি মজুরি বাড়াই —তাহলে তো একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই —দুবছর আগে গত ধর্মঘটের সময়, আমি তোমাদের দাবি মেনে নিয়েছিলাম। তখন আমার সামর্থ ছিল। কিন্তু সেই যে মজুরির হার বাড়ল, তাতে সর্বনাশ কম হয় নি। এই দু'বছর ধরে তো তারই জের চলছে। শুধু টানা-পোড়েনই

সার হচ্ছে। আজ আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিতে রাজি। সামনের মাসে তোমাদের মজুরি কোত্থেকে জোটাব—তার ভাবনার চেয়ে এ ঢের ভাল।

সাভাল হেসে উঠল মালিকের মুখের উপর। তিনি কিন্তু তাঁর অবস্থা খোলসা করেই বললেন। তবু আর সবাই মুখ নীচু করে আছে। এক রোখা, অবিশ্বাসী মুখের সার—ওদের মগজে একথা ঢুকতে চায় না যে, মালিক ওদের চুষে-শুষে লাখো লাখো টাকা পুঁজি করছেন না।

কিন্তু দেনেউলিঁ তাঁর বক্তব্য বলতে লাগলেন। মঁতসুর বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের কথা শুরু করে দিলেন। ওরা তো তাঁকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চায়। তিনি নির্বোধ হলে তো এতদিনে তাঁকে শেষ করে ফেলত। প্রবল প্রতিযোগিতার হিড়িকে পড়ে তিনি খরচ কমাতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া জাঁ-বার্তের খাই বেশি বলে কয়লা তোলার খরচ আরো বেড়ে গেছে। তা সত্ত্বেও অসুবিধের নিরসন হয় নি। এখানকার কয়লার স্তরগুলি খুব পুরু। গত ধর্মঘটের পরে তিনি মজুরি বাড়াতেন না, কিন্তু মঁতসু কোম্পানির পথ তাঁকে নিতে হয়েছে। তাঁর ভয় ছিল—খনির মজুররা কাজ ছেড়ে মঁতসুতে গিয়ে ভিড়বে। তবে ভবিষ্যতের কথা বলে হুমকি দিলেন—যদি তিনি খনি বেচে দেন, তাহলে তাদের তো চমৎকার দশা হবে—তখন কোম্পানির জোয়াল এসে চাপবে তাদের কাঁধে। তিনি তো আর সুদূর অজ্ঞাত মন্দিরে সিংহাসনে বসে নেই। তিনি বখরাদারদের কেউ নন—যারা ম্যানেজারকে পুষে রেখে মানুষের গায়ের চামড়া তুলে নিচ্ছে। তাছাড়া মজুরদের কাছে অজ্ঞাত দেবতাও তিনি নন। তিনি মালিক বটে—তবে টাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো অনেক কিছু হারাবেন—তাঁর বুদ্ধি, স্বাস্থ্য—তাঁর গোটা জীবন চুরমার হয়ে যাবে। কাজ বন্ধ হওয়া মানে তো তাঁর মৃত্যু। তিনি মাল আমানত করে রাখেন না। মালের চাহিদাও তো মেটাতে হবে। তাছাড়া খনিতে যে টাকা ঢেলেছেন তা পড়ে থাকলে তাঁর চলবে না। কি করবেন? কি করে চাহিদা মেটাবেন? তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বিশ্বাস করে যে টাকা দিয়েছেন—তার সুদই বা দেবেন কোথা থেকে? তার মানে তাঁকে দেউলে হতে হবে।

তিনি এই বলে শেষ করলেন, তাহলে বুঝলে তো—তোমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। একটা লোক নিজের গলা কেটে ফেলতে পারে না—পারে কি? তোমাদের যদি পাঁচ সেন্টের দাবি মিটিয়ে দিই বা ধর্মঘট চালু রাখতে বলি—দুটোই আমার পক্ষে সমান। দুধার থেকেই আমার গলায় চোপ পড়বে।

তিনি চুপ করলেন। জনতার ভিতরে গুঞ্জন। কারো কারো দ্বিধা এসেছে। কেউবা স্যাফ্‌ট-এর দিকে এগিয়ে গেল।

একজন কুলির সর্দার বললে, সবাই আমরা খুশিমতো কাজ করতে পারি। তোমাদের মধ্যে কে-কে কাজ করতে চাও?

ক্যাথেরিনই সকলের প্রথমে এগিয়ে এল। কিন্তু সাভাল রেগে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল।

চীৎকার করছে:

মোরা সব্বাই এক। শুধু পাজির ধাড়িরাই তো সাঙাৎদের ফেলে পালায়। এর পরে সমঝোতা হওয়া অসম্ভব। আবার চীৎকার উঠল, সবাই আবার স্যাফ্‌ট-এর কাছ থেকে সরে এসেছে। দেয়ালে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে—চেপ্টে

যাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য মালিক একাই লড়তে চেষ্টা করলেন—এই অবাধ্য জনতাকে তাঁর মর্জি-মাফিক নুইয়ে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু দেখলেন—এ অসম্ভব। তাই আস্তে আস্তে সরে গেলেন। মাল-ওজনের আফিসে গিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। রুদ্ধশ্বাস—অক্ষমতার অনুভূতিতে ছেয়ে গেছে মন। কিছু ভাবতেও পারছেন না। সাভাল দেখা করতে রাজি হতে তিনি আর সবাইকে বিদায় দিলেন।

তোমরা চলে যাও।

দেনেউলিঁ জানতে চান, লোকটা কি চায়। তার প্রথম কথা শুনেই বুঝতে পারলেন—লোকটা দেমাকে আবার অন্য সাথীদের উপর হিংসেও তার যথেষ্ট। তাই তিনি তোষামোদ দিয়েই পয়লা শুরু করলেন। অবাক হয়ে বললেন যে, তাঁর মত এলেমদার মজুর কিনা নিজের ভবিষ্যৎ এমনি করে মাটি করে দিতে বসেছে। এমনভাবে বললেন যেন মনে হ'ল, বহুদিন ধরে ওর উপরেই তাঁর নেকনজর—দ্রুত পদোন্নতির কথাও তিনি ভেবে রেখেছেন। শেষে কথাটা এই ভাবেই শেষ করা হ'ল—পরে উনি তাকে কুলির সর্দারই করে দেবেন। সাভাল চুপ করে শুনলে। তার হাত প্রথম ছিল মুঠো করা, আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে এল। খুলে গেল। মগজে ফুট কাটছে জটিল সমস্যা—যদি সে ধর্মঘট চালু রাখতে চায়—তাহলে ঐ এতিয়েঁর চেলা হয়েই থাকবে; কিন্তু আর এক উচ্চ আশার পথ যে খুলে গেল—সে হবে উপরালাদের একজন। মুখ তার গর্বে ঝলমল করছে, মনে আনন্দ। নেশা লেগেছে। তাছাড়া ধর্মঘটী মজুরের দলের আশায় সে সকাল থেকে বসে আছে, কিন্তু তারা এখনো এল না; হয় তো কোন কারণে আসা হয়নি—হয়তো পুলিসই দিয়েছে বাধা। এই তো আত্মসমর্পণের প্রকৃষ্ট সময়। তবু সে মাথা নাড়ল। অসম্মতি জানালে। সে যে মেকি নয় তারই অভিনয় করে গেল, রাগে বুকে চাপড় মারতে লাগল। অবশেষে, মঁতসুর মজুরদের সঙ্গে তার যে বোঝাপড়া হয়েছিল তার উল্লেখ না করে সাথীদের বুঝিয়ে কাজে ফিরিয়ে আনবার ভার নিলে।

দেনেউলিঁ অন্তরালে রইলেন। সর্দাররা একপাশে সরে দাঁড়াল। ওরা শুনলে, সাভাল ঘন্টাখানেক ধরে রিসিভিং রুমের একটা গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বকে চলেছে, আলোচনা করছে। কেউ কেউ চীৎকার করে তাকে দুয়ো দিলে। একশো বিশজন লোক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। সাভাল তাদের যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়েছিল, তাই-ই মেনে চলবে এই তাদের পণ। এখন সাতটা বাজে। সবে ভোর হচ্ছে। পরিষ্কার দিন, উজ্জ্বল দিন। পিটে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। বন্ধ হয়েছিল কাজ, আবার চালু হয়ে গেল। ইঞ্জিন আবার চলছে, শব্দ উঠছে—তার একবার গুটিয়ে আনছে আবার খুলে খুলে দিচ্ছে। এবার সিগন্যালের ঝঙ্কারে নামা শুরু হয়ে গেল। কেজগুলি ভরতি। এই চোখের আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে, এই আবার উঠে আসছে। পিট তার কুলি আর কুলি-কামিনের বরাদ্দ গিলছে। টব-গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছে লোহার মেঝের উপর দিয়ে মজুরেরা। বজ্রের গর্জন উঠছে।

তুই এখানে কি করছিস রে? সাভাল চেঁচিয়ে উঠল। ক্যাথেরিন তার পালা-মতো নামবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। যাবি না, এখানে ঠুঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি!

ন'টা বাজল। হানাবু-গৃহিণী গাড়ি করে সিসিলিকে নিয়ে এসে হাজির হলেন। লুসি আর জিনি তৈরী হয়ে আছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাদের, যদিও পোষাকে অমন অদল-বদল হয়েছে বিশবার। নিগ্রেল গাড়ির সঙ্গে ঘোড়সওয়ার হয়ে এসেছে দেখে দেনেউলি অবাক হয়ে গেলেন। কি ব্যাপার, দলে তাহলে পুরুষও আছে! হানাবু-গৃহিণী বাৎল্য রসে গদগদ হয়ে জানালেন, সবাই তাঁকে ভয় দেখিয়েছে পথ নাকি বদলোকে ভরা—তাই একজন রক্ষক তাঁকে আনতে হ'ল। নিগ্রেল হাসতে-হাসতে জানালে, ভয় নেই। যারা একটু গলাবাজি করে, তাদেরই যা ভয়। নইলে গাড়ির জানালার ভিতর দিয়ে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারবে সে সাহসও ওদের নেই। নিজের সাফল্যে দেনেউলি গর্বিত। তাই তিনি ওদের কাছে জাঁ-বার্তের দাবিয়ে-দেওয়া অভ্যুত্থানের কথা বললেন। এখন তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। মেয়েরা গাড়িতে চড়ে বসল। গাড়ি ভান্দাম রোডের উপর থেমে আছে। দিনটি বেশ সুন্দর। সবাই খুশী হয়ে উঠল। কিন্তু ওরা জানে না—দূরে উন্মুক্ত প্রান্তরে উঠছে ধ্বনি; বাড়ছে। মানুষের মিছিল এগিয়ে আসছে, ওরা যদি মাটিতে কান পেতে রাখত, শুনতে পেত তাদের পদধ্বনি।

হানাবু-গৃহিণী আবার বললেন, সেই কথাই রইল। আপনি সন্ধ্যেয় গিয়ে মেয়েদের নিয়ে আসবেন আর আমাদের সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সারবেন। গ্রিগোয়ের-গিন্নী বলেছেন উনিও সিসিলিকে নিতে আসবেন।

আচ্ছা, আমি যাব, দেনেউলি উত্তর দিলেন।

গাড়ি ভান্দামের পথে ছুটে চলল। লুসি আর জিনি গাড়ি থেকে ঝুঁকে পড়ে তাদের বাপের দিকে তাকিয়ে হাসল। তিনি পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বীর নিগ্রেল গাড়ির চাকার পিছনে পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল।

বনের ভিতর দিয়ে ওঁরা এসে ভান্দাম-মার্সিয়েনে পড়লেন। লা-তার্তা-রেত-এর কাছে গাড়ি আসতেই জিনি হানাবু-গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি সবুজ পাহাড় দেখেছেন কিনা। তিনি পাঁচ বছর এ তল্লাটে আছেন, তবুও স্বীকার করতে হ'ল—এ পথে কখনো আসেন নি। তাই তাঁরা ঘুরে দেখতে চললেন। লা-তার্তারেত বনের এক প্রান্তে এক পরিত্যক্ত ভূমি—এখানে আগ্নেয়গিরি আছে, আর তার নীচে বহু শতাব্দী ধরে এক কয়লা-খনি তিলে তিলে জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে। রূপকথার যুগের এ ব্যাপার—স্থানীয় কুলিরা এ নিয়ে এক গল্পও বলে।

এই অভিশপ্ত ভূমিতে স্বর্গ থেকে একদিন আগুন ঝরে পড়েছিল মাটির গর্ভে। সেখানে বহুদিন আগে থেকে পিটের কুলি-কামিনদের ঘৃণ্য দেহদান চলছিল—মাটির বুক কালোয় কালো হয়ে উঠেছিল। আগুন এসে পড়ল, ওরা আর ওঠার সময়ও পেলে না। তাই আজ পর্যন্ত ঐ নরকে ওরা জ্বলে পুড়ে মরছে। গাঢ় লাল রঙের দগ্ধ পাথুরে মাটির উপর ভুস্‌ভুস্‌ করে জমে উঠল ফিটকিরির নিস্রাব—যেন কুষ্ঠের দগদগে ঘা দেখা দিলে। চৌচির পাথরের ফাটলে ফাটলে গন্ধক হলদে ফুলের মতো ফুটে উঠল। যাদের সাহস আছে তারা এই ফাটলের ভিতর দিয়ে রাতে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখেছে। তারা হলপ করে বলে, গহ্বরে তারা দেখেছে নরকের আগুন। গহ্বরের চুল্লিতে পাপীরা পুড়ে-পুড়ে মরছে। এখানে আলেয়া মাটির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় আর

গরম বাষ্প ওঠে। ওতে উচ্ছৃঙ্খল পাপের পূতিগন্ধ—নরকের বদবু ভেসে আসে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াময় হয়ে যায়। আর এইখানে, এই নরকে—লা-তার্তা-রেত-এর অভিশপ্ত প্রান্তরে এক অবাক কান্ড দেখা যায়। সবুজ পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে, তার উপরে চির সবুজ ঘাসের বন ছেয়ে যায়। বীচ গাছগুলির পাতা যেন চির-শ্যাম হয়ে দেখা দেয়। এখানকার মাঠে চির উর্বরতা ছড়িয়ে আছে। এ যেন এক উত্তাপ-সংরক্ষিত উদ্ভিদ গৃহ—নীচের জ্বলন্ত স্তরের উষ্ণতায় চির-উষ্ণ। এখানে বরফ জমতে পায় না। বনে গাছপালা এখন নিষ্পত্র-ছন্নছাড়া—কিন্তু তারই মাঝে এই ডিসেম্বরের দিনে উদ্ভিদের এক বিরাট সমারোহ এখানে ছড়িয়ে আছে। তুষারপাতে তার শিষ দলে-পিষে দিতে পারে নি।

গাড়ি এবার প্রান্তরের ভিতর দিয়ে চলল। নিগ্রেল এই রূপকথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। সে বুঝিয়ে দিলে—কয়লার গুঁড়োয় উত্তাল ঢেউয়ে পিটের গর্ভে আগুন লেগে যায়; যদি তখন তখন নেবাবার ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে সে আগুন আর নেবে না। চিরদিন জ্বলতে থাকে। সে বেলজিয়ামের একটা খনির উদাহরণ দিলে। একটা নদীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ওখানকার মানুষরা খনিতে বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। বলতে বলতে হঠাৎ সে থেমে গেল। কয়েক মিনিট ধরে সে দেখছে—দলে দলে মজুর গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। নিঃশব্দে ওরা চলেছে, বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে ট্যারচা চোখে। একপাশে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে। দলে ভারি হয়ে ওরা চলেছে। স্কার্পের ছোট সাঁকোর উপর গিয়ে গাড়ির গতি কমিয়ে দিতে হ'ল। ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে হাঁটি-হাঁটি চলতে লাগল গাড়ি। ওরা পথে এসে দলে দলে জটলা পাকাচ্ছে কেন—কি ব্যাপার? তরুণীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে। নিগ্রেলেরও আশঙ্কা বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে বুঝি কি-একটা বিপদ বেড়ে উঠছে, উত্তেজনা দেখা দিয়েছে মানুষের। মার্সিয়েনেয় পৌঁছে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সূর্য আকাশে, তারই নীচে ব্লাস্টফার্নেস আর কোক-কয়লার চিমনির সার উগরে দিচ্ছে ধোঁয়ার কালো মেঘ, আর সেই মেঘ ঝরাচ্ছে কালির স্রোত। চিরদিনের জন্য কালিঝুলি জমে জমে উঠছে।

দুই

জাঁ-বার্তে ক্যাথেরিন ঘন্টাখানেক হ'ল কাজ শুরু করেছে। টবগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে খালাসের জায়গা অবধি—আবার ফিরে আসছে। ঘামে জবজবে শরীর। সে একবার দাঁড়িয়ে পড়ে মুখের ঘাম মুছে নিলে।

কাটিং-এর নীচে, স্তরে গাঁইতি চালিয়ে চলেছে সাভাল আর তার সাথীরা। সাভাল হঠাৎ অবাক হয়ে গেল। কয়লার গুঁড়োয় কিছু দেখা যায় না।

এবে—কি হ'লরে?

ক্যাথেরিন হাঁক পেড়ে বললে, সে বুঝি গলে জল হয়ে যাবে গরমে। বুকের ধুকধুকানিও থেমে আসছে। সাভাল খেঁকিয়ে উঠল,

দ্যাখ্ বজ্জাতি করিস নে মাগী! শার্টটা খুলে নে!

সাতশো আট মিটার নীচে তারা এখন আছে। পিটের একেবারে উত্তর দিকে এই দেসির স্তর—পিটের তলা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। খনির এই দিকটার কথা বলতে গিয়ে মজুরদের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। ওরা ফিস-ফিসিয়ে কথা বলে। যেন এটা সাক্ষাৎ নরক। বেশির ভাগই মাথা নেড়ে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিতে চায়। কাঁথিগুলো এখান থেকে উত্তরমুখো চলে গেছে। গিয়ে পেঁাছেছে লা তারতারেৎ অবধি। অন্তরালের প্রজ্জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে গিয়ে মিশেছে। তাই উপরের পাথরে পাথরে ফিটকিরি স্রাবের ধারা জমাট বেঁধে আছে। ওরা যে-কাটিং-এ কাজ করছে সেখানে সব সময়েই ৪৫ ডিগ্রি উষ্ণ আবহাওয়া। ওরা এসে গেছে সেই অভিশপ্ত নগরীর নরকাগ্নির মধ্যে, এ অগ্নি প্রান্তরে যেতে যেতে পথিকরা ফাটলে ফাটলে দেখতে পায়। গন্ধক স্রাব খৎকারে ছিটিয়ে দেয় রন্ধ্রগুলি আর বিষাক্ত গ্যাসের দুর্গন্ধি ওঠে।

ক্যাথেরিন তার জামাটা খুলে ফেলেছে অনেক আগে। এবার তার দ্বিধা এসেছে। ট্রাউজারটাও ছেড়ে ফেলল। আদুল গা, হাত-পায়ে কিছু নেই—শুধু জামাটা পেঁচিয়ে নিয়েছে কোমরে—দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। আবার গাড়ি ঠেলা শুরু হয়ে গেল।

সে জোরেই বললে, এবার যাহোক তবু কাম করা যাবে।

নিঃশ্বাসরোধী উষ্ণতায় সে অস্থির। এখানে পাঁচদিন কাজ করছে। বার বার সে ভাবছে তার ছেলেবেলায় শোনা গল্প। পুরানো যুগের অসতী মেয়েরা এখনো লা তারতারেৎ-এর নীচে জ্বলে-পুড়ে মরছে। যে পাপের কথা উচ্চারণ করাও যায় না, সেই পাপের শাস্তি পাচ্ছে তারা। একথা ঠিক, সে বেশ বড় হয়েছে, এমন আজব গল্পে বিশ্বাসও করে না। কিন্তু যদি হঠাৎ ঐ দেয়াল ফুঁড়ে আগুনের তাওয়ার মতো গনগনে লাল চোখ দুটো আর জ্বলন্ত কয়লার মতো-কালো একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে—তখন কি হবে? ঐ ভেবেই ও সারা। সারা শরীর ঘামে জবজবে হয়ে উঠছে।

খালাসের জায়গায় মুখটা কয়লার স্তর থেকে আশী মিটার দূরে। ওখান থেকে আর-একটি কামিন আবার টব-গাড়িটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নেয়। তার পর আরো আশী মিটার ঠেলে নিয়ে গিয়ে উঁচু জায়গাটায় তুলে দেয়। খালাসী এবার আর-আর কাঁথির গাড়িগুলোর সঙ্গে এগুলোও খালাস করে দেয়।

কামিনটি ওকে শার্ট জড়ানো দেখে বললে, তুই তো দিব্যি আরামে আছিস লা! কামিনটির বয়েস তিরিশ খানেক হবে। হাড়সাড় বিধবা। কিন্তুক আমি তো নারলাম। ঐ যে উঁচুতে ছোঁড়ারা বসে আছে, ওরা বড় জ্বালায়।

জ্বালাক না! ক্যাথেরিন জবাব দিলে, ওদের আমি থোড়াই ডরাই! আমার বলে মরার হাল হয়েছে।

শূন্য গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলে গেল ক্যাথেরিন। নীচের কাঁথিতে অসহ্য গরম। লা তারতারেৎ কাছে বলে তো বটেই—তাছাড়া আরো কারণ আছে। একটা পরিত্যক্ত খাদের কাছ বরাবর চলে গেছে এই কাঁথিটা। এটা গ্যাস্তঁ মারির পরিত্যক্ত খাদ। এটারও খাই খুব। বছর দশেক আগে একটা বিস্ফোরণে কয়লার স্তরে আগুন ধরে যায়। একটা মাটির দেয়াল দিয়ে এটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। সে দেয়াল আবার বিপদের আশঙ্কায় বারবার মেরামতও করা হয়। কিন্তু এখনো এই দেয়ালের আড়ালে আগুন জ্বলছে। হাওয়া নেই ওখানে;

আগুন নিবে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু হয়তো অজানা হাওয়ার ঢেউ এখনো তাকে নিবে যেতে দেয়নি। বাঁচিয়ে রেখেছে। দশ বছর ধরে তো এমনিধারা জ্বলছে—মাটির দেয়াল তুঁদুরের মতোই আঁচে গনগনে গরম হয়ে উঠেছে। তাই যারা এ কাঁথিতে আসে তাদের মনে হয় আধো ভাজা হয়ে গেছে। এই দেয়ালের ধার ঘেঁষে একশো মিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে কয়লার টবগাড়ি আসা-যাওয়া করে, মাল খালাস হয়। ষাট ডিগ্রি এখানে গরম। তারই ভিতরে কাজ চলে।

দুবার আসা-যাওয়া করেই ক্যাথেরিনের মাথা ঘুরে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে, মূর্চ্ছাই যায় বুঝি। ভাগ্য ভাল, সুড়ঙ্গটা বেশ চওড়া আর যেতে আসতে কষ্টও হয় না। দোসিরি স্তরে এমন হওয়ার কথা নয়—এখানে স্তর খুব ঘন। এ তল্লাটে এমন স্তর আর নেই। স্তর এক মিটার নব্বই ইঞ্চি উঁচু; মজুররা দাঁড়িয়েই কাজ করতে পারে। কিন্তু এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া পেলে এর চেয়ে তারা পিঠভাঙা মেহন্নত করতেও রাজী।

ক্যাথেরিনের সাড়াশব্দ না পেয়ে সাভাল আবার গর্জে উঠল, তুই কি নিদ্ গেলি নাকিরে মাগী? উঃ, কি করে যে এই কুত্তির পয়দাটাকে জোটালাম—তাই ভাবি! ওরে মাগী, টব ভরে নিয়ে গা-গতর দিয়ে ঠেল্—বসে থাকিস নি!

স্তরের নীচে এসে গেছে ক্যাথেরিন। শ্যাবলে ভর দিয়ে সামলে নিচ্ছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বোকার মতো। হুকুম তামিল করার কথা বুঝি মনে নেই। আলোর লাল ঝলকে ওদের স্পষ্ট দেখা যায় না। ওরা পশুর মতোই উলঙ্গ, এত কালো, ঘাম আর কয়লার এমনি আস্তরণে আবৃত, তাদের নগ্নতায় ওর উদ্বেগ নেই। অন্ধকারে ওরা কাজ করে চলেছে। বাঁদরের মতো পিঠ সংকুচিত হয়ে আসছে, আবার ছড়িয়ে পড়ছে। এ যেন এক নারকীয় দৃশ্য। রক্তিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মেহন্নতে অধীর, মূর্চ্ছাহত। শুধু চারদিকে গুরুভার পতনের শব্দ আর গোঙানি। কিন্তু ওরা ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। গাঁইতি চলা বন্ধ হয়ে গেল। ট্রাউসার খুলে ফেলেছে বলে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দিলে।

কি গো—ঠাণ্ডা লাগবে যে! একটু সামলে-সুমলে চল!

তা আর কি সামলাবে সাঙাৎ। মাইরি কি পা-দুখানা! জবর!

সাভাল, ওকে দুজনে বখরা করে নেয়া যায়।

আহা একটু দেখি! আর একটু তোল না গা!

সাভাল ওদের হাসি-তামাশায় চটেনি। সে আবার খেঁকিয়ে উঠল,

এই তো মাগী চায়! ঠাট্টা-ইয়ার্কি পেলে আর কিছুর দরকার নেই। ও তো ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাল অবধি শুনবে।

বহু কষ্টে ক্যাথেরিন টব-গাড়ি ভরতি করে ঠেলে নিয়ে চলল। কাঁথি বেশ চওড়া, দুপাশের কপিকল দিয়ে ঝোলানো কাঠে লাগছে না তার গা, খালি পা নীচে পাতা রেলে বেধে যাচ্ছে চলতে গিয়ে। হয়তো বা এমনি করেই সে খুঁজছে অবলম্বন। আস্তে আস্তে সে চলেছে, তার হাতদুখানা অবশ, শিরদাঁড়া যেন ভেঙে যাচ্ছে। মাটির দেয়ালের কাছে সে এগিয়ে এল। আবার সেই আগুনের আঁচের জ্বালা শুরু হয়ে গেছে। ঘাম ঝরছে বড় বড় ফোঁটায়

গা দিয়ে। যেন ঝড় গর্ভে নিয়ে এল মেঘ—মুষলধারে ঢালছে বর্ষাধারা। তিন ভাগের এক ভাগ পথও যায়নি, তার গা দিয়ে দরদর ধারা নামল। সে বুঝি অন্ধ হয়ে গেছে—মরদগুলোর মতোই কালো কাদায় ঢেকে গেছে শরীর। তার আঁটো শার্টটা এখন এমন কালো, মনে হয় যেন কালিতে চুবোনো—কোমরের চামড়ার সঙ্গে লেপটে গেছে। উরু নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের উপর উঠে উঠে আসছে। এমন শক্ত করে এ'টে বসেছে নেংটির মতো যে, ওর ব্যথাই লাগছে। সে আবার থেমে পড়ল।

আজ তার হ'ল কি? এমনধারা তো আর কখনো হয় নি। ওর হাড় যেন তুলোর মতো নরম হয়ে গেছে। এই বদ হাওয়ারই দোষ। দূরে কাঁথিতে বাতাস চলাচল তেমন করে হচ্ছে না। তাই কয়লা থেকে যে গ্যাস ঝরনার মতো ঝরছে, নিঃশ্বাসে তাই টেনে নিচ্ছে সে। মাঝে মাঝে এমন জোরে ঝরছে গ্যাস যে, বাতিও আর জ্বলছে না। ফায়ার ড্যাম্পের কথা ছেড়ে দাও!—ওটার দিকে কারো নজরই থাকে না। স্তর থেকে হাওয়া এমনভাবে বয়ে আসে যে দিনের পর দিন ওরা তাই-ই নিঃশ্বাসে টেনে নেয়। ফায়ার-ড্যাম্পের কথা ভাবেই না। এই খারাপ হাওয়া তারা চেনে; খনির মজুররা একে বলে মরা হাওয়া। দম আটকে দেওয়া গ্যাস থাকে নীচে; আর উপরে হালকা গ্যাস। এই হালকা হাওয়ায় আগুন ধরে যায়, পিটের কাঁথিকে কাঁথি উড়ে যায়। অমন সারে-সারে মানুষকে একটা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। ছেলেবেলা থেকে এ গ্যাস সে অনেক গিলেছে, তাই আজ অস্বস্তি লাগতে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কানে বোঁ বোঁ শব্দ বাজছে, গলা জ্বলছে।

আর চলতে পারছে না। হতাশ হয়ে সে প্যাঁচানো শার্টটাও খুলে ফেলতে চাইলে। জ্বালাচ্ছে জামাটা, ওর ভাঁজগুলো যেন বি'ধছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছেটা চেপে রেখে আবার গাড়ি ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু আবার সটান দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। মনে মনে ভাবলে, কয়লা খালাসের জায়গাটার মুখে গিয়ে আবার জামা দিয়ে লজ্জা ঢাকবে। তাড়াতাড়ি সব কিছু খুলে ফেললে—শার্ট আর দড়িটা অবধি। যদি সাধ্যে কুলোত চামড়াই বুঝি ছি'ড়ে ফেলত। এখন সে ন্যাংটা হয়ে কাজে লেগে গেল—কত করুণ এ দৃশ্য—এই নগ্নতা! সে যেন পশুর শামিল হয়ে গেছে—কাদার ভিতর খুঁজছে তার খাবার। কালিঝুলি আর কাদায় পেট অবধি ডুবিয়ে সে গাড়ি-টানা ঘোড়ার মতো কাজ করে চলল। চার হাত-পায়ে ঠেলতে লাগল গাড়ি।

কিন্তু হতাশা এসে দেখা দিলে। ন্যাংটা হয়েও স্বস্তি নেই। আর সে কি খুলে ফেলবে? কানে ভোঁ যেন আরো জোরে বাজছে, তার কপাল যেন কে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে। বসে পড়ল ক্যাথেরিন। তার বাতিটা টব-গাড়ির কয়লার উপরে বসানো। সেটাও বুঝি নিবে যায়! এলোমেলো হয়ে গেছে চেতনা, তবু পলতেটা উসকে দিতে হবে এটা সে বুঝতে পারছে। দু-বার সে বাতিটা হাতে নিয়ে দেখতে গেল। দুবারই তুলে মাটিতে নিজের সুমুখে রাখতে গিয়ে দেখলে, তারই মতো বাতিরও দম যেন আটকে গেছে। হঠাৎ নিবেও গেল। সব কিছু এখন আঁধারের ঘূর্ণায় ঘুরছে। মগজে যেন ঘুরছে যাঁতা, হৃৎপিণ্ডে মূর্ছার অবসাদ নেমে এল। আর ধুকধুকানিও বুঝি শোনা যায় না। এক বিরাট ক্লান্তি এসে তাকে অবসন্ন করে ফেলেছে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-

গুলিকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। সে উবু হয়ে পড়ে গেল। নিঃশ্বাসরোধী গ্যাসে তার মৃত্যু আসন্ন। মাটির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে গ্যাস।

সাভাল আবার খেঁকিয়ে উঠল, হা ভগমান! ছুঁড়িটা আবার আরাম করতে লেগেছে!

কাটিং-এর উপর থেকে কান পেতে রইল। গাড়ির চাকার শব্দ নেই।

হেই ক্যাথেরিন—হেই ক্যাথি! ওরে কুঁড়ের ধাড়ী!

কাঁথির কালো গহ্বরে স্বর মিলিয়ে গেল। জবাব নেই।

তবে কি আমি তোকে রা কাড়াব রে মাগী!

সাড়া নেই। স্পন্দন নেই। শুধু মৃত্যুর মতো নীরবতা। সাভাল রেগে নেমে এল। বাতিটা নিয়ে এমন জোরে সে ছুটছে যে, প্রায় ওর দেহটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর কি! পথ জুড়ে পড়ে আছে মেয়েটা। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল সাভাল। কি হ'ল? এ কি ঘুমের ভান—মটকা মেরে পড়ে থাকা! সুবিধে পেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া? বাতিটা নামিয়ে ওর মুখ দেখতে গেল। বাতি নিবে যায় আর কি। সে তুলে আবার নামালে বাতি। এবার ব্যাপারটা বুঝেছে। ঐ বদ হাওয়ার কিছুটা গিলেছে ছুঁড়ি। রাগ জল হয়ে গেছে, বিপন্ন সাথীর প্রতি দরদ উথলে উঠছে। সে চেঁচিয়ে ক্যাথেরিনের পোষাক নিয়ে আসতে বললে। তারপর হতচেতন মেয়েটিকে তুলে নিলে কোলে —যতদূর সম্ভব উঁচুতেই তুলে ধরল। পোষাকে জড়িয়ে সে ছুটে চলল। এক হাতে তাকে ধরে আছে, আর এক হাতে দুটো বাতি। কাঁথির পর কাঁথি তাদের সুড়ঙ্গ মেলে আছে। সে তারই ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল। ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকছে—প্রান্তরের তুষারায়িত বাতাসে সে খুঁজছে জীবনের বীজ, এয়ার স্যাফট-এর ভিতর দিয়ে সে-বীজ ঝরে ঝরে পড়ছে। অবশেষে একটা ঝরনার ঝরঝর শব্দ শুনে সে থেমে পড়ল। পাথরের ভিতর দিয়ে বয়ে আসছে জলের ধারা। ঝরঝর ঝরছে। সে মাল-খালাসের কাঁথির সংযোগ স্থলে এসে-গেছে—এইখান থেকেই আগেকার দিনে গ্যাস্তঁ-মারি খাদে যাওয়া যেত। হাওয়া এখানে ঝড়ের বেগে বয়। সে তার প্রেমিকাকে কাঠে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলে, এখনো তার জ্ঞান হয় নি। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—এমন ঠাণ্ডা যে তার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি উঠছে।

ক্যাথি, দোহাই তোর! অমন করে না! অমন ন্যাকা-বোকা কেনে রে! উঠে বস, এইটে ভিজিয়ে জল এনে দিই।

ছুঁড়িটা যেন একেবারে অবশ। সে তাই ভয় পেল। তবু ওর গায়ের জামাটা ঝরনার জলে ভিজিয়ে এনে মুখ ধুইয়ে দিলে। এ যেন গোর-দেওয়া লাশ। ছিপছিপে দেহখানা এখনো পূর্ণতা পায় নি। যেন এখনো যৌবনে পেঁছতে তার দ্বিধা, লজ্জা। ওর কিশোরীর অনুন্নত স্তনে এবার কম্পন উঠল—ছেয়ে গেল তলপেট আর ঊরুর উপর দিয়ে। আহা বেচারী মেয়ে—অকালে কুমারীধর্ম হারিয়েছে। ফুল ফোটবার আগে কুঁড়িতেই তাকে দলে-পিষে দিয়ে গেছে পুরুষ। ও এবার চোখ মেলে জড়ানো স্বরে বললে,

ঠাণ্ডা লাগছে!

যাক্, কথা বলেছিস! যাক! সাভাল পরম স্বস্তি-বোধ করল।

সে আবার তাকে পোষাক পরিয়ে দিলে। শার্টটা সহজেই গলানো গেল;

কিন্তু ট্রাউসার পরানো নিয়েই মুশকিল। গাল দিয়ে উঠল সাভাল। মেয়েটা তো নিজে পরতে পারছে না। এখনো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সে কোথায়, কেন সে ন্যাংটো—বুঝতে পারছে না। এবার মনে হ'ল সরমে অভিভূত হয়ে গেল। সবকিছু খুলে ফেললে কি করে? ওকে শুধালে; ওকে এমনি উদোম কেউ দেখে ফেলেছে নাকি—একখানি রুমালও যে কোমরে নেই! সাভাল ঠাট্টা করলে, বানিয়ে গল্প বলে ওকে হাসাতে চেষ্টা করলে। বললে, সারবেঁধে সাঙাৎরা দাঁড়িয়ে ছিল—তার মাঝখান দিয়ে ও তাকে নিয়ে এসেছে। তা মন্দ কি! ওতো সাভালের কথায়ই উদোম হয়ে নিজের পাছা দেখিয়েছে। কিন্তু পরে সে জানালে, ওর পাছা চৌকো না গোল সাঙাৎরা তা জানেও না। ও এত জোরে ছুটে এসেছে, ওদের সাধ্য কি নজর দেয়!

উঃ, ঠান্ডায় যে মরে গেলাম! সাভাল পোষাক পরতে পরতে বললে।

ওর এত মায়াদয়া ক্যাথেরিন আর দেখেনি। এমনি একটা ভাল কথা শুনেছে তো, তার সঙ্গে সঙ্গে অমন দুটো গালাগাল খেয়েছে। আহা, মিলে-মিশে থাকতে পারলে কি ভালই না হোত! ক্লান্তিতে এলিয়ে দিয়েছে গা—দুর্বল বোধ করছে—তাই বুঝি আবেগ এমন করে দেখা দিয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে ক্যাথেরিন হেসে ফিসফিসিয়ে বললে,

একটা চুমা দেবে না!

সে চুমু খেল। ওরই পার্শে গা এলিয়ে দিল। যতক্ষণ না ক্যাথেরিন সুস্থ হয় ততক্ষণ এমনি থাকবে।

ক্যাথেরিন বলতে লাগল, জান, ওখানে অমন গাল পাড়ছিলে কেন—আমি তো চলতেই নারছিলাম। সাঁচ কথা—নারছিলাম। তোমাদের তো অতো কষ্ট নয়—জান, পথে যেন সেদ্ধ-করা গরম।

জানি—জানি—গাছতলায় তো আরো আরাম। আহা বেচারী, তোমার বুঝি ওখানে খুব ধকল হয়!

শুনে ক্যাথির সাহস বাড়ল।

উঃ, কি খারাব জায়গা গো! আজ তো আবার হাওয়া বদ হয়ে গেল। দেখবে গো দেখবে, আমি কুঁড়ের ধাড়ী কিনা! কাম করতে গেলে আবার কেউ ফাঁকি দেয় নাকি! তোমরা দাও নাকি? আমি তো প্রাণডা দেব, তবু ছাড়বনি।

বিরতি। সাভাল এক হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে নিজের দেহের কাছে টেনে এনেছে। ওকে ঠান্ডা থেকে সে বাঁচাতে চায়। ক্যাথেরিন এখন সুস্থ। কাজে ফিরে যাবার মত তাকত ওর বেড়েছে—কিন্তু তবু এই মধুর মুহূর্তটুকুকে সে জিইয়ে রাখতে চায়।

আস্তে আস্তে বললে, শুধু তুমি যদি মোর উপর একটু নেকনজর দাও, তাহলে তো বর্তে যাই গো!...হাঁগো, শুনি তো, যখন একজন আর-একজনকে ভালবাসে, তখন তো নাকি মানুষ সুখ পায়।

সে আস্তে আস্তে কাঁদছে।

সাভাল বাধা দিলে, তোকে তো ভালবাসি—খুব ভালবাসি! নইলে কি তোকে মোর সাথে নিয়ে আসতাম—না একসাথে থাকতাম!

ক্যাথেরিন শুধু মাথা নাড়ল। কত মানুষ মেয়েদের গ্রহণ করে শুধু তাদের

ব্যবহার করার জন্যে—তাদের সুখের কথা একবারও ভাবে না। চোখ ছাপিয়ে উষ্ণ অশ্রুধারা নামল; যদি তার ভাগ্যে অন্য কোন পুরুষ জুটতো, তাহলে হয়তো জীবনে মিলতো সুখ; কিন্তু এখন তো শুধু আছে হতাশা। এমনি করে তার কোমর জড়িয়ে ধরতো তার দুই বাহু। কখনো তো বাঁধন আলগা হোত না, খসে পড়ত না। আর-একজন—আর-একজন পুরুষ? তার অস্পষ্ট আকৃতি তার ভাবাবেগের গভীর থেকে উঠে এল। না, না! সে-পাঠতো শেষ হয়ে গেছে; এখন তো একে নিয়েই সে জীবন কাটাতে চায়, তবে ও অমন রুক্ষ না হয়ে উঠলেই ভাল হয়।

ও বললে, দেখ গা, মাঝে মাঝে এমনি একটু-আধটু যত্ন-আত্তি ক'রো।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আবার ওকে চুমু খেল সাভাল।

হাঁদা কোথাকার! আচ্ছা, আচ্ছা, কসম খাচ্ছি, তোর সাথে পোট-সোট করে থাকব। আমি খুব খারাপ লোক নই।

ক্যাথেরিন ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। চোখের জলের ভিতর দিয়ে হাসি ঝিলিক মেরে উঠল। হয়তো মরদ ঠিকই বলেছে। সুখী মেয়ে তো খুব কমই দেখা যায়। ওর কসম-খাওয়া ও বিশ্বাস করে না, তবু ওর ভাল ব্যবহারে ক্যাথেরিন আনন্দে গলে গেল। হা ভগবান, যদি এ-ভালবাসা চিরস্থায়ী হোত! আবার একে অপরের বাহুতে ধরা দিয়েছে, নিবিড় আলিঙ্গনে তারা আবদ্ধ। পায়ের শব্দ শুনে ওরা লাফিয়ে উঠে পড়ল। তিনজন সাথী ওদের যেতে দেখেছিল, তারা ব্যাপার কি দেখতে এসেছে।

ওরা একসঙ্গেই রওনা হ'ল। দশটা বাজে। একটা ছায়াঘন কোণ দেখে ওরা বসে গেল দুপুরের খাবার খেতে। তারপরে আবার আছে কয়লার স্তরে গলদঘর্ম মেহনতি। স্যান্ডউইচ শেষ করে ফ্লাস্ক থেকে কফি সবে পান করতে যাবে এমন সময় দূরে গোলমাল শুনে ওরা সশঙ্কিত হয়ে উঠল। কি হ'ল? আর-একটা দুর্ঘটনা নাকি? উঠে পড়ে ছুটল সবাই। খনির কুলি-কুলি-কামিন, কয়লা-চালুনি সবাই ছুটছে। কিন্তু কেউ জানে না কি হয়েছে। সবাই চেঁচাচ্ছে—একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। ভীতি ছড়িয়ে পড়ল সারা পিটে —ইয়ার্ডে ছায়ার সার সুড়ঙ্গ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। বাতিগুলো নেচে উঠছে অন্ধকারে। কোথায়—কি হ'ল? কেউ বলতে পারছে না কেন?

হঠাৎ একজন সর্দার চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে চলে গেল!

ওরা তার কেটে দিচ্ছে! তার কেটে দিচ্ছে!

এবার সত্যকার ভীতি বেড়ে উঠল। এক মহাত্রাসের সঞ্চার হ'ল। অন্ধকার কাঁথির ভিতরে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল মানুষ। বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। কেন তার কেটে দিচ্ছে? কে কাটছে। মানুষগুলো নীচে আছে —তবু কাটছে! এ তো ভয়ংকর ব্যাপার। অমানুষিক ব্যাপার!

আর-একজন সর্দারের স্বর শোনা গেল। আবার মিলিয়েও গেল।

ম'তসুর মজুররা তার কেটে দিচ্ছে। সবাই উপরে চল—উপরে চল!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্যাথেরিনকে থামতে বললে। উপরে উঠলে ম'তসুর সাথীদের সঙ্গে দেখা হবে, এই আশঙ্কায় ও যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। তাহলে ওরা এসেছে! আর ও তো ভেবেছিল, পুলিস ওদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। প্রথমে ভাবলে ফিরেই যাব—তারপর গ্যাস্ত'-মারি খাদের পথে বেরিয়ে

আসবে। কিন্তু ঐ স্যাফ্‌ট-টা এমন অকেজো হয়ে পড়ে আছে, এখন তো ওপথে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। সাভাল গাল পাড়লে। মনে তার দ্বিধা, তবু ভয় চেপে রেখে বার বার বললে—এমনি করে ছোটা তো বোকামি। মঁতসুর সাথীরা নিশ্চয়ই ওদের খনির তলায় ফেলে রাখবে না।

সর্দারের স্বর আবার শোনা গেল। সে ওদের কাছে এগিয়ে এল।

সবাই উপরে চল! মই বেয়ে ওঠ!

সাভালও সংগীদের দলে পড়ে ছুটে চলল। ক্যাথেরিনকে ঠেলছে। সে ছুটতে পারছে না বলে গাল দিচ্ছে। ও কি পিটের তলায় ঠায় উপোস করে মরতে চায়? মঁতসুর ঐ ডাকাতের দল তো মইও ভেঙে ফেলতে পারে—মানুষের উপরে ওঠার অপেক্ষা ওরা করবে না। এই ভয়ংকর ইঙ্গিতে ওরা পাগল হয়ে গেল। কাঁথির পর কাঁথিতে শুধু হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। একদল উন্মাদ ছুটেছে পাল্লা দিয়ে—কে প্রথমে পৌঁছবে, প্রথমে গিয়ে মইয়ে উঠবে এই তাদের প্রচেষ্টা। কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল—মই ভেঙে গেছে। কেউ আর উপরে উঠতে পারবে না। এবার ভয়ার্ত মানুষের সার এল খাদের মুখে—তারপরে স্যাফ্‌ট-এর উপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এ ওকে দলে পিষে দিচ্ছে—কে আগে উঠে পড়বে তারই প্রাণপণ প্রচেষ্টা। পিটের বুড়ো সইস, ঘোড়াগুলো আস্তাবলে রেখে এসে ওদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। পিটে সে রাতের পর রাত কাটায়—এই তার অভ্যেস। সে জানে—উঠতে সে পারবেই।

সাভাল ক্যাথেরিনকে বললে—দোহাই তোর, মোর আগে আগে যা। না পারলে ধরে তুলে নিতেও তো পারব।

তিন কিলোমিটার পথ ছুটে এসে ক্যাথেরিন হাঁফাচ্ছে। এখনো শূন্য তার দৃষ্টি, ঘামে জবজবে তার শরীর। সে নিজের অজান্তেই ভিড়ে মিশে গেল। ভিড় তাকে এদিক-সেদিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এবার সাভাল তার হাত ধরে টেনে রাখলে। হাত ভেঙেই ফেলে আর কি! ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল ক্যাথি; চোখ দিয়ে জল ঝরছে। এরই মধ্যে সাভাল শপথ ভুলে গেছে। আর তো ক্যাথি সুখ পাবে না।

চল্‌-রে চল্‌। সে গর্জে উঠল।

সাভাল তাকে বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছে। যদি সে সুমুখে যায়, তাকে টানা-হেঁচড়া করবে সাভাল, গাল দেবে। তাই সে বাধাই দিলে। সাথীদের উন্মত্ত বন্যা ওদের একপাশে ঠেলে ফেলে এগিয়ে চলল। স্যাফ্‌ট থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরছে, পিটের মুখখানা কেঁপে উঠছে জনতার পদতাড়নায়। এই জাঁ-বার্তে দু'বছর আগে—একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। তার ছিঁড়ে প'ড়ে কেজটা একেবারে তলায় খসে পড়ে। সেখানে দশ মিটার গভীর কাদা জলের গর্ত। সেই গর্তে পড়ে দু'জন মানুষ ডুবে মরে। সকলেরই সেকথা মনে আছে। এইখানে এসে ভিড় বাড়ালে ওদের জীবন শেষ হয়ে যাবে—একথা ওদের মনে প'ড়ে গেল।

সাভাল চেঁচিয়ে উঠল—ওরে হাঁদা, তার চেয়ে তুই মর—আমি জুড়োই!

ও উপরে উঠতে লাগল। ওর পিছনে ক্যাথেরিন।

তলা থেকে দিনের আলো অবধি একশো দু'খানা মই আছে। প্রতিটি মই

একটা সরু মাচার উপরে—মাচাটা সুড়ঙ্গের উপরের জায়গাটুকু দখল করে আছে। মাঝখানে তার খানিকটা চৌকো ফোকর—একটা মানুষ গলে যেতে পারে এমনি পরিসরের চ্যাপটা চোঙ যেন। উঁচু হবে প্রায় সাতশো মিটার। স্যাফ্‌ট-এর দেয়াল আর কেজের লাইনিং অবধি স্যাঁতসেঁতে কালো একটা পাইপ চলে গেছে—তারই উপরে একটার উপরে আর-একটা মই ধাপে ধাপে সাজানো। এ যেন এক বিরাট মিনার, একজন শক্তিশালী মানুষেরও এই ধাপ বেয়ে বেয়ে উঠতে ঝাড়া পঁচিশটি মিনিট লাগে। দুর্ঘটনা ছাড়া কখনো এই মইগুলি ব্যবহার করা হয় না।

প্রথমে তর তর করে উঠে যাচ্ছিল ক্যাথেরিন। তার খালি পা, কাঁথির কয়লার মেঝেয় চলে চলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পায়ে আর কয়লার ধারালো দাঁত লাগে না। তাই মই-এর লোহার শিক দিয়ে মজবুত-করা চৌকো ধাপগুলো বেয়ে উঠতে তার কোন কষ্টই হ'ল না। গাড়ি ঠেলে ঠেলে তার হাতেও পড়েছে কড়া, তাই উপরের ধাপগুলো সহজেই আঁকড়ে ধরে বেয়ে উঠতে লাগল। হাতের মুঠোয় চওড়া ধাপগুলো আঁকড়ে ধরতে না পারলেও অসুবিধে হ'ল না। এমনি ধারা উঠতে ভালই লাগছে; দুঃখ আর নেই। বরং খানিকটা যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এ এক অপ্রত্যাশিত আরোহণ। মানুষ-সাপের দল উঠছে বেয়ে বেয়ে উপরে—এক মইয়ে তিনজন করে মানুষ। দীর্ঘ-দীর্ঘ মই—যখন মাথাটা গিয়ে পেঁছবে দিনের আলোয়, কিন্তু লেজটা পিটের অন্ধকারে ঘষড়ে ঘষড়ে চলবে। এখনও অতটা উঁচুতে ওরা উঠতে পারেনি। যারা প্রথমে আছে তারা তিন ভাগের এক ভাগ উঠেছে। কারো মুখে রা নেই। শুধু খালি পায়ের ভোঁতা শব্দ উঠছে, আর বাতিগুলো চলন্ত তারার মতো নীচু থেকে উপর অবধি এক ক্রম-দীর্ঘায়ত সারে ছড়িয়ে আছে।

একটা ছোকরা মজুর মইয়ের ধাপ গুনছে। ক্যাথেরিনের ইচ্ছে হ'ল সেও গুনবে। ওরা পনেরো ধাপ উঠেছে—এখানে আছে একটা মাচা। হঠাৎ সাভালের পায়ে তার পা বেধে গেল। সে গাল পাড়ছে, হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। ক্রমে সমস্ত মানুষের সার থেমে পড়ল। ওরা এখন স্থির হয়ে আছে। কি ব্যাপার? কিছু হ'ল নাকি? সবাই আবার মুখ খুলেছে—উদ্বিগ্ন প্রশ্ন। পিট থেকে উঠে আসার পর উদ্বেগ ক্রমাগত বাড়ছে। দিনের আলোর কাছে যত আসছে, তত অজানা ভয় যেন ওদের ঘিরে ফেলছে। কে যেন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—মই ভেঙে গেছে, ওদের আবার নীচে নামতে হবে। সকলেই অধীর হয়ে উঠল—হয়তো এবার এক বিরাট শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আবার মুখে মুখে আর-একটা গুজব রটে গেল; একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন মাল-কাটা কুলি মই থেকে পা হড়কে পড়ে গেছে। কেউ সঠিক জানে না; হৈ-হল্লায় কিছু শোনাও দায়। ওরা কি সারারাত এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? কোন সঠিক খবর মিলল না। ওরা আবার উঠতে লাগল। তেমনি ধীর গতি, তেমনি কষ্ট সইছে। পা পড়ছে, বাতি দুলছে—নাচছে। হয়তো উপরের দিকেই মইগুলো ভেঙে গেছে। হয়তো কেন—তাই-ই হবে। নিশ্চয়ই তাই।

তিন নম্বর মাচা পার হয়ে চলেছে। মইয়ের নম্বর বত্রিশ। ক্যাথেরিনের হঠাৎ মনে হ'ল আর হাত পা নড়তে চায় না। প্রথমে যেন পিন আর ছুঁচ

ফোটার ব্যথা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এখন তো আর হাত দিয়ে কাঠ আর লোহা আঁকড়ে ধরা যায় না। হাতে অনুভূতি নেই। মাংসপেশিতে ব্যথা খুব কমই ছিল প্রথমে, এখন সে-ব্যথা চাগিয়ে উঠছে—কনকনানি-ঝনঝনানি শুরু হয়ে গেছে। মূর্ছা বুঝি ঘনিয়ে আসছে। বুড়ো-দাদু বনেমোরের গল্প মনে পড়ছে—তখনো মাচা হয়নি—খাড়া মই বেয়ে উঠতে হোত। দশ বছরের ছুঁড়িরা অবধি কয়লার ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে খাড়া মই বেয়ে উঠে যেত। একটু পা হড়কে গেলেই ঝুড়ি থেকে কয়লার চাঙড় পড়ত ছিটকে—আর অমনি নীচের অমন তিন-চারটে ছেলেমেয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরত।...শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে আর ধকল সামলাতে পারবে না। আর শেষ অবধি যাওয়াও হবে না।

আবার সবাই থেমে পড়ল। খানিকটা হাঁফ ছেড়ে নেবার সুবিধে হ'ল। কিন্তু উপর থেকে আসছে জোর গুজব। তাতে সে আরো হকচকিয়ে যাচ্ছে। তার উপরে আর নীচে মানুষদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ এখন আর সহজ স্বচ্ছন্দ নয়। কেমন যেন হাঁফ-ধরা; টেনে টেনে নিচ্ছে আর ফেলছে। এই অবিরাম আরোহণে সকলেরই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আর সবারই মতো তারও একই দশা। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার—অন্ধকারে মাথা ঝিমঝিম করছে, তার মাংস ছড়ে যাচ্ছে দেয়ালে লেগে, সে ক্ষেপে গেছে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কাঁপুনি লাগছে শরীরে, আর ঘর্মাক্ত শরীরের উপর পড়ছে বড় বড় ফোঁটায় জল। ওরা একটা মাচার কাছে এসেছে—এখানে জল ঝরছে অবিরল। জলের ফোঁটায় বাতি নিবে যেতে চায়।

সাভাল দু-দুবার ক্যাথেরিনকে কি বললে, কিন্তু কোন সাড়া নেই। কি করছে শয়তানী ছুঁড়ীটা? ওর জিভ কি খসে গেল নাকি? ও যে ঠিক আছে, একথা অন্তত বলবে তো! আধ ঘণ্টা ধরে চলেছে ওঠা—ধুঁকতে ধুঁকতে উঠছে। কিন্তু এই তো সবে উনষাট নম্বর মই। আরো তেতাল্লিশখানা বাকি। ক্যাথেরিন এবার কোনরকমে বললে, সে ঠিক উঠে যাচ্ছে। ও হাঁফিয়ে পড়েছে একথা বললে সাভাল ওকে কুঁড়ের ধাড়ী বলে গাল দিত। ধাপের লোহায় পা কেটে গেছে। মনে হচ্ছে বুঝি করাত-কাটা হচ্ছে। হাত ধাপ ধরতে যাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে—এই বুঝি ফসকে গেল। একে তো অবশ হাত, তার উপর ছড়েও গেছে। মুঠো করাও যায় না। কাঁধে ব্যথা—উরু দুখানার হাড়ও যেন নড়ে গেছে অবিরাম সঞ্চালনে। ভয় হয়—বুঝি হুমড়ি খেয়েই পড়বে। মইয়ের ধাপ কোথাও বা একটু-আধটু নড়বড়ে হয়ে আছে। ও দেখেই ভড়কে যাচ্ছে। বাহুর সমস্ত শক্তি উজাড় করে আঁকড়ে ধরছে। তারপর তলপেটে ভর করে কাঠের উপর দিয়ে বেয়ে-বেয়ে উঠে আসছে। পায়ের শব্দ এবার ডুবে গেল মানুষের ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে। এ যেন এক বিরাট গোঙানি। চিমনির দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিহত হয়ে দশগুণ বেড়ে গেল। গহবর থেকে উঠে আসছে, মিশে যাচ্ছে দিনের আলোয়। একটা গোঙানি শোনা গেল। ছড়িয়ে পড়ল খবর। একজন গাড়ি-ঠেলিয়ে কুলির একটা ধাপে লেগে মাথা চৌচির হয়ে গেছে।

ক্যাথেরিন উঠতে লাগল। মাচা পেরিয়ে এসেছে ওরা। জল ঝরা থেমে গেছে। কুয়াশায় তয়খানার মতো এখন আবহাওয়া—পুরানো জং-ধরা লোহা

আর ভিজে কাঠের গন্ধে বিষাক্ত। যন্ত্রচালিতের মত ক্যাথেরিন গুণে চলেছে অস্ফুট স্বরে। একাশি, বিরাশি, তিরাশি। এখনো উনিশখানা বাকি। এই সংখ্যা গণনার তালে তালে সে চলেছে। আর কোন তার খেয়াল নেই। উপরে তাকিয়ে দেখলে। বাতিগুলো ঘূর্ণি তুলে নাচছে। রক্ত যেন আর নেই শরীরে। মনে হয় মৃত্যু আসন্ন। একটা সামান্য নিঃশ্বাস ওকে পেড়ে ফেলতে পারে। আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে ব্যাপার। ওরা নীচ থেকে ওকে ঠেলছে। সমস্ত সার উঠে উঠে আসছে। রাগে ক্লান্তিতে ওরা অধীর—ওরা সূর্য দেখতে চায় এই ওদের মত্ত আশা।

যারা উপরে ছিল, তাদের কেউ কেউ বার হয়ে গেল। মই ভাঙেনি। কিন্তু ভাঙতে পারে—তখন নীচের দল আর উঠে আসতে পারবে না—এই আশঙ্কায় ওরা পাগল। অন্যেরা এখন খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছে বাইরে —আর তারা পড়ে আছে অন্ধকারে। আশঙ্কা গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে। আবার থেমে পড়তেই গালিগালাজ শুরু হয়ে গেল। ওরা উঠছে তো উঠছেই, এ-ওকে ঠেলছে—এ-ওর গায়ের উপর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। উপরে উঠতে হবে—আলো দেখতে হবে—এ তারই শেষ প্রচেষ্টা।

এবার ক্যাথেরিন পড়ে গেল। হতাশাময় আকুতিতে উচ্চারিত হ'ল সাভালের নাম। সাভাল শুনতে পেলে না। সেও লড়াই চালাচ্ছে। এক সঙ্গীর পাঁজরের হাড়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে গুঁতো মারছে—আরো আগে তাকে যেতে হবে। ক্যাথেরিন গড়িয়ে পড়ল, তাকে মাড়িয়ে দিয়ে চলেছে মানুষের সার। অচেতন হয়ে স্বপ্ন দেখছে—সেই আদ্যিকালের সে যেন এক মেয়ে—একটা ঝুড়ি থেকে এক চাঙড় কয়লা ছিটকে পড়ে তাকে পেড়ে ফেললে। সে পড়ে গেছে পিটের গহ্বরে। এ যেন স্প্যারো পাখীকে কেউ ঢিল ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর পাঁচখানা মই বাকি। প্রায় এক ঘণ্টা চলে গেছে। কি করে সে উপরে দিনের আলোয় উঠে এল তা জানে না। মানুষের কাঁধে কাঁধে, সরু সুড়ঙ্গের ঠেসাঠেসি ভিড়ের ঢেউয়ে সে উঠে এল। হঠাৎ এসে দাঁড়াল চোখ-ধাঁধানো রোদে। চীৎকার করছে জনতা, তাকে ঠাট্টা করছে।

তিন

ভোর হবার আগে থেকেই অধীর হয়ে উঠেছে সারা ধাওড়া। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে দূরে-দূরে—পথঘাট পেরিয়ে সারা তল্লাটে। কিন্তু যে বন্দোবস্ত ছিল, তেমনিভাবে যাওয়া হ'ল না। খবর ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত অঞ্চলে ঘোড়সওয়ার ফৌজ আর পুলিস টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, রাতেই নাকি দুয়াই থেকে ওরা এসে হাজির হয়েছে। রাসেনারকে সবাই দুষছে—ও-ই সাথীদের সঙ্গে বেইমানি করেছে, মঁসিয়ে হানাবুকে দিয়েছে খবর। একটা কয়লা-চালুনি মেয়ে তো দিব্যি গেলে বলেছে, সে হানাবুর চাকরকে তার নিয়ে আসতে দেখেছে অফিসে। হাতের মুঠো পাকিয়ে আবছা ভোরাই আলোয় মজুররা শার্সির ফাঁক দিয়ে দেখেছে টহলদারী ফৌজদের।

সাড়ে সাতটায় সূর্য উঠে এল আকাশে। আবার এক জোর গুজব, অধীর

মানুষদের খানিকটা নিশ্চিন্ত করে দিয়ে গেল। ফৌজি টহল মহড়া মাত্র। ধর্মঘট শুরু হবার পর থেকে লিল্-এর পুলিসের বড়কর্তার অনুরোধে সেনাপতি এমনি মহড়ার ঘন ঘন হুকুম দিচ্ছেন। ধর্মঘটী মজুররা এই উপর-ওয়ালাকে দেখতে পারে না, ওদের সঙ্গে বন্ধুভাবে সালিসি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন মঁতসুতে সপ্তাহে একবার ফৌজী-মহড়া দিয়ে ওদের ভয় দেখাচ্ছেন। ওরা তাঁকে তাই গাল পাড়ে, বলে তিনি ওদের ঠকিয়েছেন। ঘোড়সওয়ার ফৌজ আর পুলিস মার্সিয়েনের পথে নিঃশব্দে চলে গেল। শুধু ধাওড়া-গুলোর কান কালা করে দিয়ে গেল শক্ত মাটির উপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়ে। মজুররা এবার এই ভীরু পুলিসের কর্তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করলে। যখন ব্যাপারটা পাকিয়ে আসছে, তখনি ওরা চোঁচা দৌড় মারলে! বেলা ন'টা অবধি ওরা শান্তভাবে নিজেদের বাড়ির বাইরে বসে জটলা পাকাতে লাগল। দিল ওদের খোলসা। চেয়ে চেয়ে দেখল, ভীরু পুলিসের দল চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। মঁতসুর বাছা বাছা মানুষ এখনো বিছানায় গভীর ঘুমে বিভোর—পালকের বালিশে এখনো তাদের মাথা ডুবে আছে। হানাবু-গৃহিণীকে ম্যানেজারের কুঠি থেকে গাড়ি করে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল। মঁসিয়ে হানাবু বোধহয় এখন কাজে ব্যস্ত। সমস্ত বাড়িখানা তো চুপচাপ। মৃত। কোনও পিটে পাহারা নেই। বিপদের সময়ে এতো দূরদর্শিতার একান্ত অভাব। এমনি মূর্খতা তো হামেশাই দেখা যায়। সরকার এমনি ভুলই করে বসেন—এই ভুল শোধরাতে হলে কিছুটা তথ্যের খোঁজখবর রাখতে হয়। ন'টার সময় মজুররা ভান্দাম রোড ধরে চলল জমায়েতের উদ্দেশ্যে। আগের দিন রাতে বনের সভায় এটা ঠিক হয়েই ছিল।

এতিয়েঁ চট্ করে বুঝে নিলে ব্যাপরটা। জাঁ-বার্তের তিন হাজার সাথীকে সে নিজেদের দলে গুণে রেখেছে, কিন্তু তাদের সবাইকে সে পাবে না। অনেকেই ভেবেছে, বিক্ষোভ মিছিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার—এরই মধ্যে দুটো কি তিনটে দল রওনা হয়ে গেছে। ওদের রাশ যদি সে এখন না টানে, তাহলে ক্ষতিই হবে। প্রায় একশোজন ধর্মঘটী ভোর হবার আগেই রওনা হয়ে গেছে, ওরা এখন বনে বীচ গাছের তলায় আর-সকলের জন্য বসে আছে। সুভেরিনের কাছে ও পরামর্শ চাইতে গেল; সে মাথা নাড়লে। বললে, দশজন লোক একগাদা লোকের ভিড়ের চেয়ে ভাল। তারপর বই পড়তে বসে গেল। এ ব্যাপারে ও থাকতে চায় না। ব্যাপারটা বুঝি ভাবাবেগেই পরিণত হবে—মঁতসু-দাহনের সোজা উপায়টা নিলেই তো হোত। এতিয়েঁ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে যেতে-যেতে দেখলে, রাসেনার বসে আছে আগুনের কুণ্ডের পাশে। ফ্যাকাশে ওর মুখ। ওর বৌয়ের তেমনি কালো পোষাক পরা। স্বামীর উপর চড়াও হয়ে মিঠিয়ে-মিঠিয়ে গাল দিচ্ছে।

মেয়ুর মত হচ্ছে এইঃ ওরা ওদের জবান ঠিক রাখবে। এমনিধারা জমায়ত মানেই হচ্ছে পবিত্র জিনিস। কিন্তু এক রাতেই সবাই কেমন যেন জুড়িয়ে গেছে। তার নিজেরও আশংকা—একটা হাঙ্গামা হবেই। তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে, সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে সাথীদের ঠিকমত চালানো। মেয়ু-বৌও স্বামীর কথায় সায় দিলে। এতিয়েঁ উৎসাহভরে বললে, বিপ্লবী পন্থা নেওয়া দরকার—কিন্তু কারো জীবন হানি যেন না হয়। রওনা হবার আগে তার ভাগের

রুটি সে খেতে চাইলে না। এক বোতল জিনও ছিল। সে শুধু তিন গেলাস পান করে নিলে পর-পর। ওজুহাত দেখালে—ঠাণ্ডায় শরীর গরম রাখাই তার উদ্দেশ্য। এমন কি একটা টিনে ভরতি করেও খানিকটা জিন নিয়ে নিলে। আলঝির ঘরদোর ছেলেপুলে তত্ত্বাতলাশি করবে। বুড়ো-দাদুর কাল হেঁটে এসে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। সে তাই বিছানায়ই শুয়ে আছে।

দলবেঁধে সবাই বেরিয়ে পড়ল। জাঁলিন বহুক্ষণ হ'ল উধাও হয়ে গেছে। মেয়ু আর তার বৌ ম'তসুর দিকে ভিন্নপথে চলল। এতিয়েঁ গেল বনের দিকে —ওখানে সাথীদের সঙ্গে দেখা হবে। পথে একদল মেয়ের সঙ্গে দেখা, তাদের মধ্যে ব্রুল-বুড়ী আর লেভাক-বৌকে সে দেখেই চিনে ফেললে। ওরা মিছিল করে চলেছে—যেতে যেতে মোকে-ছুঁড়ির দেওয়া বাদামভাজা চাকুম-চুকুম চিবুচ্ছে। খোসাসুদ্ধই গিলে খাচ্ছে—তবু তো পেটে কিছু ওদের পড়ল। এতিয়েঁ বনে এসে কাউকে পেলে না। ওরা এরই মধ্যে জাঁ-বার্তে চলে গেছে। সে জোর কদমে ছুটে পিটে এসে হাজির হ'ল। এসে দেখে লেভাক আর শ'খানেক মজুর তখন হুড়মুড় করে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছে। চারদিক থেকে আসছে মজুরের দল। মেয়ুরা আসছে সদর সড়ক ধরে, মেয়েরা আসছে মাঠ ভেঙে। পিলপিল করে আসছে—ছত্রভঙ্গ তারা—তাদের নেতা নেই। হাতিয়ার নেই। বন্যার মতো স্বচ্ছন্দ ধারায় তারা ছেয়ে পড়ছে, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে। এতিয়েঁ জাঁলিনকে একটা সাঁকোর কাছে দেখতে পেল। সে বসেছে সামনের আসনের দর্শক হয়ে। সে পা চালিয়ে দিলে, জনতার পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়াল। সবসুদ্ধ এসেছে মাত্র তিনশো মজুর।

ভিড়ের স্রোত অবরুদ্ধ। মঁসিয়ে দেনেউলিঁ এসে দাঁড়িয়েছেন সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে। এই সিঁড়ি দিয়ে রিসিভিং রুমে যাওয়া যায়।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—কি চাও তোমরা ?

গাড়ি বিদায় দিয়ে তিনি এসেছেন। মেয়েরা হাসছিল আর হাত নাড়ছিল। অস্বস্তি নিয়েই ফিরেছেন পিটে। কিন্তু সবকিছুই ঠিক আছে; মজুররা নীচে নেমেছে, গাড়ি গাড়ি মাল আমদানি হচ্ছে উপরে। আবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সর্দারের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, এমন সময় এই কাণ্ড! খবর এল ধর্মঘটীরা এসে পড়েছে। স্ক্রীনিং শেডের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ক্রমাগত বাড়ছে জনতার ঢেউ—পার্ক ভরে গেছে। নিজের অক্ষমতাটাই যেন এবার বড় হয়ে উঠল তাঁর কাছে। কি করে এই কয়লা-কুঠি রক্ষা করবেন ? এটা তো চারদিকে খোলা। ডাক দিলে বিশজন মজুর এসে তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারে। তিনি তো গেছেন।

কি চাও তোমরা ? অবদমিত ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে আবার বলে উঠলেন। নিজের সর্বনাশকে বুঝি সাহস করে মেনে নিতে চাইছেন।

ঠেলাঠেলি, তর্জন-গর্জন শুরু হয়ে গেল জনতার ভিড়ে। এতিয়েঁ এবার এগিয়ে এসে বললে,

আমরা আপনার ক্ষতি করতে আসিনি। কিন্তু কাজ তো সব জায়গায় থামিয়ে দিতে হবে।

দেনেউলিঁ ওকে বোকা ঠাওরালেন।

তার মানে, আমার পিটে কাজ বন্ধ করে দিয়ে আমার ভাল করতে এসেছ ?
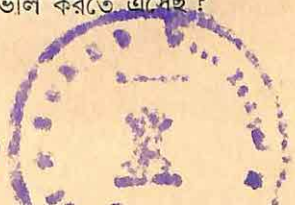
এর চেয়ে সোজা আমার পিঠ তাগ্ করে বন্দুক ছুঁড়লেই হোত। হাঁ, আমার লোকজন খনির ভিতরেই আছে, ওরা উপরে উঠে আসবে না। অবশ্য যদি আমাকে আগে খুন করে ফেল সে আলাদা কথা!

তার স্পষ্ট কথায় শোরগোল পড়ে গেল। মেয়ু লেভাককে টেনে রাখলে। সে তো একটা-কিছু করবে বলেই ছুটে যাচ্ছিল। এতিয়েং এদিকে আলোচনা শুরু করে দিলে। সে দেনেউলিংকে বোঝালে—তাদের এই ধর্মঘট সংগত। তাদের বিপ্লবী কার্যপদ্ধতিরই পরিচায়ক। কিন্তু মালিক জবাব দিলেন—সবারই কাজ করবার দাবি আছে। তাছাড়া, এ তো নিছক মূর্খতা। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে চান না। তিনি খনির মালিক। শুধু তাঁর আপসোস, এখানে জন চারেক পুলিস নেই যে এই ভিড় ভাগিয়ে দেয়।

এ আমারই দোষ; আমার দোষেই এমন হ'ল। তোমাদের মতো মানুষের উপরে জোর-জুলুম করাটাই সেরা যুক্তি। সরকার তো ভাবেন, তোমাদের তোয়াজ করে দাবি-দাওয়া মিটিয়েই কিনে ফেলবেন। সরকার তোমাদের হাতে হাতিয়ার তুলে দিন, তোমরাই সেই হাতিয়ার দিয়ে সরকারকে চুরমার করে দেবে।

এতিয়েং রাগে কাঁপছে, তবু সে সংযত হয়েই রইল। আস্তে আস্তে বললে,

আমি বলছি—আপনি ওঁদের উপরে উঠে আসতে বলুন! আমার সঙ্গীরা কি করে বসবে—তার জন্যে আমি দায়ী হতে চাই না। আপনি সর্বনাশ করবেন না!

না! আমাকে একা থাকতে দাও। তোমাকে আমি চিনি না! তুমি আমার খনির লোক নও। আমার সঙ্গে তোমার বিবাদ নেই। এমনি করে তো ডাকাতরাই সারা তল্লাটে লুঠ করে বেড়ায়।

উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁর স্বর ডুবে গেল। মেয়েরা গালি-গালাজ করছে। কিন্তু তবু তিনি অচল, অটল, তার সংযত সুশৃংখলতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে স্বস্তি বোধ করছেন। যখন সর্বনাশই হবে, তখন ভীরুর মত ধরতাই বুলি কপচে লাভ কি! ওদের ভিড় বাড়ছে। প্রায় পাঁচশো লোক দরজার দিকে ছুটে আসছে। সর্দার যদি তাঁকে জোর করে টেনে না আনতো, তিনি হয় তো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতেন।

দোহাই কর্তা, ওরা ঢালাও খুন-খারাবি চালাবে! মিছি মিছি মানুষ-গুলোকে খুন করিয়ে ফায়দা কি?

দেনেউলিং তবু হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন, বাকবিতণ্ডা চলছে। জনতাকে উদ্দেশ্য করে শেষ কথা জানালেন ঃ

তোমরা ডাকাত! আবার আমরা যখন শক্তিশালী হয়ে উঠব, তখন বুঝবে!

ওরা ওঁকে টেনে নিয়ে গেল। ভিড়ের প্রথম সার এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিঁড়ির উপরে। রেলিং দুমড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা ঠেলাঠেলি করছে, চেঁচাচ্ছে, পুরুষদের আগে ঠেলে দিচ্ছে। দরজায় খিল নেই, শুধু তালা বন্ধ। তাই খুলেও গেল। ধেয়ে এল জনতা। কিন্তু সিঁড়িটা খুবই সরু, এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বহুক্ষণ লাগত—কিন্তু আক্রমণকারীদের পিছনের দল ঢোকার পথ

খুঁজতে অন্য দিকে ছুটল। এবার চারদিক থেকে ওরা ধেয়ে এল—শেড থেকে, স্ক্রিনিং শেড থেকে, বয়লার ঘর থেকে। পাঁচ মিনিটের ভিতরে সারা পিট তাদের দখলে এল। প্রতি তলায় ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় জমিয়েছে, ক্রুদ্ধ ওদের অঙ্গভঙ্গী, তীক্ষ্ণ ওদের চীৎকার। মালিক রুখে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তাকে ওরা হারিয়ে দিয়েছে। জয়ের উল্লাসে ওরা মত্ত—মত্ত জনতা।

মেয়ু ভয় পেয়ে এগিয়ে এসে এতিয়েংকে বললে,

দেখ বাপু, ওনাকে যেন খুন ক'রে না ফেলে!

এতিয়েংও ছুটেছিল, কিন্তু যখন সে বুঝলে মালিক সর্দারদের কামরায় প্রতিরোধ প্রাকার গড়ে বসে আছেন, সে বললে,

তা যদি হয়ই, আমাদের কি দোষ! অমন খ্যাপা লোকের তো অমনি দশাই হয়!

কিন্তু তবু সে উদ্বিগ্ন। এখনো তার রাগ চড়েনি, তাই জনতার এই খ্যাপামি ওকে পেয়ে বসেনি। তার নেতৃত্বের গর্বও আহত, তার আওতার বাইরে চলে গেছে ভিড়। তারা যা-তা করে বেড়াচ্ছে—গণমানসের বিবেচনা তারা হারিয়ে বসে আছে। অথচ তার তো ছক আলাদাই ছিল। সে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বৃথা চেষ্টা করলে। বার বার জানালে, অনর্থক ধ্বংস করে তারা যেন শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি না করে। বুল-বুড়ী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বয়লার ঘরে চল্—চল্ বয়লার-ঘরে। চুল্লিগুলো নিবিয়ে দে!

লেভাক একখানা উকো পেয়ে গেছে। সেখানা তলোয়ারের মতো দুলিয়ে চীৎকার করে উঠল। জনতার গর্জন ছাপিয়ে উঠল তার স্বর ঃ—

তার কেটে ফেল—তার কেটে ফেল!

সবাই যেন তারই সুরে সুর মেলাচ্ছে, মন্ত্র পড়ছে। শুধু এতিয়েং আর মেয়ুই জানাচ্ছে প্রতিবাদ। ঘন জনতার গর্জনের ভিতরে উন্মাদের মত চীৎকার করছে তারা, কিন্তু ওদের থামানো তো যায় না। অনেক করে এতিয়েং বলে উঠল,

কিন্তু নীচে যে মানুষ আছে, সাঙাৎরা?

গর্জন বেড়ে চলেছে, চারদিক থেকে উঠছে জবাবের সোরগোল।

ভালই হবে, ওরা নীচে গেল কেন। বেইমানদের ঠিক সাজা হবে! ওরা হোথায় থাকুক, পচে-গলে মরুক!...তাছাড়া মই তো আছে।

মইয়ের কথা মনে পড়ায় ওরা আরো খেপে গেল। এতিয়েংর মনে হ'ল—ওদের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আরো বড় সর্বনাশের কথা ভেবে ও ছুটে গেল ইঞ্জিনঘরে। কেজগুলোকে অন্তত উপরে তুলে রাখবে, যদি তার কাটা হয়, কেজগুলো পড়ে গিয়ে মজুরদের দলে-পিষে দেবে তাদের বিরাট চাপে। ইঞ্জিনম্যান উধাও। উপরের আর ক'টি মজুরও বেপাত্তা। সে নিজেই স্টার্ট দেওয়ার হাতলটা চেপে ধরে ঠেলে দিলে। লেভাক আর দু'জন মজুর উঠে আসছে কপিকলে আটকানো ধাতুর খাঁচাটার উপর। কেজগুলো আঙটায় সবে আটকে রাখা হয়েছে, এমন সময় ইস্পাতের উপর উকোর ঘস্‌ঘস্ শব্দ শুরু হয়ে গেল। সবাই চুপচাপ। শব্দে সারা পিট ভরে গেছে। সবাই তাকাচ্ছে উপরে, আবেগভরে শুনছে। মেয়ু আছে পয়লা সারে। এক যেন পাশব উল্লাস দেখা দিয়েছে তার। ঐ উকোর হিংস্র দাঁত ওদের মুক্তি দেবে

যুগার্জিত পাপ থেকে—এই দুর্ভোগের অন্ধকূপ থেকে তাদের উদ্ধার করে আনবে ঐ তারের বন্ধন কেটে ফেলে—তারা তো আর কখনো নীচে নামবে না।

ব্রুল-বুড়ী সিঁড়ি বেয়ে মিলিয়ে গেল। সে চেঁচাচ্ছে—

বয়লার ঘরে চল্—বয়লার ঘরে চল্!

আর আর মেয়েরাও তার সঙ্গে ছুটে চলল। মেয়ু-বৌও ছুটল। সবকিছু ভেঙেচুরে না দেয় দেখতে হবে—বাধা দিতে হবে। তার স্বামীর মতো সেও ওদের বোঝাতে শুরু করে দিলে। ওদের মধ্যে সব চেয়ে মাথা ঠাণ্ডা তার। এ তো জনগণেরই সম্পত্তি—এগুলো না ভেঙেও তারা তাদের দাবির জিগির তুলতে পারে। কিন্তু বয়লার-ঘরে গিয়ে দেখলে, মেয়েরা এরই মধ্যে খালাসী দুটোকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর ব্রুল-বুড়ী একটা মস্ত শাবল নিয়ে একটা চুল্লির কাছে গিয়ে কয়লাগুলো ফেলে ফেলে দিচ্ছে। গনগনে রাঙা কয়লা ছড়িয়ে পড়ছে ইটের মেঝের। কালো ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে চারদিক। পাঁচটা বয়লারের দশটা চুল্লী। মেয়েরা কাজে লেগে গেল। লেভাক-বৌ দু'হাত দিয়ে শাবল চালাচ্ছে। মোকে-ছুঁড়ি হাঁটু অবধি তুলে নিয়েছে পোষাক, আগুন না ধরে যায় তাই সে হুঁশিয়ার হয়ে আছে। সবাই আগুনের শিখায় ঝলমল করছে, ঘাম ঝরছে—এলোমেলো হয়ে গেছে চুল। এ যেন ডাইনীর বাড়ির ভোজ চাপানো হয়েছে। জ্বলন্ত কয়লার স্তূপ বাড়ছে। আঁচে বুঝি এই বিরাট ঘরের ছাদও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

যাক, ঢের হয়েছে! মেয়ু-বৌ চেঁচিয়ে উঠল। পুঁজিঘরে তো আগ্ লাগলো!

লাগুক, লাগুক, ব্রুল-বুড়ী জবাব দিলে, ওতেই হবে। ভগমান! বলিনি, আমার মরদকে খুন করেছে তার শোধ তুলব-তুলব-তুলব!

এমন সময় জাঁলিনের স্বর শোনা গেল,

দেখ না কি করি! সব কিছু পুড়িয়ে দেব না!

সে পয়লা দলেই এসে পৌঁছেছে। ভিড়ের ভিতরে ছুটোছুটি করে সে এই গোলমালে খুব খুশী। বজ্জাতি বুদ্ধিও ষোলআনা। একটা কিছু করতে চায়। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি গজালে বাষ্প বার হওয়ার নলের ছিপিটা খুলে দেবে।

বাষ্প যেন কামানের গোলার মতো শব্দ করে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে এল। পাঁচটা বয়লার ঝড়ের বেগে শূন্য হয়ে গেল। সে কি বাষ্পের হিসহিসানি—যেন বাজের ডাক আর কি! কানে তালা লাগে, বুঝি বা রক্তই ঝরবে। বাষ্পের আড়ালে সবকিছু ডুবে গেছে। গনগনে কয়লার এখন আর জলুষ নেই—বিবর্ণ হয়ে গেছে। মেয়েরা এখন ছায়া। ওদের অংগভংগী যেন আবছা হয়ে এল। শুধু ছেলেটাকে স্পষ্ট দেখা যায়। সে এই সাদা বাষ্পের মেঘের আড়ালে কাঁথির উপরে উঠে বসেছে। খুব খুশী—এই যে ঝঞ্ঝার শক্তিকে সে মুক্ত করে দিলে এর জন্যে সে মুখ বাঁকিয়ে হাসছে।

পনেরো মিনিট ধরে এই ঝড় বয়ে গেল। কয়লার স্তূপে কয়েক বালতি জল ঢেলে আগুন নিবানো হয়েছে। আর আগুন লাগার ভয় নেই। কিন্তু জনতার ক্রোধ এখনো নেবেনি। বরং আরো বেড়েছে। মরদরা আসছে হাতুড়ি নিয়ে, মেয়েদের হাতে লোহার ডাণ্ডা। বয়লার ওরা চুরমার করে দেবে—কল-কব্জা গুঁড়িয়ে—খনিকে-খনি ধসিয়ে দেবে।

এতিয়েং শুনেই মেয়ুকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এল। সেও বুঝি ক্ষেপে গেছে, প্রতিশোধে সে উন্মত্ত। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিয়ে ওদের ঠান্ডা হতে বললে। বুঝিয়ে দিলে কাটা তার, নিবানো আগুন আর ফাঁকা বয়লার নিয়ে আর কাজ চলবে না। কিন্তু ওদের ভ্রুক্ষেপ নেই। জনতার উত্তাল ঢেউয়ে সেও বুঝি আবার চেতন হারিয়ে ফেলবে। এমন সময় বাইরে কারা যেন দুয়ো দিয়ে উঠল। একটা ছোট্ট দরজার সামনে থেকে ভেসে এল স্বর। এখান দিয়ে মই বেয়ে পিট থেকে উঠে আসা যায়।

মার্-মার্ দালাল লোগকো মার! ঐ বেইমানদের দিকে তাকা! মার্-মার্!

পিট থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ। প্রথম যারা এল, কড়া আলোয় তাদের চোখ মিটমিট করছে। এবার ওরা ছুটে পালাল। সদর সড়কে পড়ে ওরা গা-ঢাকা দেবে।

দালাল লোগকো মার ডালো! বেইমান লোগকা মার ডালো!

ধর্মঘটী মজুরের দল ছুটে এল। মিনিট-তিনেকের মধ্যে খনিতে একটি প্রাণীও রইল না। মংতসুর পাঁচশো মজুর দু' সার বেঁধে দাঁড়াল। ভান্দামের বেইমান মজুরের দল এই সারের ভিতর দিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। স্যাফ্ট-এর দরজা দিয়ে একজন করে বেরুতেই সবাই দুয়ো দিতে লাগল। হাসি-তামাশার চরম হয়ে গেল। ছেঁড়া পোষাক-পরা, ঘামে কালো জবজবে শরীর নিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। আরে সাঙাৎ, এক লহমা নজর দিয়ে দেখ না! তিন ইঞ্চি তো ঠ্যাং তারপরেই ওর দুম্বা পাছা! আবার এই সাঙাতের দেখি নাকই ভালকানের ছুঁড়িগুলো কামড়ে নিয়েছে! আরে ঐ যে আরেকজন। চোখ দিয়ে যেন মোম মুতছে—আরে ওতে অমন দশটা গির্জের মোমের যোগান দিতে পারবে! ঐ ঢ্যাঙা লোকটাকে দেখ—একেবারে চামড়াই আছে—পাছা বলে কিছু নেই। একটি কয়লা-চালুনি কামিন গড়াতে-গড়াতে বেরিয়ে এল। তার মাই গিয়ে ঠেকেছে তলপেটে, আর তলপেট দেখে মনে হয়, ওটা বুঝি পাছার ওধারে গিয়ে ঝুলে আছে। তাকে দেখে হাসির হররা উঠল। মাইটা চটকে দেখতে চায় ওরা। ঠাট্টা অশ্লীল হয়ে উঠছে—অশ্লীলতা থেকে আবার নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। শীগ্গীরই ঘুষোঘুষি শুরু হয়ে যাবে। বেচারীরা কাঁপতে কাঁপতে উঠে আসছে—গালাগাল নিঃশব্দে হজম করছে, ট্যারচা চোখে তাকাচ্ছে কিল-চড়ের ভয়ে। তার পর খনি থেকে বেরুতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচছে।

তাহলে, অনেক লোকই কাজে নেমেছিল? এতিয়েং শুধালে।

ক্রমাগত আসছে ওরা। এতিয়েং ওদের দেখে অবাক বনে গেল। রাগ হচ্ছে। শুধু কয়েকজন মজুর নয় যে, সর্দারদের ভয়ে এসে ঢুকে পড়েছে। পেটের তাগিদে নীচে নেমেছে। ওরা তাহলে বনের জমায়েতে মিছেই বলেছে। জাঁ-বার্তের প্রায় সবাই-ই তাহলে কাজে ভিড়েছিল। সাভালকে হঠাৎ দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখে এতিয়েং চীৎকার করে ছুটে গেল।

দুয়ো-দুয়ো! এমনি করে বুঝি কথা রাখলি!

গালাগাল গোলার মতো কেটে পড়ল। জনতা ছুটে এল বেইমানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ও তো কালই শপথ করেছিল ওদেরই সঙ্গে—আজ গিয়ে

আবার সকলের সঙ্গে কাজে ভিড়েছে! ও কি তাহলে ভাই-বেরাদরদের বোকা বানাতে চায়!

ওকে নিয়ে যাও, স্যাফ্‌ট-এর ভিতরে ছুঁড়ে ফেল। তারপর নামিয়ে দাও স্যাফট্‌। ও মরুক!

সাভাল ভয়ে ফ্যাকাশে মেরে গেছে। বুঝিয়ে বলতে চাইছে। এতিয়েঁ তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে। সে রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আর সকলেরই মত সে উন্মাদ।

তুই না আমাদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলি—তাই-ই থাকবি। ওরে বেজন্মা—চলে আয়!

আবার নতুন করে সোরগোল উঠল। তার স্বর ছাপিয়ে গেল। ক্যাথেরিনের পালা এবার। সেও এসে হাজির। রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। বর্বরদের হাতে পড়ে সে সন্ত্রস্ত। একশো দুইখানা মই বেয়ে সে উঠে এসেছে। পা আর চলে না, দম আটকে আসছে। মেয়ু-বৌ তাকে দেখে ফেলে মুঠো-পাকানো হাত তুলল।

ওরে ঢেমনি—তুইও এয়েছিস! তোর মা যখন উপোসে উপোসে মরছে, তোর লাগরের সঙ্গে মিলে-জুলে তুই তখন বেইমানি করছিস লা ছুঁড়ি!

মেয়ু হাত ধরে বাধা দিলে। কিন্তু মেয়েকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে ছাড়ল না। বৌয়ের মতোই সেও একচোট গাল দিলে। ওরা দুজনেই ক্ষেপে গেছে—আর সকলের চেয়ে বেশি চিল্লাচ্ছে।

ক্যাথেরিনকে দেখে এতিয়েঁর রাগও চড়ে গেল। সে বললে,

চল সবাই—অন্য পিটগুলিতে চল। এই শুয়োর, তুইও চল্‌!

সাভাল কোনরকমে তার কাঠের গোড়তোলা জুতো শেড থেকে বার করে আনলে, অবসন্ন কাঁধে গলিয়ে নিলে পশমের জামা। ওকে তারা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল। দলের ভিতরে ও-ও ছুটে চলেছে। ক্যাথেরিন হকচকিয়ে গেছে। সেও জুতো পরল, পুরানো কাঁচুলিটার গলার বোতাম লাগিয়ে নিলে। এমনি করে ঠান্ডা থেকে সে রেহাই পাবে। তার নাগরের পেছু-পেছু সেও ছুটে চলল। ও তো তাকে ফেলে রেখে যেতে পারে না। ওরা তো ওকে খুনই করবে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে জাঁ-বার্ত ফাঁকা হয়ে গেল। জাঁলিন একটা শিঙা পেয়েছে, প্রাণপণে ফুঁকছে। খোনা আওয়াজ উঠছে—যেন ষাঁড়গুলোকে জড় করার ভেঁপু বাজাচ্ছে রাখাল। মেয়েরা—বুল-বুড়ী, লাভাক-বৌ আর মোঁকে-ছুঁড়ি ঘাঘরা তুলে ছুটবে এবার। লেভাক একখানা কুড়ুল নিয়ে ঢাকের কাঠির মত নাড়ছে। দলে দলে মানুষ আসছে; প্রায় হাজারখানেক লোক জমেছে। কোন শৃঙ্খলা নেই। আবার ওরা পথ বয়ে চল উন্মুক্ত ধারার মতো। বেরুবার গেটগুলো সরু—তাই ওরা রেলিঙ ভেঙে ফেলে বেরিয়ে এল।

পিটে-পিটে চল! বেইমানদের মার, কাম বন্ধ—চাকা বন্ধ!

জাঁ-বার্তে হঠাৎ ঘনিয়ে এল প্রচণ্ড নীরবতা, জনমানুষ নেই; নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যায় না। দেনেউলিঁ সর্দারের কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। একেবারে একা। কাউকে সঙ্গে আসতে বারণ করে দিলেন। একা সরেজমিনে তদন্ত করতে চললেন পিটে। মুখ তাঁর ম্লান, কিন্তু ধীর-স্থির তিনি।

প্রথমে স্যাফট্-এর কাছে এসে দাঁড়ালেন—কাটা তার দেখলেন; ইস্পাতের টুকরোগুলো এখনো ঝুলে ঝুলে আছে অকেজো হয়ে। কালো মসৃণতার উপর উকোর দগদগে খত জ্বল জ্বল করছে। তিনি এবার এলেন ইঞ্জিনের কাছে। চেয়ে চেয়ে দেখলেন—যন্ত্রটা অচল হয়ে পড়ে আছে, এ যেন কোন দানবের বিরাট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—এখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু। ধাতুর উপর হাত রাখলেন। এরই মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গেছে। শিউরিয়ে উঠলেন, বুঝি একটা লাশই বা ছুঁয়ে ফেলেছেন! ঘুরে ঘুরে এলেন বয়লার-ঘরে, নেভানো চুল্লি-গুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাঁ করে আছে বয়লারগুলো—জলে জলময়, পা দিয়ে লাথি মারলেন। ফাঁপা আওয়াজ উঠছে। সব শেষ! তাঁর ভরা ডুবি হয়ে গেল। যদি বা তার মেরামত করে চুল্লী জ্বালিয়ে দিতে পারেন, মজুর কোথায় পাবেন? আর পক্ষকাল ধর্মঘট চালু থাকলে তিনি ফৌত হয়ে যাবেন এই নিশ্চিত সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মতসুর দস্যুদলের প্রতি আর ঘৃণা রইল না। সবাই এর জন্য দায়ী—এ তো যুগ-যুগের অন্যায়। ওরা বর্বর, ওরা আদিম—তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু ওরা লেখাপড়া জানে না—ওরা তো উপোস করে ধুঁকে ধুঁকে মরে।

চার

উপরে শীতের বিবর্ণ আকাশ, আর নীচে উন্মুক্ত তুষারাবৃত প্রান্তরের উপর দিয়ে চলেছে জনতা। পথ ছাপিয়ে পড়ছে, বীটের খেত দলে-পিষে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

এতিয়েং ফুটে'-আয়-ব্যুফ থেকে জনতাকে চালাবার ভার নিল। থামবার হুকুম নেই, হুকুম শুধু চলার। মিছিল সে চালাতে লাগল। জাঁলিন চলেছে সকলের আগে, তার সেই বিদঘুটে শিঙা বাজিয়ে বিকট আওয়াজ বার করছে। তার পরে মেয়েরা। তাদের কারো কারো হাতে লাঠি। মেয়ু-বৌয়ের চোখদুটো যেন খ্যাপার মতো—সেই ন্যায়ের নগরী খুঁজতেই যেন সে বেরিয়েছে। বুল-বুড়ী, লেভাক-বৌ, মোকে-ছুঁড়ি ছেঁড়া পোষাকে চলেছে ফৌজের মতো। ওরা যেন রণক্ষেত্রের দিকেই আগুয়ান। যদি পথের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে—দেখা যাক কি হয়! পুলিস ওদের উপর হামলা করে কিনা! ওদের পিছনে এলোমেলো সারে চলেছে পুরুষরা। জনতার ধারা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, লোহার ডান্ডা দেখা যাচ্ছে, আর সবার উপরে লেভাকের একমাত্র কুড়ুলখানা উঁচু হয়ে আছে। রোদে ঝকঝক করে উঠছে। এতিয়েং আছে মাঝখানে। সাভালকে সে নজরে রাখছে। তাকে তার আগে-আগে যেতে বাধ্য করছে। মেয়ু তাদের পিছনে, ক্যাথেরিনের উপর তার নজর, বড় গম্ভীর তার ভাবসাব। সে-ই একমাত্র মেয়ে পুরুষের দঙ্গলে। পীরিতের মানুষকে কেউ আঘাত করবে এই ভয়েই সে তার কাছে কাছে আছে। মাথা খালি, চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়; শুধু কাঠের গোড়তোলা জুতোর খটাখট আওয়াজ শোনা যায়। এ যেন বাঁধন-ছেঁড়া গোরু-মোষের দৌড়! ওরা চলেছে, চলার তালে তালে বাজছে জাঁলিনের বাজখাঁই আওয়াজের ভেঁপু।

হঠাৎ এক নয়া জিগির দিয়ে উঠল জনতা—

রুটি চাই—আমরা রুটি চাই!

দুপুর। ধর্মঘটের ছ' সপ্তাহের খিদে এখন শূন্য উদরে চাগিয়ে উঠছে। আবার সে খিদেয় শান পড়েছে এই মাঠ-ভাঙা দৌড়। সকালের রুটির গুঁড়োর কথা অনেক আগেই তারা ভুলে গেছে। শূন্য উদর গোঙিয়ে উঠছে খাবারের জন্য। বেইমানের বিরুদ্ধে ওদের রাগ যেন দাউ দাউ করে আরো জ্বলে উঠছে।

খাদে চল, খাদে চল। চাকা বন্ধ কর! আমরা রুটি চাই!

এতিয়েঁ ধাওড়া থেকে বেরোবার আগে নিজের ভাগটুকু খেতে চায় নি। কিন্তু এখন তো বুকে অসহ্য ব্যথা। ফেটে যাচ্ছে বুক, চৌচির হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নালিশ নেই মুখে। হড়ঘড়ি সে টিনটা মুখে তুলছে আর এক চুমুক করে জিন গিলে নিচ্ছে। সে তো এমন কাঁপছে যে, তার মনে হচ্ছে আর চলতেও পারবে না। জিন বুঝি চলবার তাকত যোগাবে। গাল দুখানা যেন পুড়ে যাচ্ছে, চোখে জ্বলছে আগুন। কিন্তু তবু মাথা এখনো ঠাণ্ডা, নিরর্থক সে ধ্বংস করতে নারাজ।

জয়সেল রোডের উপরে ওরা এসে গেল। ভান্দামের একজন মাল-কাটা কুলি জুটেছে ওদের দলে। সে তার মনিবের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। সে সাথীদের ডান দিকে মোড় ঘোরবার জন্য উত্তেজিত করে তুলল,

চল—গাস্তঁ-মারিতে চল। হোথায় গিয়ে পাম্প বন্ধ করে দিতে হবে। জাঁ-বর্ত জলে মোরা ভাসিয়ে দেব!

এরই মধ্যে জনতা ধেয়ে চলেছে। এতিয়েঁ কত অনুনয় করলে—ওরা যেন পাম্প বন্ধ করে দিতে না যায়। কাঁথিগুলো ধসিয়ে দিয়ে লাভ কি? সেও রেগে উঠছে, কিন্তু মজুর হিসেবে এ পরিকল্পনা তার বিবেকে বাধে। মেয়ুরও একই মত। কলের উপর শোধ তুলে কি হবে? কিন্তু মাল-কাটা কুলিরা চীৎকার করছে। তারা প্রতিশোধ চায়। এতিয়েঁকে তাই বাধ্য হয়েই চেঁচিয়ে উঠতে হ'ল,

মিরুর কথা কি ভুলে গেলে? ওখানে যে এখনো দালালরা কাম করছে। চল—আমরা মিরুর দিকে যাই—চল, চল!

হাত নেড়ে সে জনতাকে বাঁ দিকের পথে ফিরিয়ে দিলে, আবার জাঁলিন এসে দাঁড়িয়েছে দলের সুমুখে। আগেকার চেয়েও জোরে বাজাচ্ছে ভেঁপু। জনতায় উঠেছে উত্তাল ঘূর্ণা। গাস্তঁ-মরি এখনকার মত রক্ষা পেল।

এখান থেকে মিরু চার কিলোমিটার পথ, আধ ঘণ্টার ভিতরেই ওরা তা পার হয়ে এল। অন্তহীন মাঠের উপর দিয়ে জোর কদমে ছুটে ওরা এসে পেঁছল মিরুতে। এখানে খালটা বরফের দীর্ঘ ফিতের মতো মাঠকে কেটে দু ভাগ করে দিয়ে গেছে। খালের পাড়ে নিষ্পত্র গাছের সার যেন তুষারে বিরাট ঝাড়-লণ্ঠনের মতো ঝুলে ঝুলে আছে। এতেই এই রিক্ত মাঠের ধূ-ধূ-করা সঙ্গতি ভঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু রিক্ত মাঠ এই অসঙ্গতি বুকে করে ছড়িয়ে পড়ছে, দিগন্তে গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। এ যেন মাঠ নয়, সাগর। মঁতসু আর মার্সিয়েনে মাটির উঁচু ঢালের আড়ালে পড়ে গেছে—তাই শুধু আছে নগ্ন রিক্ত অসীম বিস্তার।

পিটে এসে ওরা দেখলে স্ক্রিনিং-শেডের কাছে ফুট-ব্রীজের উপর একজন

সর্দার দাঁড়িয়ে আছে ওদের প্রতীক্ষায়। ওকে সবাই চেনে। ও বাবা কোয়ানদিউ ম'তসু খনির হেড সর্দার। বুড়ো মানুষ। চামড়াও যেমন সাদা, তেমনি তার চুল। বয়েস হবে গোটা সত্তর, কিন্তু খনির মজুরের পক্ষে অবাক-করা তার স্বাস্থ্য।

সে ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, ওরে পাজির দল, এখানে কি করতে এয়েছিস?

জনতা থেমে গেল। ও মালিকদের কেউ নয়, ওদেরই একজন। পুরানো মজুরের প্রতি শ্রদ্ধায় ওরা সংযত।

এতিয়েং জবাব দিলে, নীচে কত লোক কাজ করছে। ওদের বেরিয়ে আসতে বল!

বাবা কোয়ানদিউ বললে, হাঁ, কাম করছে বইকি। তা ছ' ডজন তো হবেই। বাকিরা তোদের ভয়ে কামে ঘেঁষে নি। তোদের বলে রাখি—ওদের একজনও উপরে আসবে নি। তোরা যদি বেশি চিল্লাস তো আমি আছি।

চীৎকারে ফেটে পড়ল জনতা। পুরুষরা ঠেলে এগিয়ে আসছে। মেয়েরাও এগোচ্ছে। সর্দার ফুট-ব্রীজ থেকে নেমে দোর আগলে দাঁড়াল।

মেয়ু বাধা দিতে চেষ্টা করছে।

বুড়ো, এ আমাদের হকের দাবি, যদি সবাইকে না জোর করে দলে ভেড়াতে পারি, তা'লে ধর্মঘট জোরদার হবে কেনে বল? মোদের সব্বার ধর্মঘট হবে কেনে?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল বুড়ো। সংহতি-শক্তির অজ্ঞতাই এর কারণ। সে আর আর কুলির মতোই এ সম্বন্ধে কিছু জানে না। এবার সে বললে,

তা তোমাদের হকের দাবি হতে পারে, মোর তো নয়। আমি শুধু মালিকের হুকুম জানি। আপনার কথা বুঝি। তিনটের সময় ওরা নেবেছে, তিনটে অবধি ওরা ওখানে থাকবে, কাম করবে।

চীৎকারে, ধীক্কারে ডুবে গেল তার কথা। মুঠো-করা হাত উঠে এল। ঘুষি মারবার পাঁয়তাড়া চলছে ভিড়ে। মেয়েরা তাকে গাল দিচ্ছে—তাদের উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে ওর মুখে লাগছে। বরফের মত সাদা তার চুল আর ছাগুলে দাড়ি। সে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। সাহস আছে বটে! জনতার সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে তার স্বর স্পষ্ট শোনা যায়।

দোহাই তোদের, তোরা ঘুসতে আসিস নে! ঐ যে সুষি আলো দিচ্ছে ওরই মতো সাচ্চা আমি—সাফ্ জবান আমার—আমি মরবো, তবু ঐ তার কাউকে ছুঁতে দেব না!...আমাকে ধাক্কা মারিসনি—তাহলে ঐ স্যাফট-এর ভিতর ঝাঁপ খাব। তোরা নাগাল পাবার আগেই এক কান্ড হবে!

জনতা ত্রস্ত, সংকুচিত। তারা বুঝি দ্রবীভূত ওর কথায়। সে বলে চলল,

কে এমন জানোয়ার আছে মোর কথা বুঝতে নারবে? আমি তো তোদের সব্বার মতোই একজন মজুর। মোর উপর হুকুম, পাহারা দিতে হবে—আমি হুকুম তামিল করছি।

বাবা কোয়ানদিউর বুদ্ধির দৌড় এইখানেই শেষ হ'ল। কড়া ফৌজী জীবন সে কাটিয়েছে। কর্তব্যও করেছে। তার মাথা সরু, মাটির তলায় পঞ্চাশ বছর ধরে অন্ধকারে থেকে থেকে চোখদুটির জ্যোতি নিবু নিবু। তার সাথীরা তাকে

দেখছে, ওদের মনে লেগেছে তার কথা। ও যা বললে, সে তো তাদেরই সামরিক বাধ্যতার প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছে। বিপদের মুখোমুখি এলে ওদেরও দেখা দেয় এমনি বাধ্যতা, এমনি ভ্রাতৃত্ববোধ; এমনি আত্মসমর্পণে ওরা লুটিয়ে পড়ে। সে ভাবলে, বোধহয় এখনো দ্বিধা আছে; তাই আবার বললে,

আমি ঐ পিটের ভিতরে আগে ঝাঁপ খাব!

জনতা যেন এক অতিকায় মানুষের মত নড়ে উঠল, সরে এল। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার সড়ক ধরে ছুটতে লাগল। মাঠের ভিতর দিয়ে সড়ক চলেছে তো চলেছেই। আর সড়কের উপর দিয়ে ছুটছে জনতার সার। আবার উঠল জিগির ঐকতানে,

মাদালিনে চল! চল ক্রোভকুরে। কাজের চাকা বন্ধ কর।

রুটি-রুটি-রুটি চাই আমরা!

হঠাৎ ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল ভিড়ের মাঝখানে, সোরগোল উঠল।

ব্যাপারটা সাভালকে নিয়ে। সবাই বললে, ও নাকি এর মধ্যে পালাতে গিছল। এতিয়েঁ তার হাত ধরে আটকে রেখেছে। আবার এই বলে শাসিয়েছে যে, ও যদি বেইমানি করতে চায়—তাহলে ওকে সাবাড় করে দেবে। সাভাল ধস্তাধস্তি করছে, গলাবাজি করে জোর প্রতিবাদ করছে।

এসব কি কাণ্ড! আমি কি কয়েদী নাকি। জমে গেলাম যে! এখন কয়লা না ঝেড়ে ফেললে তো মরার দাখিল হব। ছাড়-ছাড় বলছি।

সত্যই কয়লার গুঁড়ো তার গায়ের ঘামের সঙ্গে লেপটে গেছে, এখন তো হুলের মত ফুটছে। আবার গায়ের পশমী জামায় শীতও মানছে না।

চল্, চল্, এতিয়েঁ বললে, নয় তো আমরা তোকে আচ্ছাসে ধোলাই দেব! নিজের প্রাণটা যে দরাদরি করে বাঁচাবি তা তো হবে না!

সবাই এখনো ছুটছে। সে এবার ক্যাথেরিনের দিকে তাকালে। সেও সমান তালে ছুটে চলেছে। ও এত কাছে আছে, এ অনুভূতি ও যেন এতিয়েঁর কাছে দুঃখের। বুকে ব্যথা বাজে। আহা ভারি দুঃখী মেয়েটা। দেখনা পুরুষের কোট গায়ে চাপিয়েও মেয়েটা শীতে কাঁপছে, কাদায় ভরে গেছে ওর ট্রাউসার। ও হয়রান হয়ে পড়েছে, তবু ছুটছে।

এতিয়েঁ বললে, তুমি বাড়ি যাও।

ক্যাথেরিন যেন শুনেও শুনছে না। শুধু চোখে চোখ মিলতেই দপ করে ভর্ৎসনার স্ফুলিঙ্গ যেন জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্য। সে থামলে না। কেন সে নিজের ভালবাসার লোককে ছেড়ে যেতে বলছে? সাভালের মোটে দয়া-মায়া নেই সত্যি; এমন কি মাঝে মাঝে মারধরও করে। কিন্তু তবু তো ভাল-বাসার মানুষ। ওই তো প্রথম তাকে ভোগ করেছে। ওরা যে ওর উপর চড়াও হয়েছে—এতে সে রেগেই উঠল, ভালবাসায় না হোক, নিজের স্বার্থে তো সে সাভালকে বাঁচাতে চায়।

মেয়ু এবার বললে, দূর হয়ে যা ছুঁড়ি!

হুকুম এবার এল বাপের কাছ থেকে। গতি সে কমিয়ে দিলে মুহূর্তের জন্য। কাঁপছে, চোখে তার জল। কিন্তু এত যে ভয়, তবু সে তেমনি চলেছে। এবার আর কেউ তাকে বাধা দিলে না।

জনতা জয়সেল রোড পার হয়ে ক্রন রোড ধরে কিছুদূর এগিয়ে এল—তার

পরে কগনির দিকে বয়ে চলল। এধারে কল-কারখানার চোঙ ডোরা কেটে দিয়েছে দিগন্তের গায়। কাঠের শেড, ইটখোলার ভিড়। কারখানার জানালা-গুলো ধুলোয় ধূসর। দুটি ধাওড়ার পাশ কাটিয়ে ওরা চলে এল, একশো আশী আর ছিয়াত্তর নম্বর ধাওড়ায়। সমস্ত ধাওড়া ছুটে এল দেখতে। মাগী-মরদ বাচ্চাকাচ্চা কেউ বাদ গেল না। জনতার চীৎকার আর ভেঁপু ওদের ঘরের বার করে আনলে। ওরাও সাথীদের সঙ্গে যোগ দিলে। মাদেলিনে যখন ওরা পৌঁছল; তখন সংখ্যায় ওরা দেড় হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে।

পথ এবার ঢালু হয়ে এসেছে। পিটের পাড় ঘিরে বয়ে চলল জনতা, তার পরে ছড়িয়ে পড়ল ইয়ার্ডে।

দুটোর বেশি বাজেনি। কিন্তু সর্দারদের আগেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। ভিড় এসে পৌঁছতেই তারা কেজগুলো তাড়াতাড়ি তুলে ফেলতে লাগল। ভিড় এসে চড়াও হবার আগেই সকলে উঠে এল। শুধু বিশ-বাইশ-জন বাকি ছিল, তারাও সেই মুহূর্তে কেজ থেকে বার হয়ে এল। ওদের পিছনে ধাওয়া করল ভিড়, ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল। দুজন মার খেল, আর একজন জামার হাতাখানা রেখে পালাল। এই মানুষ-শিকারের ফলেই পিট রক্ষা পেল। তার বা বয়লার ওরা ছুঁলেও না। এবার জনতার ঢেউ বয়ে চলল আর-এক পিটের দিকে।

এইটেই ক্রেভকুর পিট। মাদলিন থেকে মাত্র পাঁচশো মিটার দূরে। সেখানেও যখন ওঠা চলছিল, তখন ওরা এসে পৌঁছল। একটি কয়লা-চালুনী কামিনকে মেয়েরা ধরে ফেলে বেদম মার দিলে। তার ব্রীচেস ছিঁড়ে গেল, পাছাখানা বেরিয়ে পড়ল। পুরুষদের তো হাসি আর ধরে না। গাড়ি-ঠেলিয়েদের কানে ঘুষো-ঘাষা পড়তে লাগল। মাল-কাটা খালাসীরা রেহাই পেল না। ঘুষো-ঘাষার কালশিরা পড়ছে শরীরে, নাকে রক্ত ঝরতে লাগল। যুগ যুগের প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মাদনা বেড়ে উঠছে। ওরা যেন চাবুক খেয়ে খেয়ে পাগল। আরো জোরে উঠল জিগির—বেইমানদের মৃত্যু চাই। কম মজুরির মেহনতের বিরুদ্ধে ঘৃণা উঠল ফুঁসে, শূন্য উদর পূরণের রুটির জন্য গর্জন করে উঠল ঘন জনতা। তার কাটা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এবার আর উকো আর তেমন তাড়াতাড়ি কাটে না। সবাই ছুটে যেতে চায় আগেভাগে। বয়লারের একটা কক্ ভেঙে ফেলা হ'ল, ফার্নেসে ফার্নেসে কলসী কলসী জল এনে ঢালা হ'ল, ফেটে গেল কুণ্ডের লোহার গাঁথুনি।

বাইরে এসে ওরা সাঁ-তমাসে দল বেঁধে যাবার কথাই বলাবলি করছিল। এই পিটটাই সবচেয়ে সুশৃঙ্খলায় চলে, এখন অবধি সেখানে ধর্মঘটের হাওয়া লাগে নি। প্রায় সাতশো লোক এখন ওখানে কাজে নেমেছে। একথা ভাবতেও তো রাগ হয়। ওরা ব্যূহ রচনা করে ওদের জন্য ডাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, দেখি—কে আর কাজ করতে নামে! কিন্তু গুজব রটে গেল, সাঁ-তমাসে পুলিস গিসগিস করছে। আজ সকালেই যাদের দেখে ওরা হাসি-ঠাট্টা করলে, তারাই এখন সাঁ-তমাসে মোতায়েন। কিন্তু এ খবর কি করে জানা গেল? কেউ সে-কথা বলতে পারলে না। যাক গে! ভয় পেয়ে গেছে ওরা, তার বদলে ফিউৎরি-কাঁতেলে যাওয়াই ঠিক হ'ল। ওরা ফিরে দাঁড়াল। অধীর, অস্থির জনতা। আবার সড়কে এসে পড়েছে, জুতোর আওয়াজ বাজছে খট্ খট্ খট্

—ছুটে চলেছে আগুয়ান হয়ে। চল—ফিউৎরি-কাঁতেলে চল! চল, চল! ওখানে চারশোর উপরে দালাল আছে। ভারি মজা হবে! মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে—স্কার্পের কাছে একটা ঢালু জমির আড়ালে পড়ে আছে পিট। এরই মধ্যে ওরা প্লাত্রিয়েরের ঢালে উঠে এল, পিছনে পড়ে আছে বোগাঁ রোড। এবার কে যেন বলে উঠল, হয়তো ফৌজ এখন ফিউৎরি-কাঁতেলেই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কার স্বর কেউ ঠাহর করতে পারলে না। কিন্তু অমনি মানুষের সারে সারে কথাটা চারিয়ে পড়ল—ফৌজ এসে গেছে! মিছিলের গতি কমে এল, ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে, ছড়িয়ে পড়ছে এই নিঃশব্দ, বেকার মুলুকের পথে ঘাটে। আর ওরা সেই মুলুকের পথ-ঘাট ভেঙে চলেছে এগিয়ে। পা চলে না। কিন্তু একটা সৈন্যও তো ওরা পথে দেখতে পেলে না? নিজেদের ঔদ্ধত্যে ওরা বিভ্রান্ত, তার পরে আসছে নির্যাতনের পালা।

নয়া হুকুম শুনে ওরা আবার আর-এক পিটের দিকে ছুটল। কার হুকুম, কে দিলে, কিছুই ওরা জানল না।

চল, লা-ভিক্তরে চল! চল-চল!

লা ভিক্তরে কি পল্টন বা পুলিস নেই? কেউ জানে না। কিন্তু তবু ওরা নিশ্চিত। আবার ওরা ফিরে দাঁড়াল। এবার বোসোঁর দিক দিয়ে ঢাল থেকে নেমে আসছে। জয়সেল রোডের পানে ছুটছে মাঠ ভেঙে। রেল লাইন দেখা দিয়েছে, ওদের গতিবেগে দিলে বাধা। ওরা বেড়া তুলে ফেলে লাইন পার হয়ে গেল। এখন মঁতসুর কাছে এসে গেছে। উঁচু নীচু জমি আর তেমন নেই। বীটের খেতের সমুদ্র যেন আরো বিরাট হয়ে উঠেছে। গিয়ে পেঁাছেছে মার্সিয়েনের আবছা বাড়িগুলো অবধি। এবার পাঁচ কিলোমিটারের পথ। কিন্তু উত্তেজনা এমন প্রবল যে, ওদের ক্লান্তি উবে গেছে—ক্ষতবিক্ষত পায়ের কথা মনে পড়ছে না। মিছিলের শেষদিকটা ক্রমাগত বাড়ছে। নতুন সাথীরা এসে যোগ দিচ্ছে পথ আর ধাওড়া থেকে। ওরা যখন সৈগাচে ব্রীজের উপর দিয়ে খাল পার হয়ে ভিক্তরের সুমুখে হাজির হ'ল—তখন সংখ্যায় ওরা দু'হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তিনটে বেজে গেছে এরই মধ্যে, সবাই উঠে এসেছে উপরে—কেউ নীচে নেই। হতাশা এবার নিষ্ফল আস্ফালনে পরিণত হ'ল। মাটি-কাটা কুলীরা এইমাত্র এসে গেছে, ওদের উপরে ওরা ইট ছুঁড়তে পারে বটে! ওদের সহজেই ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া গেল, এবার পরিত্যক্ত পিট ধর্মঘটীদের দখলে। এখানে বেইমান না পেয়ে ওরা রাগে ফুঁসে উঠল, তার পর জিনিসপত্রের উপর শুরু হ'ল আক্রমণ। বিদ্বেষের ফোড়াটা বুঝি ফেটে গেল, আস্তে আস্তে বিষ-ফোড়াটা বেড়ে বেড়ে উঠেছিল। বছরের পর বছর ধরে ওরা বুভুক্ষু, আজ সেই ভুখা পেট ওদের উত্তেজিত করে তুলছে। হত্যা আর ধ্বংসের কামনায় ওরা উন্মাদ।

এতিয়েঁ দেখলে, একটা শেডের পিছনে কয়েকজন মজুর একটা গাড়িতে কয়লা বোঝাই করছে।

ওরে পাজির দল, যা—ভাগ্! সে চেঁচিয়ে উঠল, এখান থেকে এক টুকরো কয়লাও কোথাও যাবে না।

ওর হুকুমে শ'খানেক ধর্মঘটী ছুটে এল, ওরা কোনরকমে পালিয়ে গেল।

গাড়ি থেকে খুলে আনা হ'ল ঘোড়া, কেউ কেউ ঘোড়ার পাছায় চিমটি কাটলে। আর ঘোড়াগুলো অমনি ছুটে পালাল। কেউ বা গাড়ি উল্‌টে ফেলে দিলে।

লেভাক তার কুড়ুল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফুট-ব্রীজের উপর। ওটা সে ভেঙে ফেলবে। কিন্তু ব্রীজটা বড় মজবুত। ভাঙা হ'ল না। এবার মনে হ'ল, লাইন উপড়ে ফেলবে—এক মুড়ো থেকে আর এক মুড়ো একেবারে সাফ করে দেবে। দেখতে-দেখতে গোটা দলটাই একাজে লেগে গেল। মেয়ু তার ডাণ্ডাটা দিয়ে চাড় দিতে শুরু করে দিলে। এরই মধ্যে বুড়ী ব্রুল মেয়েদের নিয়ে বাতিঘরের উপর চড়াও হ'ল। ওদের হাতের খেঁটে ঘুরতে লাগল বন্‌বন্‌ করে—দেখতে-দেখতে মেঝে ভাঙাচোরা বাতির টুকরোয় ভরে গেল। মেয়ু-বৌ তো একেবারে ক্ষেপে গেছে। সে লেভাক-বৌয়ের মতই ভাঙচুর করছে। তেলে সবাই জবজবে হয়ে উঠেছে, মোকে ঘাগরায় হাত মুছছে আর হাসছে। নোংরা ঘাগরা দেখে তার হাসি আর ধরে না। জাঁলিন তামাশা করে একটা বাতির তেল ওর গলায় ঢেলে দিলে। কিন্তু এত প্রতিশোধেও খাবার মিলল না। পেট জ্বলছে, উঠছে জিগির নয়—গোঙানি ঃ

রুটি—রুটি—রুটি!

ভিক্তরের আগেকার এক সর্দার কাছেই দোকান করে বসেছে। তার দোকান ফাঁকা, সে নিশ্চয়ই হামলার ভয়ে পালিয়েছে। মেয়েরা এবার ফিরে এল। পুরুষদেরও রেল লাইন উপড়ানো শেষ। ওরা সবাই মিলে গিয়ে চড়াও হ'ল দোকানের উপর। দেখতে দেখতে শার্সি ভেঙে গেল। রুটি নেই। শুধু আছে বড় বড় দুটো টুকরো কাঁচা মাংস—আর এক বস্তা আলু। কিন্তু লুঠ করতে গিয়ে গোটা পঞ্চাশেক বোতল জিন পাওয়া গেল। বালির ভিতরে জলের ফোঁটার মতো দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গেল বোতল ক'টা।

এতিয়েঁও তার শূন্য টিনটা ভরে নিলে। এবার দেখা দিল বিশ্রী মাতলামি। ভুখা মানুষের মাতলামি। চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, বিবর্ণ ঠোঁটের ভিতর দিয়ে নেকড়ের মতো দাঁতের সার বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, এই গোলমালে সাভাল সরে পড়েছে। সে গাল দিলে, লোক পাঠানো হ'ল তাকে ধরে আনতে। ফেরারী একটা কাঠের গাদার আড়ালে ক্যাথেরিনের সঙ্গে লুকিয়ে ছিল, তাকে ধরে আনা হ'ল।

ওরে পাজী, তুই বুঝি ভয়ে পালিয়ে থাকতে চাস! এতিয়েঁ চেঁচিয়ে উঠল। তুই না সেদিন বনের জমায়েতে ইঞ্জিনের মিস্ত্রীদের ধর্মঘটের কথা বাত্‌লে দিয়েছিলি—তুই না বলেছিলি পাম্প বন্ধ করে দিতে হবে—আর এখন আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছিস! বহুৎ আচ্ছা! আমরা গাস্তঁ-মারিতেই যাব। তোকে দিয়ে পাম্প গুঁড়ো করিয়ে তবে ছাড়ব, হাঁ, তোকেই করতে হবে!

মাতাল হয়ে পড়েছে এতিয়েঁ; কয়েক ঘণ্টা আগে সে-ই পাম্পটাকে রক্ষা করেছিল—এখন সে-ই আবার তারই বিরুদ্ধে সঙ্গীদের উত্তেজিত করছে।

চল ভাইসব—গাস্তঁ-মারির দিকে চল!

তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। ছুটে চলল উন্মাদ জনতা। সাভালকে ঘাড় ধরে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল।

ক্যাথেরিনও ছুটছিল। মেয়ু ক্যাথেরিনকে বললে, তুই ভাগ্‌ এখান থেকে! কিন্তু এবার মেয়েটা ভয় পেলে না। বরং বাপকে তুচ্ছ করেই ছুটে চলল।

আবার খাঁ-খাঁ মাঠ চষে দিয়ে চলল মিছিল। ফিরে চলেছে যে-পথে এসেছিল। দু'ধারে প্রান্তরের অসীম বিস্তার। এখন চারটে বেজেছে, অস্তমান সূর্য জনতার বর্বর ভঙ্গিমাময় ছায়া ফেলেছে তুষারায়িত মাটির বুকে।

ওরা ম'তসু এড়িয়ে জয়সেল রোডের কিছু দূরে গিয়ে সদর সড়কে উঠে পড়ল। ফুচে-আয়-বুফ আর ঘুরতে হ'ল না। পিয়ালে'র সীমানার পাঁচিলের নীচ দিয়ে বয়ে চলল জনতা। গ্রিগোয়েররা বাড়ি নেই। হানাবুদের ওখানে নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়ার আগে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেছেন। সিসিলিকে নিয়ে আসবেন হানাবুদের ওখান থেকে। সারা জমিদারি এখন যেন ঘুমে বিভোর। দুপাশে লেবুর ঝাড়ের মাঝখানের পথ এখন নির্জন। খিড়কির বাগান আর বাগিচা শীতে নিষ্পত্র হয়ে গেছে। বাড়ির ভিতরেও সাড়াশব্দ নেই। বন্ধ শার্সি জানালায় কুয়াশার ছাট লেগে লেগে আছে। গুমোট বন্ধ ঘরের উত্তাপই এই কুয়াশার কারণ। এই গভীর প্রশান্তি দেখে স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই মনে পড়ে। স্বাচ্ছন্দ্য আর সচ্ছলতা—পিতৃশাসিত মালিকানার আদরা ভেসে ওঠে—ভাল বিছানা, ভাল টেবিল, আর সুনিয়ন্ত্রিত সুখের আমেজ এনে দেয়। মালিকরা তো এমনিভাবেই জীবন কাটান।

জনতা থামল না, তবু ক্রুদ্ধভাবে রেলিঙের ভিতর দিয়ে তাকালে, রক্ষা প্রাচীরের উপর দিয়ে চোখ চালিয়ে দিলে। প্রাচীরের উপরে ভাঙা কাচের সার পোঁতা। আবার উঠল জিগির ঃ

আমরা রুটি চাই—রুটি চাই!

ওদের জবাব এল ঘেউ-ঘেউয়ানিতে। এক জোড়া গ্রেট ডেন কুকুর ডেকে উঠল। ওদের গায়ের লোম কর্কশ, হাঁ করে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধ খড়খড়ির আড়ালে দু'জন পরিচারিকাও দাঁড়িয়েছিল। এ সেই রাঁধুনী মেল্যাঁ আর পরিচারিকা অনরাইন। গোলমাল শুনেই ওরা ছুটে এল। বর্বরদের ভুখ্ মিছিল চলে যাচ্ছে। ভয়ে ওদের গা দিয়ে ঝরছে ঘাম, মৃত্যুর বিবর্ণতা ওদের মুখে। ঢিল পড়ার শব্দ শুনে ওরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। বুঝি অন্তিম মুহূর্ত এসেছে ঘনিয়ে! একটা মাত্র ঢিল এসে পড়েছে, আর-এক ঘরের একখানা শার্সি ভাঙল। এ জাঁলিনের কাজ। তার খেলার নমুনা। দড়ি দিয়ে সে একটা গুল্তি তৈরি করে ফেলেছে, গ্রিগোয়েরদের এই ভাবেই বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। আবার ভেঁপু বাজাচ্ছে। জনতা মিলিয়ে যাচ্ছে, এখন তাদের অস্পষ্ট জিগির উঠছে ঃ

রুটি—রুটি—রুটি!

গাস্ত'-মারিতে ওরা গিয়ে যখন হাজির হ'ল, তখন ওদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে। আড়াই হাজারেরও বেশি খ্যাপা মানুষের দল। ওরা সব-কিছু ভাঙচুর করছে, সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড ঢেউয়ের বেগে। একদল পুলিস ঘন্টাখানেক আগে এই পথে এসে হাজির হয়েছিল। চাষীদের কাছে ভুল খবর পেয়ে ওরা সাঁ-তমাসের দিকে ছুটে যায়। তাড়াতাড়িতে কিছু লোকও এখানে পাহারায় মোতায়েন করে যাওয়ার সময় পায়নি। পনেরো মিনিটের ভিতরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল, বয়লার শূন্য হয়ে গেল—কুঠি-গুলো লুঠ-তরাজ করে সব তছনছ করে ফেলা হ'ল। পাম্পের উপরই ওদের ঝোঁক। বাষ্প উবে গিয়ে যে পাম্প অকেজো হয়ে গেল, তাতেও যথেষ্ট হয়নি।

ওরা এবার পাম্পের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেন জীয়ন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—ওর প্রাণ তারা চায়, এতিয়েং সাভালের হাতে একখানা হাতুড়ি তুলে দিয়ে বললে, তুই-ই পয়লা ঘা মারবি! তুই-ই তো আমাদের সাথে কসম খেয়েছিলি।

সাভাল পিছিয়ে এল। কাঁপছে সে। ধস্তাধস্তিতে হাতুড়িটা খসে পড়ল। এদিকে আর সবাই অপেক্ষা না করে পাম্পটার উপর লোহার ডাণ্ডার ঘা মারছে, ছুঁড়ছে ইঁট। যা-কিছু হাতের কাছে পাচ্ছে তাই দিয়েই পাম্পটাকে থেঁতলে দিচ্ছে। হাতের লাঠিও কেউ কেউ ওরই উপর ভাঙল। পাম্পের নাট-বল্টুগুলো এদিক-ওদিক ছুটছে, ছিটকে পড়ছে, ইস্পাতের টুকরোগুলো যেন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসছে। একখানা শাবল পূর্ণ বেগে এসে পড়ল এবার, ধাতব দেহ একেবারে ভেঙেচুরে গেল। জল বেরিয়ে যাচ্ছে—শূন্য হয়ে আসছে। মৃত্যুর ঘড়ঘড়ানির মতোই সেই কলনাদ।

সব শেষ, জনতা আবার বাইরে এসে দাঁড়াল এতিয়েংর পিছু পিছু। এখনো সাভালকে সে ধরে আছে।

বেইমানলোগকো মার—দালাললোগকো মার! ওকে পিটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দাও!

হতভাগ্য সাভাল! ভয়ে সে বিবর্ণ। অসংলগ্ন কথা বলছে, এখনো সেই ধুয়ো ধরে আছে—সে গা ধোয়া-পাখলা করে নিতে চায়!

লেভাক-বৌ বলে উঠল, তোর বুঝি চানের খুব শখ, দাঁড়া দিচ্ছি গা ধুইয়ে! এই তো বালতি!

পাম্প থেকে জল ঝরে ঝরে খানিকটা জল জমে আছে। তার উপর বরফ পড়ে সাদায় সাদা হয়ে গেছে। ওরা বরফের সেই আস্তরণ ভেঙে ফেলে ঐ বরফজলেই বার বার ওর মাথাটা চুবিয়ে ধরলে।

বুড়ী-বুল বললে, যারে ছোঁড়া, টুপ করে ডুব দে, না দিলে এখুনি ঠেলে ফেলে দেব। তাহলে এক ঢোক খেয়েও নিতে পারবি। হাঁ, হাঁ, ঐ জানোয়ার-গুলোর মতো জালায় মুখ দিয়ে খেতে হবে। চারপায় ভর দিয়ে উবু হয়ে ওকে পশুর মতোই জলপান করতে হ'ল। সবাই হাসছে। নির্মম হাসি। এক মেয়ে ওর কান ধরে টেনে দিলে, আর একজন পথে খানিকটা সদ্য-নাদানো গোবর পেয়েছে—তাই-ই ছুঁড়ে মারল মুখে। ওর পুরানো উলের পিরান ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে গায়ে। কিম্ভূত দেখাচ্ছে ওকে, টলে-টলে পড়ছে—আবার পালাবার চেষ্টারও অন্ত নেই।

মেয়ু তাকে ধাক্কা মারছে, মেয়ু-বৌ তো রেগে টং—তাদের পুরানো আক্রোশের ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছে। এমন কি মোকে-ছুঁড়ি অবধি ক্ষেপে গেছে। এমনি তো সে পুরানো পীরিতের মানুষদের সঙ্গে মিতালিটুকু বজায় রাখে—কিন্তু সে সাভালকে অকেজো বলে গাল দিচ্ছে, তার পায়জামা টেনে খুলে দেখতে চাইছে, সে এখনো মরদ আছে কি না।

এতিয়েং তাকে থামিয়ে দিলে,

থাক, থাক, ঢের হয়েছে! সবাইকে ওর উপরে একহাত নিতে হবে না। তোর যদি ইচ্ছে থাকে—আয় আমরা একটা বোঝাপড়া করে নিই।

তার হাত মুঠো পাকালে, চোখে খুনের নেশা; মাতলামি এখন রক্তের নেশায় পরিণত।

কি—তৈরী তো? এখানে দু'জনের ঠাঁই নেই—একজনই থাকবে—আর—একজনকে সরে দাঁড়াতে হবে। ওকে একখানা ছোরা দাও। আমারখানা আমার কাছেই আছে।

ক্যাথেরিন বুঝি মূর্চ্ছা যায় আর কি। সে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভয়বিহ্বল তার দৃষ্টি। তার মনে পড়ছে, এতিয়েঁ বলেছিল, মদ খেলে খুনের নেশা তাকে পেয়ে বসে। তিন গেলাসের পর সে তো ক্ষেপে ওঠে। তার মাতাল বাপ-মা তার দেহে এই বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। হঠাৎ ক্যাথেরিন লাফিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। এতিয়েঁর কানে দুহাত দিয়ে এলোপাথাড়ি ঘুষি মারছে, রাগে ক্ষেপে গিয়ে চীৎকার করছে।

ভ্যালা মোর ভীতুয়া মরদ। গাল দিয়েও কি তোর হ'ল নি? ও তো উঠতেও পারছে না, ওকে তুই খুন করতে চাস।

বাপ-মা আর সকলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে,

তোরা আচ্ছা ভীতু! আমাকে ওর সাথে সাবড়ে দে না! ওকে ছুঁতে যাবি তো চোখ গেলে দেবনি, উপড়ে নিবনি! ওরে ভীতুর পয়দা ভীতু!

তার মরদের সুমুখে এসে সে আড়াল করে দাঁড়াল, তাকে সে রক্ষা করছে। ভুলে গেছে দুঃসহ জীবনের কথা, তার প্রহারের কথা। শুধু একই অনুপ্রেরণায় সে উদ্বুদ্ধ—সে যেদিন থেকে তাকে উপভোগ করেছে, সেইদিন থেকে সে তো একান্ত তারই হয়ে গেছে। সে তার মরদ, তার অপমানে তো তার নিজেরই অপমান।

মেয়েটা তাকে ঘুষি মারতেই এতিয়েঁর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেও ওকে মেরে পেড়ে ফেলতে গিয়েছিল, কিন্তু পারলে না। মুখের উপর নিজেরই অজান্তে হাতখানা বুলিয়ে নিলে। বুঝি নেশা তার কেটে গেছে। গভীর নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এসেছে চার দিকে। সে সাভালকে এবার বললে,

সাঁচ্চা কথা বলেছে মেয়ে!...ভাগ্—নিকালো হিঁয়াসে!

সাভাল তখুনি ছুটে পালাল, ক্যাথেরিন ছুটল তার পিছনে পিছনে। জনতা হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে আছে। দেখছে—ওরা পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

মেয়ু-বৌ বললে,

তোমার ভুল হ'ল গো! ওকে ধরে রাখলেই ঠিক হোত। ও তো আবার গিয়ে কি কুচাল চালবে কে বুলবে!

আবার জনতা এগিয়ে চলল। পাঁচটা বাজে। সূর্য যেন গন্‌গনে আগুন-ভরা চুল্লী—দিগন্তের প্রান্তে সেই চুল্লী এখন বহ্নিমান। প্রান্তরে বুঝি আগুন ধরে গেল। এক ফেরিওয়ালা যাচ্ছিল, সে খবর দিলে ক্রেভকুরের দিক থেকে টহলদারী ফৌজ এগিয়ে আসছে। আবার ফিরতে হ'ল। আবার হুকুম বেজে উঠল:

চল—চল—মঁতসুর পথে চল! ম্যানেজারের কাছে চল! রুটি চাই—মোদের রুটি চাই!

মঁসিয়ে হানাবু অফিস-কামরার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, গাড়ি মার্সিয়েনের পথে ছুটছে। স্ত্রী চলেছেন মধ্যাহ্ন ভোজনে। নিগ্রেলের দিকে মুহূর্তের জন্য চোখ পড়ল। সে গাড়ির পেছনে চলেছে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। এবার তিনি নিঃশব্দে ফিরে এসে টেবিলে বসলেন। যখন বাড়িতে স্ত্রী বা ভাগনে থাকে না—তখন বাড়িখানা শূন্য ঠেকে। আজ গাড়োয়ান গাড়ি চালাচ্ছে, নতুন পরিচারিকা রোজের পাঁচটা অবধি ছুটি। শুধু বাড়িতে আছে খাস খানসামা হিপোলাইট। চটি পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কামরায় কামরায়। আর আছে রাঁধুনী, সে ভোরেই উঠেছে। সেই থেকে শুরু হয়েছে সসপ্যান আর হাঁড়িকুড়ির সঙ্গে ভীষণ লড়াই। রাতে মনিবরা ভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন অতিথিদের—তারই আয়োজনে সে ব্যস্ত। মসিয়েঁ হানাবুও ঠিক করেছেন, শূন্য বাড়ির প্রশান্তিতে তিনি কাজে ডুবে থাকবেন।

প্রায় ন'টা বাজে। হিপোলাইটের উপর হুকুম আছে, যে কেউ আসুক, ভাগিয়ে দেবে। তবু সে দাঁসারকে বাড়িতে ঢুকতে দিলে। সে খবর নিয়ে এসেছে। ম্যানেজার এবার বনে কালকের জমায়েতের কথা প্রথম শুনলেন। খুঁটিনাটি তথ্যও পাওয়া গেল। তিনি শুনতে শুনতে ভাবছিলেন পিয়েরোঁ-বৌয়ের সঙ্গে সর্দারের অবৈধ সম্পর্কের কথা। ব্যাপারটা যথেষ্ট জানাজানি হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহেই এই লম্পট সর্দারের কীর্তি কাহিনী বয়ে নিয়ে আসে দু-তিনখানা উড়ো চিঠি। স্বামী সব কথা খোলসা করে বলেছে স্ত্রীর কাছে। আবার স্ত্রী বলেছে দাঁসারকে। খবরটায় অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের খোসবাই ভুরভুর করছে। কিন্তু ম্যানেজার সুযোগ নিতে ছাড়লেন না, দাঁসারকে বুঝিয়ে দিলেন—তিনি সবই খবর রাখেন, একটু বা বিবেচক হতেও বললেন। কেলেঙ্কারিটা যেন বেশি না হয়। খবর বলতে গিয়ে নিজের সমালোচনা শুনে দাঁসার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে সাফ অস্বীকার করে বসল কথাটা, আবার ক্ষমাও চাইলে—কিন্তু তার লম্বা নাকখানা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল—এতেই তার দোষের স্বীকৃতি মিলল। সর্দার আর কথাটাকে বাড়াতে চাইলে না, অল্পতে পার পেয়ে গেছে বলে খুশী হ'ল। ম্যানেজার ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ—তিনি যেন কড়াই হয়ে উঠলেন। পিটে যখন কোন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কোন কর্মচারী ঢলাঢলি করে তিনি নিয়ম-মাফিক কড়া হয়ে উঠতে জানেন। এবার কথার মোড় ঘুরল ধর্মঘটের দিকে—বনে জমায়েৎ আর কিছু নয়—কতগুলো বাক্যবাগীশের হুঙ্কার! কোন ভয় নেই। যাই হোক, কয়েকদিন আর ধাওড়া-গুলোয় সাড়াশব্দ মিলবে না। আজ সকালে ফৌজী মহড়া দেখে ওরা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছে।

তবুও, সর্দার চলে যেতেই হানাবু পুলিসের বড় কর্তার কাছে একটা তার পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু উদ্বেগটা প্রকাশ করে ফেলবেন—এই ভয়েই তার আর পাঠানো হ'ল না। তাঁর যে দূরদৃষ্টির অভাব ঘটেছে এর জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারলেন না। তিনি সর্বত্র বলে বেড়িয়েছেন, এমন কি ডিরেক্টর-দেরও লিখে জানিয়েছেন—ধর্মঘট বড় জোর এক পক্ষকাল চলতে পারে। কিন্তু আজ দু'মাস ধরে তো চলছে ধর্মঘট, তিনি তাজ্জব বনে গেছেন। হতাশাও

দেখা দিয়েছে। প্রতিদিনই যেন মনে হচ্ছে নিজের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হচ্ছে, কেমন যেন সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে—এখন তো ভাবছেন চমকপ্রদ কিছু করা যায় কিনা—যাতে মালিকদের মন পেতে পারেন। সংঘর্ষ লাগতে পারে ভেবে তিনি তাদের হুকুমনামা চেয়ে পাঠিয়েছেন। উত্তর আসতে দেরি হচ্ছে, আজ বিকেলের ডাকেই এসে পৌঁছবে এই তাঁর আশা। মনে মনে খতিয়ে দেখলেন, তখনও তার পাঠাবার ঢের সময় থাকবে, ফৌজ এসে দখল করে বসবে পিটগুলি। এখন মালিকদের মর্জি হলে হয়। তাঁর মতে সে হবে রীতিমত লড়াই—রক্তপাতও হবে বই কি। এমনি তিনি উৎসাহে উদ্দীপ্ত মানুষ—কিন্তু গুরুভার দায়িত্বের চাপে এখন তিনি বিভ্রান্ত।

এগারোটা পর্যন্ত চুপচাপ কাজ করে গেলেন। বাড়িখানা নিঃসাড়—শুধু হিপোলাইটের মেঝে পালিস করার শব্দ উঠছে দোতলার কোন ঘর থেকে। এবার পর পর দুটো খবর এল। প্রথমটায় মঁতসুর মজুরদের জাঁ-বার্ত আক্রমণের কথা, দ্বিতীয় দফায় এল তার কাটা, চুল্লী নেবানো আর-আর ক্ষতির সংবাদ। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। কোম্পানির পিটে চড়াও না হয়ে ওরা দেনেউলিঁর পিটে গিয়ে হাজির হ'ল কেন? তা ছাড়া, ভান্দাম আক্রমণ তো সুসংবাদ; বিজয়ের পরিকল্পনা তাতে সফলই হবে। তিনি তো বহু আগেই ঐ কথা ভেবে রেখেছেন। দুপুরে একা খাবার ঘরে বসে খেয়ে নিলেন। নিঃশব্দে পরিচারক পরিবেশন করে গেল। তিনি তার চটির শব্দ অবধি শুনতে পেলেন না। এই নির্জনতায় উদ্বেগ আরো বেড়ে গেল। খারাপ লাগছে। এমন সময় ছুটতে-ছুটতে এল একজন সর্দার। সে ভিতরে এসে মিরু চড়াও হবার খবর দিলে। কাফি-পানের পর্ব শেষ করেছেন সবে, এমন সময় একখানা তার এসে হাজির। খবর পেলেন—মাদেলিন আর ক্রেভকুরেরও ভয় আছে। এবার উদ্বেগ চরমে উঠল। দুটোর ডাকের আশায় বসে রইলেন; তবে কি তাঁর ফৌজের জন্য তার করা উচিত? না—চুপচাপ থাকবেন—ডিরেক্টরদের হুকুমনামা না পেলে কিছু করবেন না? আবার অফিস-কামরায় ফিরে গেলেন। পুলিসের বড়কর্তার কাছে একটা বিবরণী পাঠানো দরকার। নিগ্রেলকে দিয়ে কাল লিখিয়েও রেখেছেন—সেইটাই পড়তে গেলেন। কিন্তু খুঁজে পেলেন না। ভেবে দেখলেন, হয়তো ছোকরা তার নিজের ঘরেই খসড়াখানা রেখে গেছে। ও রাতে তো নিজের কামরায় বসেই লেখাপড়া করে। কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। শেষে ছুটলেন উপরতলায় ভাগনের ঘরে খসড়ার সন্ধানে।

ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন, ঘর এখনো গোছানো হয়নি। নিশ্চয়ই হিপোলাইট ভুলেই গেছে, নয়তো এ তার কুঁড়েমি। সারা রাত বন্ধ থাকায় গুমোট লাগছে ঘরে। আগুনের কুণ্ডের ফোকর খোলা। নাকে এসে তীব্র গন্ধ লাগছে। মনে হ'ল মুখ-ধোবার বেসিনটা থেকে আসছে গন্ধ। বেসিনটায় জল এখনো জমা হয়ে আছে। ঘরখানা ভারি অগোছালো। এখানে-ওখানে পোষাকগুলো পড়ে আছে। ভিজে তোয়ালে চেয়ারের পিছনে ঝুলছে। বিছানাটাও এলোমেলো, একখানা চাদর তো গালচের উপর পড়ে আছে। তিনি আনমনা হয়েই সব দেখলেন। এবার তিনি কাগজপত্রে ভরতি টেবিলের দিকে এগিয়ে চললেন বিবরণীর খোঁজে। দু-দুবার কাগজগুলো খুঁজে দেখলেন। না—বিবরণী নেই। কোথায় ফেলেছে খ্যাপাটা?

হানাবু এবার ঘরের মাঝখানে চলে এলেন। প্রতিটি আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। হঠাৎ নজরে পড়ল, বিছানার মাঝখানে কি যেন একটা ঝলমল করছে। যেন আগুনের ফুলকি আর কি। যন্ত্রচালিতের মতো চলে এলেন, হাত বাড়িয়ে দিলেন। একটা গিল্টি-করা খুদে শিশি চাদরের ভাঁজের ভিতরে পড়ে আছে। তিনি চিনতে পারলেন। এই শিশিটা হানাবু-গৃহিণীর সঙ্গে সবসময়েই থাকে। কিন্তু এখানে যে কেন এল বুঝে উঠতে পারলেন না। কি করে এ শিশি আসবে পলের বিছানায়? হঠাৎ ফ্যাকাশে মেরে গেল তাঁর মুখ। তাহলে তাঁর স্ত্রী এই বিছানায়ই রাত কাটিয়ে গেছে!

হিপোলাইটের স্বর ভেসে এল, হুজুর, আপনাকে উপরে উঠতে দেখে এলাম...

সে এসে ঘরে ঢুকল। ঘরের দশা দেখে সে ঘাবড়ে গেল।

হা ভগমান! এখনো গোছগাছ কিছু হয়নি। রোজ সারা বাড়িটা আমার ঘাড়ে ফেলে বেরিয়েছে!

মুসিয়ে হানাবু শিশিটা হাতের মুঠোয় লুকিয়ে ফেললেন। জোরে চাপ দিচ্ছেন, ভেঙে ফেলেন আর কি!

কি চাও?

আর-একজন এয়েছে হুজুর। ক্রেভকুর থেকে চিঠি নিয়ে এয়েছে?

আচ্ছা, এখন যাও! আমি আসছি।

তাহলে তাঁর স্ত্রী এখানে রাত কাটিয়ে গেছে! দরজায় খিল এঁটে দিয়ে, হাতের মুঠো খুলে ফেললেন। শিশিটা দেখছেন। হাতের তেলোয় লাল দাগ রেখে গেছে, মাংসের ভিতরে যেন কেটে কেটে বসে গেছে দাগ।

হঠাৎ সবই পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। সবকিছুই স্পষ্ট দেখছেন। এই কেলেঙ্কারি তাঁর বাড়িতে মাসের পর মাস ধরে চলছে। গোড়ার দিকে সন্দেহও করতেন। আবার সেকথা মনে পড়ল। দরজার আড়ালে পোষাকের খস্‌খস্‌, রাতে নিস্তব্ধ বাড়িতে খালি পায়ের শব্দ! হাঁ তাঁর স্ত্রী এইখানেই ঘুমোতে আসত রোজ! বিছানার উলটো দিকের চেয়ারখানায় ধপ্‌ করে বসে পড়লেন। চেয়ে-চেয়ে দেখছেন শয্যা। মনে হ'ল যেন হতচেতন হয়ে গেছেন। সোরগোল শুনে জেগে উঠলেন, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, খুলতে চেষ্টা করছে। খানসামার স্বর শোনা গেল,

হুজুর—ওঃ, আপনি দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন হুজুর!

আবার কি হ'ল?

খুব জরুরী ব্যাপার হুজুর! ওরা নাকি সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলছে। আরো দু'জন ছুটে এয়েছে। কত যে তার এল হুজুর!

যাও-যাও! আমি এখুনি আসছি।

ভোরে হিপোলাইট যদি ঘর গোছাতে আসত—সেই প্রথম আবিষ্কার করত এই শিশি—এই ভেবেই তাঁর রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। যাই হোক, খানসামাটা সব খবর রাখে। কত বার ঘর গোছাতে এসে সে হয়ত অবৈধ-সম্পর্কে উষ্ণ এই শয্যা দেখে ফেলেছে। গৃহকর্ত্রীর চুল আবিষ্কার করেছে বালিশে, আর চাদরে দেখেছে বিশ্রী দাগ—অবৈধ সম্পর্কের স্পষ্ট স্বাক্ষর। তাই বুঝি বার বার ঘুর ঘুর করে আসছে। এ তো নিছক ওর কৌতূহল। হয়তো দরজায় কান

পেতেও শুনেছে। হুজুর-হুজুরাণীদের জঘন্য কামনার উৎসবের সাক্ষী হয়েছে।

হানাবু নড়লেন না। এখনো শয্যার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর দুঃসহ জীবন যেন পরতে পরতে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে। এই স্ত্রীলোকটার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'ল, শুরু হয়ে গেল মনের অমিল, দেহের অবনিবনাও। তার প্রেমিকদের নামও সে জানতে দেয়নি। আর একটি প্রেমিককে তো দশ বছর ধরে তিনি সয়ে ছিলেন—যেমন করে কোন মেয়ের অস্বাভাবিক আচার-ব্যবহার সয়ে থাকতে হয়—এত যেন তাই। তার পরে এলেন মঁতসুতে। ওকে আরোগ্য করবার দুর্দম ইচ্ছা পেয়ে বসল। স্ত্রীও কুঁড়েমিতে গা ঢেলে দিলে। এ যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নির্বাসন ভোগ আর কি। প্রৌঢ়ত্ব এসে গেল—তিনি ভাবলেন এবার হয়তো তাকে ফিরে পাবেন। তার পরে এল ভাগনে পল। পলের কাছে সে মার ভূমিকা অভিনয় করে গেল। তার মৃত আত্মার কথা বললে, বললে মৃত কামনার কথা। ছাইয়ের গাদায় তাকে সে কবর চাপা দিয়েছে। আর তিনি অক্ষম, পঙ্গু স্বামী, তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি তো ওকে ভালবাসেন। অন্যেরা তাকে উপভোগ করেছে, কিন্তু তিনি তো তাকে পাননি। নির্লজ্জ কামনা তাঁর, তিনি তাকে সেই কামনা দিয়ে ভালবেসেছেন। ও যদি তাঁকে অন্য লোকে যে এঁটোটুকু ফেলে রেখে গেল, সেটুকুও দিত, তিনি তার পায়েই লুটিয়ে পড়তেন! কিন্তু অন্যের উচ্ছিষ্টটুকুও সে এই ছেলেটাকে বিলিয়ে দিলে!

দূরে ঘণ্টা বাজল। মঁসিয়ে হানাবু চমকে উঠলেন। চিনলেন। এ-তাঁরই হুকুমে ঘণ্টা বাজান হ'ল। ডাক এলে এই তাঁর নির্দেশ। উঠে পড়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, অবরুদ্ধ গালি-গালাজ তোড়ে ছুটে চলল।

ওরা গোল্লায় যাক! গোল্লায় যাক ওদের তার আর চিঠি—চিঠি আর তার!

রাগে দিশেহারা হয়ে গেছেন। একটা নর্দমা চাই—সেখানে সবকিছু নোংরামি তিনি পা দিয়ে চেপে চেপে ঢুকিয়ে দেবেন। মাগীটা কুত্তির পয়দা কুত্তি! আরো জোরালো অশ্লীল কথা খুঁজলেন—ওর মুখের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবেন। হঠাৎ মনে পড়ল—সিসিল আর পলের বিয়ের সম্বন্ধ করছে মেয়েমানুষটা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে—হাসতে-হাসতে! এতে আরো ক্ষেপে গেলেন? এই যে উচ্ছৃঙ্খলতা—এর ভিতরে কি কামনা নেই—এক ফোঁটা ঈর্ষা নেই! না—এ এক নীচ আমোদে এসে দাঁড়িয়ে গেছে! সে পুরুষ চায় বিশ্রামকালের অভ্যাস হিসেবে—ভোজের পরে এ যেন চিরাচরিত মিষ্টিমুখের পর্ব। তিনি তাকেই দোষী করলেন—ছেলেটা তো নির্দোষ। মেয়েমানুষটা তাকে এই খিদের সময় কামড়ে দিয়েছে—এমনি করে তো পথের পাশের বাগান থেকে কাঁচা ফল চুরি করে এনে মানুষ তাতে কামড় বসায়। যখন এমন অনুগত ভাগনের পালা সাঙ্গ হবে—তখন কাকে সে গ্রাস করবে? কোন পাপে তলিয়ে যাবে? এমন প্রেমিক তো আর সে পাবে না যে, ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসবে, বিছানা দখল করবে, গৃহস্বামীর স্ত্রীকে সুদ্ধ দখল করে বসবে।

দরজায় আবার টোকা পড়ছে। ভীরু শব্দ। হিপোলাইট চাবির গর্তের ভিতর দিয়ে ফিসফিস করে বললে,

হুজুর, ডাক এয়েছে...মঁসিয়ে দাঁসারও এয়েছেন, তিনি বলছেন হুজুর, খুনখারাবি হয়ে গেছে।

গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও! আসছি!

তিনি কি করবেন? ওরা মার্সিয়েনে থেকে ফিরে এলেই ওদের কি তাড়িয়ে দেবেন—ওরা জঘন্য জানোয়ার—ওদের তিনি বাড়িতে ঠাঁই দিতে তো পারেন না! তিনি একটা লাঠি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন, সাফ বলে দেবেন, ওরা যেন আর কোথাও গিয়ে দেহের ঐ জঘন্য যৌন আনন্দ উপভোগ করে! ওদের দু'জনের মিলিত নিঃশ্বাস আর দীর্ঘশ্বাসে ঘরের হাওয়া যেন গুমোট হয়ে আছে। ঐ যে কটু গন্ধ নাকে এসে লাগছে, সে তো ঐ মেয়েমানুষটার গায়ের কস্তুরী গন্ধ। তাঁর স্ত্রীর আর এক জঘন্য রুচি—সে যেন এসেন্সের কটুগন্ধের মোহে মত্ত। সারা ঘরে যেন খুঁজে পেলেন সম্ভোগের উষ্ণতা আর গন্ধ, অবৈধ সম্ভোগ যেন জীবন্ত বাস্তব হয়ে দেখা দিল। ঐ যে পাত্রগুলো এ-পাশে ও-পাশে ছড়িয়ে আছে, ঐ যে পরিপূর্ণ বেসিন, ঐ যে কুঁচকানো-দোমড়ানো চাদর, আসবাবপত্র ছত্রখান—এই পাপ ঘরে ঐ সবগুলো থেকে যেন নগ্ন নির্লজ্জ বাস্তব চুইয়ে পড়ছে। নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। যেখানে যেখানে যুগ্ম দেহের ছাপ রয়ে গেছে, তারই উপর আঘাত হানলেন। এলোমেলো বিছানা কুঁচকানো চাদরের উপর পড়ল তাঁর আঘাত। বিছানা তেমনি নরম এখনো, তেমনি নিষ্ক্রিয়—সারা রাতের উদ্দাম কামনার উৎসবের পর তারাও বুঝি ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ মনে হ'ল, হিপোলাইট আবার আসছে, তিনি লজ্জায় অধীর হয়ে উঠে বসলেন। এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর মুছে ফেললেন কপাল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, বুকের স্পন্দন থামাতে চেষ্টা করছেন। আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুখখানা এমন বদলে গেছে যে, নিজেকে চেনাই যায় না। আস্তে আস্তে মুখের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে আসছে—তাই তাকিয়ে দেখছেন। এবার সমস্ত শক্তি জড়ো করে নীচে নেমে এলেন।

দাঁসার ছাড়া আরো পাঁচজন আরিন্দা এসে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মঘটীরা পিট থেকে পিটে টহল দিচ্ছে, আর একদল আর-একজনের চেয়ে মন্দ খবরই এনেছে। মিরুতে কি হয়েছে, কি করে পিটটা বুড়ো কোয়ানদিউর বুদ্ধিতে রেহাই পেল, সেকথা তিনি শুনলেন সেখানকার খনির সর্দারের কাছ থেকে। তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, কিন্তু এদিকে মন নেই। এখনো উপরের ঘরে পড়ে আছে মন। তিনি এর একটা বিহিত করবেন এই বলে তাদের বিদায় দিলেন। অফিস-কামরায় এসে তিনি বসলেন। একেবারে একা—হাতে মাথা গুঁজে পড়ে রইলেন। বুঝি ঘুমিয়েই গেছেন। কিন্তু চিঠিপত্র জমে আছে—শেষে তিনি উপরওয়ালার জবাবখানা বেছে বার করলেন। চোখের সামনে হরফগুলো যেন নাচছে। শেষে অনেক করে মর্মোদ্ধার হ'ল—কর্তারা আশা করছেন—ব্যাপারটা একেবারে মুখোমুখী লড়াইয়ে গিয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য, তাঁরা তাঁকে ব্যাপারটা ঘোরালো করে তুলতে বলছেন না, তবে তাঁরা জানাচ্ছেন—একটা কিছু দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলে ধর্মঘট তাড়াতাড়ি শেষ হবে। জোর-জুলুম করে দাবিয়ে দেবার যুক্তিরই এমনি সমর্থন করেছেন। তাঁর দ্বিধা

দূর হ'ল, তিনি দিকে দিকে তার পাঠালেন। লিল্-এর পুলিসের বড় কর্তা দুয়াই-এর সেনা নিবাসে আর মার্সিয়েনের পুলিস দপ্তরে তার চলে গেল। যাহোক এতে খানিকটা স্বস্তি মিলল। দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকতে পারবেন—এমন কি রটিয়ে দিতে পারবেন—গেঁটে বাতে ধরেছে।

সারা বিকেলটা অফিসেই কেটে গেল। কারো সঙ্গে দেখা করলেন না। বসে বসে পড়লেন অন্তহীন তার আর চিঠির স্তূপ। সে স্তূপ বাড়ছে তো বাড়ছেই। এমনি করে ধর্মঘটীদের মাদলিন থেকে ক্রেভকুরে, ক্রেভকুর থেকে লা ভিক্তরে, লা ভিক্তর থেকে গাস্তঁ-মারি অভিযানের খবর পেলেন। পুলিস আর ফৌজের গতিবিধির কথাও জানা গেল। ওরা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে—শুধু পথ হারিয়ে ঘুরছে—যে পিটে হামলা হচ্ছে—সেখান থেকেই ওরা সরে পড়ছে। তাতে কি যায় আসে তাঁর? ওরা খুন করুক, করুক ধ্বংস! তিনি মাথা গুঁজে রইলেন, হাতের আঙুল দিয়ে চোখ ঢেকে আছেন। শূন্য বাড়ির গভীর নিস্তব্ধতায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে রাঁধুনীর সসপ্যানের শব্দে। সে রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত।

এরই মধ্যে ঘরখানা আঁধারে ভরে গেল। পাঁচটা বাজে। মঁসিয়ে হানাবু এখনো হতচকিত, এখনো যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কাগজপত্রের ভিতরে কনুই ডুবিয়ে বসে আছেন। এমন সময় এক জোর আওয়াজে চমকে উঠলেন। মনে হ'ল, ঐ দুটো আপদ ঘরে ফিরে এসেছে! কিন্তু সোরগোল বেড়ে চলল। তিনি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এক ভীষণ চীৎকার উঠল;—

রুটি—রুটি—মোরা রুটি চাই!

ধর্মঘটীরা এবার এসে মঁতসুর উপর চড়াও হয়েছে। পুলিস ভোরোর উপর হামলা হবে এই আশঙ্কায় ঘোড়সওয়ার হয়ে পিট দখল করতে উল্টো দিকে ছুটেছে।

ঠিক এই সময়ে, শহরের প্রথম বাড়ি থেকে দু কিলোমিটার দূরে, সদর সড়ক যেখানে ভান্দামের পথে এসে মিশেছে তার কিছু আগে, মাদাম হানাবু আর তরুণী ভদ্রমহিলারা জনতার মিছিল চলে যাচ্ছে দেখতে পেলেন। মার্সিয়েনেয় দিনটা ভালই কেটেছে, ফোর্জোসের ম্যানেজারের বাড়িতে দুপুরের ভোজটাও বেশ পরিপাটি হয়েছিল, তারপরে কাচের কারখানা দেখে বিকেলটাও কেটেছে ভাল। ফিরতি পথে সিসিলির মাথায় হঠাৎ একটা ফন্দি গজাল। শীতের সুন্দর দিন এখন দীপ্তিমান সায়াহ্নে শেষ হতে চলেছে। পথের ধারে এক খামারবাড়ি দেখে সিসিলির খেয়াল হ'ল, এক গেলাস দুধ খাবে, সবাই নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে; নিগ্রেলও ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। চাষী-বৌ ভদ্রলোকদের আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে ছুটছে, দুধ দেবার আগে একখানা টেবিল-ঢাকনা পেতে দেবার কথাও পাড়লে, লুসি আর জিনি ওভাবে দুধ খেতে চায় না। তারা গরু দোয়া দেখতে চায়। পেয়ালা নিয়ে সবাই গোয়ালে এল। একেবারে গেঁয়ো দল যেন, খড়ের গাদায় পা ডুবে ডুবে যাচ্ছে আর হাসছে ওরা।

হানাবু-গৃহিণী মার মতো শিশুদের যেন আবদার রক্ষা করছেন। নিজের

পেয়ালাটিতে চুমুক দিচ্ছেন আর হাসছেন, এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে এল এক অদ্ভুত গর্জন। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

ব্যাপার কি?

গোয়ালটা পথের ধারে। দরজা দুটো মস্ত বড়, গাড়ি আসা-যাওয়ার জন্যে তৈরী। এখানে বিচালীও গাদা করে রাখা হয়। মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে দেখে অবাক হয়ে গেল, এক কালো বন্যার ধারা যেন বাঁ দিক থেকে বয়ে আসছে। জিগির তুলতে তুলতে ভান্দাম রোড দিয়ে ওরা চলেছে।

কি ব্যাপার! নিগ্রেলও বেরিয়ে এল। ওরা কি শেষে একটা কান্ডই বাঁধাবে।

চাষী-বৌ বললে, আবার মাল-কাটারা হইচই করতি লেগেছে। দু-দুবার তো হেথা দিয়ে মিছিল করে গেল। তা ওদের গতিক ভাল না। এতল্লাট এখন ওদেরই দখলে।

আস্তে আস্তে বলছে চাষী-বৌ—ওদের মুখের উপর তার চোখ, ওদের ভয় পেতে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল ঃ—

যত সব পাজী—পাজী—বেহদ্দ পাজী!

নিগ্রেল বুঝলে, এখন আর গাড়ি করে মঁতসু যাওয়া চলবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে খামারবাড়ির উঠোনে গাড়িটা আনতে বললে। গাড়ি এলে সেটা একটা চালার আড়ালে রাখা হ'ল। একটা বাচ্চা ঘোড়ার লাগাম ধরে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। নিগ্রেল গাড়ি থেকে ঘোড়াটিকে খুলে নিয়ে চালার ভিতরে বেঁধে রাখলে। ফিরে এসে নিগ্রেল দেখলে তার মামী আর মেয়েরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। তারা চাষী-বৌয়ের পরামর্শমতো তার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবে ঠিক করেছেন। কিন্তু নিগ্রেল আপত্তি তুলল। সে বললে, যেখানে আছে এইখানেই ভাল। কেউ আর খড়ের গাদায় তাদের খোঁজ করতে আসবে না। দরজা কিন্তু তেমন আঁটো করে বন্ধ করা গেল না—পচা-কাঠে এমন সব ফুটোফাটা যে পথ বেশ ভাল করেই দেখা যাচ্ছিল।

নিগ্রেল সবাইকে বললে, সাহস হারাবেন না। আমাদের জীবন যদি যায়ও, তার চড়া দাম আদায় করে তবে ছাড়ব।

এ ঠাট্টায় ভয়ই আরো বেড়ে গেল। গোলমাল আরো কাছে আসছে, আরো জোরালো হয়ে উঠছে, কিন্তু এখনো কিছু দেখা যায় না। শূন্য পথে যেন ঝড়ো হাওয়া উঠেছে। প্রবল ঝড়ের আগে এমনি দমকা হাওয়া বয়ে যায়।

না, না, আমি দেখতে চাইনে, সিসিলি খড়ের গাদায় লুকোতে চলল।

হানাবু-গৃহিণীরও মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যারা তাঁর স্ফূর্তি মাটি করে দিলে—তাদের উপর তাঁর বেজায় রাগ। তিনি বিরক্তভরে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। লুসি আর জিনিও ভয়ে কাঁপছে, তবু দরজার ফুটোয় চোখ রেখেছে। এমন ব্যাপারটা তারা না দেখে ছাড়বে না।

কাদের হাঁকডাক উঠল। মাটি কাঁপছে। জাঁলিন লাফিয়ে এল পয়লা সারে, ভেঁপু বাজাচ্ছে।

নিগ্রেল বলে উঠল, আপনাদের সুগন্ধি নির্যাসের শিশি বার করুন, জন-

গণের ঘাম জবজবে মিছিল চলে যাচ্ছে। গণতন্ত্র তার আদর্শ হলেও ভদ্র-মহিলাদের সঙ্গে যখন থাকে, তখন জনগণকে নিয়ে বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না।

কিন্তু এ বিদ্রূপ অঙ্গভঙ্গি আর জিগিরের ঝড়ে মিলিয়ে গেল। মেয়েরা এসে দেখা দিয়েছে। প্রায় হাজারখানেক হবে। চুল তাদের ছুটে ছুটে এলো-মেলো, ছেঁড়া কানির ভিতর দিয়ে নগ্ন দেহ বেরিয়ে পড়ছে—বুভুক্ষু সন্তান প্রসব করে করে ক্লান্ত নারীর নগ্নতা। কয়েকজনের কোলে রয়েছে সন্তান, তাদের তুলে ধরছে, নাড়ছে—ওরা যেন দুঃখ আর প্রতিশোধের অভিজ্ঞান—ওদের নিশান। কেউ কেউ বা তরুণী—বীরাঙ্গনাদের মতো স্ফীত ওদের বুক, ওরা লাঠি ঘোরাচ্ছে। আর বুড়ীরা চেঁচাচ্ছে জোরে—মনে হয় ওদের অস্থি-চর্মসার গলার নালীই বুঝি ছিঁড়ে যাবে। এবার এল পুরুষের দল। দু'-হাজার খ্যাপা মানুষ—মাল-কাটা গাঁইতি-চালিয়ে, মেরামতি মিস্ত্রী—এক ঘন জনতা যেন—গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে একই সঙ্গে এলোমেলো হয়ে। ওদের বিবর্ণ ট্রাউসার আর ছেঁড়া পশমী কোর্তা আর চেনা যায় না—সব যেন একাকার হয়ে গেছে। ধুলোমাটি-মাখা জনতা মিশে গেছে পথের ধুলোমাটির সঙ্গে। মাটি আর মজুরে সমতা এনে দিয়েছে। শুধু দেখা যায় ওদের জ্বলন্ত চোখ, ওদের মুখের কালো গহ্বর থেকে উঠছে লা মার্সাঈ—ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত। গান এখন তো আর গান নয়—এক বিক্ষিপ্ত গর্জন। তারই তালে তালে কঠিন মাটির বুকে গোড়তোলা জুতোর খটখটাখট আওয়াজ। ওদের মাথার উপরে একখানা কুড়ুল আর বহু ডান্ডা। কিন্তু এই কুড়ুলই এই জনতার ঝান্ডা—আকাশের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে কুড়ুলখানা। ঠিক যেন গিলো-টিনের ফলা (ফরাসী দেশে ফাঁসির বদলে গিলোটিন নামে যন্ত্রে শিরচ্ছেদ করবার প্রথা চালু)।

উঃ, কি ভয়ঙ্কর মুখের সার! হানাবু-গৃহিণী বলে উঠলেন।

নিগ্রেল বিড়বিড় করে বললে,

উঃ, একটিকেও যদি চেনা যায়! এ-পাজীগুলো কোত্থেকে এল ?

সত্যিই ওদের চেনা যায় না। দু মাস ধরে ওরা সইছে দুঃখ, ওরা তিলে তিলে ক্রোধে পুড়েছে, ক্ষুধায় জ্বলছে—আর পিটে পিটে এই বর্বর অভিযানে মঁতসুর মজুরদের শান্ত নিরীহ রূপ বদলে গেছে। ওদের দেখে হিংস্র বন্য জন্তুর চোয়ালের কথাই মনে পড়ে। অস্তমান সূর্যের শেষ লাল আলো এসে পড়ল প্রান্তরের উপর। রক্তে লাল হয়ে গেল মাটি, পথ ঘাটও যেন রক্তনদী। পুরুষ আর মেয়েদের মিছিল চলেছে, কষাইখানার কষাইদের মতোই ওরা রক্তে মাখামাখি। লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে মিছিল।

উঃ চমৎকার! লুসি আর জিনি ফিসফিসিয়ে উঠল, এই ভয়াল সৌন্দর্য ওদের শিল্পীমনকে নাড়া দিয়ে গেছে।

তবুও ভয় তারা পেয়েছে, তাই হানাবু-গৃহিণীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তিনি একটা জালার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও ভয়ে জমে গেছেন দরজার ফুটো-ফাটার দিকে তাকিয়ে। ঐ নড়বড়ে দরজা তাঁদের মৃত্যুর কারণ হবে। নিগ্রেলের মুখখানাও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সিসিলি খড়ের গাদায় নড়ছে-চড়ছে না। আর-সবাই চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। সবাই ফোকর দিয়ে তাকিয়ে আছে।

ওরা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে বিপ্লবের রক্ত আভাস—এক রক্তসন্ধ্যায়, যুগ-সন্ধিক্ষণে সে তো ওদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে, মুছে ফেলবে। হাঁ, এ তো অবশ্যম্ভাবী। এই-ই তো হবে। এক সন্ধ্যায় মানুষ তার রাশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে এমনি করে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসবে, মধ্যবিত্তের রক্ত ঝরবে, তাদের ছিন্নমুণ্ড প্রদর্শিত হবে, ওদের ছেঁড়া থলি থেকে ঝরে পড়বে রাশি রাশি মোহর। মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠবে জোরে, আর পুরুষদের নেকড়ে বাঘের চোয়াল হাঁ হয়ে কামড়াতে যাবে। হাঁ, সেদিনও এমনি ছেঁড়া কানি দেখা দেবে, এমনি বাজের মতো উঠবে গোড়াতোলা জুতোর আওয়াজ। এমনি কালিঝুলিমাখা নোংরা দেহ নিয়ে ভয়ঙ্কর সেনাদল চলবে, তাদের নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ উঠবে—বর্বর জাতির উথলে-ওঠা বন্যায় মুছে যাবে পুরানো পৃথিবী। আগুন উঠবে লেলিহ শিখায় জ্বলে; ওরা শহরগুলির একখানা পাথরও আস্ত রাখবে না। আদিম বন্য জীবনে আবার ফিরে যাবে। এই আগুনের পরে, ভুরি-ভোজের পরে, এক রাতের মধ্যে গরীব-গুরবোর দল ধনীদের গুপ্ত ধনাগার শূন্য করে লুটেপুটে নেবে, তাদের মেয়েদের চিরে ফেলবে পেট। কেউ আর বাকি থাকবে না। শুধু থাকবে অরণ্যের আদিম বর্বর জীবন। কিছুই থাকবে না—একটা আধলাও না—অর্জিত সম্পত্তির একখানা দলিল পর্যন্ত না। তারপরে রাত হবে ভোর, হয় তো নতুন দুনিয়া আব্‌বার দেখা দেবে। হাঁ, ঐ যে নতুন পৃথিবীর মানুষ চলেছে পথে। ওরা যেন প্রকৃতির অন্ধ দুর্নিবার শক্তি। ধনীর মুখের উপর এসে লাগছে তাদের দুর্নিবার গতির হাওয়া।

আবার উঠল বিশাল গর্জন, লা মার্সাঈ ছাপিয়ে উঠে এল!

রুটি—রুটি—রুটি চাই!

লুসি আর জিনি হানাবু-গৃহিণীর কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল। তিনি তো মূর্চ্ছিত প্রায়, নিগ্রেল তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। যেন দেহ দিয়ে রক্ষা করতে চায়। পুরানো সমাজ-ব্যবস্থায় কি আজ সন্ধ্যায় চিড়ফাট ধরেছে? ওরা এর পরে যা দেখল, তাতে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। জনতা চলে যাচ্ছে, শুধু ক'জন পিছিয়ে আছে। এবার এল মোকে-ছুঁড়ি। সে একটু পিছিয়ে পড়েছিল, মধ্যবিত্তদের দেখছিল বাগিচার ফটকে, কি বাড়ির জানালায়। ওদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দেবার তো জো নেই দূর থেকে, তাই সে ওদের দেখে নিজেই চরম ঘৃণারই প্রমাণ দিচ্ছিল। হয়তো এবারে ও কাউকে দেখতে পেল। অমনি সে তুলে ফেলল তার ঘাগরা, নুয়ে পড়ে দেখাল তার বিরাট উলঙ্গ নিতম্ব। অস্তমান সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠল সাদা মাংসের স্তূপ। কেউ কিন্তু হেসে উঠল না। ঐ অঙ্গভঙ্গিতে অশ্লীলতা তো নেই, আছে তীব্র ঘৃণা।

সবাই এবার মিলিয়ে গেল। বন্যা গড়িয়ে চলেছে ম'তসুর দিকে। পথের বাঁকে বাঁকে, দগ্‌দগে রক্তে রঙীন নীচু বাড়িগুলোর মাঝখানে ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছে বন্যা। উঠোন থেকে বার করা হয়েছে গাড়ি, কিন্তু গাড়োয়ান মনিবাণী আর ভদ্রমহিলাদের নিয়ে বেরুতে নারাজ। ধর্মঘটীরা পথ ছেয়ে ফেলেছে। পথ এখন তাদের দখলে। আর সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার, আর দ্বিতীয় পথ নেই।

হানাবু-গৃহিণী বললেন, আমাদের এখন ফেরা দরকার, এখনি ডিনার তৈরি

হয়ে যাবে। অতিথি এল, আর ঐ পাজিগুলো অমনি হামলা করার দিনটা বেছে নিলে। অমন পাজিদের ভাল কে করবে বল!

লুসি আর জিনি সিসিলিকে খড়ের গাদা থেকে টেনে তুলতে ব্যস্ত। সে হাত পা ছুঁড়ছে। তার বিশ্বাস, ঐ অসভ্যগুলো এখনো পথে চলেছে। সে বার বার জানালে, ওদের মুখ সে দেখতে চায় না। অবশেষে ওরা সবাই এসে গাড়িতে উঠলেন। নিগ্রেল ঘোড়ার পিঠে আবার সওয়ার হয়ে বসেছে। তার হঠাৎ মনে হ'ল, রিকুইলারের পথ দিয়ে বোধ হয় যাওয়া যেতে পারে।

গাড়োয়ানকে সে হুকুম দিলে, আস্তে আস্তে চালাও। রাস্তাটা খুব খারাপ। যদি ভিড় দেখ তো ঐ ছাড়া পিটের আড়ালে গাড়ি রাখবে। আমরা বাগানের ফটক দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে যাব। তুমি যেখানে হয় গাড়ি আর ঘোড়া রেখে দেবে—কোন সরাইখানার আস্তাবলেও রাখতে পার।

ওরা রওনা হ'ল। দূরের মিছিল এখন মঁতসুতে ঢেউয়ের মতো ঢুকে পড়েছে। শহরের বাসিন্দেরা দু-দুবার পুলিস আর ফৌজের টহল দেখে ভয় পেয়ে গেছে। উত্তেজনায় তারা অধীর। জোর গুজব রটছে হাতে-লেখা ইস্তাহারের কথাও শোনা যাচ্ছে—তাতে নাকি ওরা শাসিয়ে ঘোষণা করেছে, বুর্জোয়াদের নাদা পেট ওরা চিরে ফেলবে। কেউ এ-ইস্তাহার দেখেনি, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে ইস্তাহারের উদ্ধৃতি দিতে তবু বাধছে না। শহরের সরকারী উকিলের বাড়িতে ভয়টা বেশি। এক উড়ো চিঠি এসেছে ডাকে, তাতে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে, তাঁর বাড়ির সেলারের নীচে এক পিপে বারুদ রাখা হয়েছে। তিনি যদি জনগণের পক্ষে যোগ না দেন তাহলে তাঁকে বাড়িসুদ্ধ উড়িয়ে দেওয়া হবে।

যখন চিঠিখানা আসে গ্রিগোয়েররা সেখানে ছিলেন। এতেই দেরি হয়ে গেল। সবাই মিলে আলোচনাও চলে। শেষে এই সিদ্ধান্তই হয় যে, জনতা যখন চড়াও হয়ে বাড়িতে বাড়িতে ভীতির ঢেউ বইয়ে দিয়েছে, তখন কেউ তামাশা করে লিখেছে চিঠি। বড় নিষ্ঠুর এই তামাশা এই যা! বাড়ির লোকরা ভয় পেয়েও হাসছে, পর্দার এক কোণ ধরে তুলে বাইরে দেখতে চেষ্টা করছে। তারা স্বীকার করতে চায় না যে, কোন ভয় আছে। সব কিছুই মিট-মাট হয়ে যাবে এই তাদের স্থির বিশ্বাস। পাঁচটা বাজল। পথ পরিষ্কার হবার জন্যে সময়ও মিলেছে ঢের। এবার গ্রিগোয়েররা চললেন মঁসিয়ে হানাবুদের বাড়িতে ভোজে। সেখানে সিসিলি এতক্ষণে ফিরে এসে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু মঁতসুর আর কারো ওদের মতো এমন নিশ্চিন্ত ভাব নেই। ভয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করছে মানুষ—দরজা-জানালা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওঁরা পথে চেয়ে দেখলেন, মাইগ্রাত তার দোকানের চার পাশের লোহার ডান্ডা পুঁতে প্রতিরোধ-প্রাকার তৈরি করছে। একেবারে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ। কাঁপছে ঠক ঠক করে। বেচারী বৌকে তাই নাট-বল্টুগুলো আঁটতে হচ্ছে।

জনতা এবার ম্যানেজারের কুঠির সুমুখে এসে দাঁড়াল। আবার চীৎকার উঠল ঃ—

রুটি—রুটি—রুটি!

মঁসিয়ে হানাবু জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হিপোলাইট খড়খড়ি বন্ধ

করে দিয়ে ছুটে এল, কি জানি হয় তো ঢিল পড়ে শার্সিগুলো চুরমার হয়ে যাবে। নীচের তলাটা সে বন্ধ করে এসেছে, তারপরে এসেছে দোতলায়। ছিটকিনি এঁটে দেওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর শার্সি খড়খড়ি বন্ধ করার শব্দ। কিন্তু কি বরাত, রান্নাঘরের জানালা বন্ধ করা গেল না। অথচ সসপ্যান আর উনুনের জেল্লায় ঝলমল করে উঠছে জানালা।

মঁসিয়ে হানাবু দেখতে চান জনতার এই জোয়ার, তাই তেতলায় উঠে এলেন। খোদকারী কলের মতো চলে এলেন পলের ঘরে। বাঁ দিকে ঘরখানি। জায়গাটি ভাল। এখান থেকে রাস্তা দেখা দেয়। কোম্পানির ইয়ার্ড অবধি চোখে পড়ে। তিনি খড়খড়ির পিছনে এসে দাঁড়ালেন, দেখছেন ভিড়। আবার ঘরের দিকে নজর পড়ল। মুখ ধোবার বেসিনটা এখন পরিষ্কার। পাটভাঙা পরিষ্কার চাদর বিছানো বিছানায়। ছাপ পড়েনি মানুষের তাই ঠাণ্ডা। সারা বিকেলের প্রজ্বলন্ত ক্রোধ আর এই বিরাট নিস্তব্ধতায় তাঁর এই সংগ্রাম যেন এখন অসীম ক্লান্তিতে পরিত্যক্ত। এই ঘরখানির মতোই তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব এখন জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সকালের আবর্জনা আর নেই। ঝেঁটিয়ে সাফ করা হয়েছে। আবার এসেছে চিরাচরিত সেই পরিচ্ছন্নতা। যেন আত্ম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেলেঙ্কারি করে লাভ কি? এমন তফাৎটা কোথায়? তাঁর স্ত্রী আর-একজন প্রেমিক জুটিয়ে নিয়েছে মাত্র। পরিবারের মধ্যে, জুটিয়ে কি এমন মন্দ করেছে—হয়তো এতে একটু সুবিধেই আছে—এতে মুখপাতটুকু বজায় থাকবে। ঈর্ষাপ্রণোদিত ক্রোধের উচ্ছ্বাস এখন খতিয়ে দেখে খারাপই লাগল। বড় করুণ, বড় ক্লীব এই ক্রোধের আবেগ। উঃ, তিনি ঘুষি পাকিয়ে ঐ বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন! ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কতজন প্রেমিককে তো সহ্য করেছেন, এও না হয় আর-একজন বাড়ল!

শুধু ওকে আর একটু বেশি ঘৃণাই করবেন। মুখ বিস্বাদ হয়ে এল। সবকিছুই তুচ্ছ তাঁর কাছে—ঐ স্ত্রীলোকটাকে এক সময়ে পূজা করতেন, এখনও সে তাঁর কামনার ধন, তিনি তো তাকে আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন—তবুও তাকে চান!

জানালার নীচে আবার তীক্ষ্ন চীৎকার উঠল!

রুটি—রুটি—রুটি চাই!

মূর্খের দল! হানাবু দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন।

শুনলেন, ওরা তাঁকে মোটা মাইনের জন্য গালাগাল দিচ্ছে—ভুঁড়িয়ালা অকর্মণ্য বলে চীৎকার করে উঠছে। রক্তচোষা পশু তিনি; তাই খেয়ে খেয়ে তাঁর বদহজম হয়েছে আর মজুররা না খেতে পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। রান্নাঘরখানা দেখে ফেলেছে মেয়েরা, সেখানে পাখী ভাজা হচ্ছে—সসে চর্বিতে সেদ্ধ হচ্ছে—খোসবাইতে শূন্য পাকস্থলী বার বার মোচড় দিয়ে উঠেছে। তার ফল তো ফলবেই। ফেটে পড়ল গালাগাল। ওরে রক্তচোষা মালিক—ওরে! ওরা শাম্পেন গিলুক আর যত খাবার পেটে ঠুসুক—ঠুসতে ঠুসতে পেট ফেটে যাক!

রুটি—রুটি—রুটি চাই!

ওরে মূর্খের দল! হানাবু বার বার আপন মনে বলতে লাগলেন; তোরা কি ভাবিস আমিই সুখী?

এই মানুষগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধের সীমা নেই, ওরা তো বুঝবে না তাঁর ব্যথা। ওদের মত মজবুত চামড়া পেলে, ওদের মতো যদৃচ্ছা যৌন-সম্ভোগ করতে পেলে উনি তো ওঁর মোটা মাইনে ওদের বিলিয়ে দিতে পারেন। ওদের কি আনন্দ! মেয়ে সহজে আসে। সহজেই চলে যায়। উনি ওদের নিজের খাবার টেবিলে ডেকে আনবেন, পাখীর মাংস খাইয়ে ওদের পেট ভরিয়ে দেবেন—আর নিজে ঝোপের আড়ালে করবেন যৌনসম্ভোগ। কোন মেয়ে কার ভোগে এসেছে, একথা চিন্তা না করে যে-মেয়েকে পাবেন তাকেই মাটিতে পেড়ে ফেলবেন। কেন—তা পারবেন না? এর জন্যে সব কিছু তিনি বিসর্জন দিতে পারেন—তাঁর শিক্ষা, আরাম, বিলাসী জীবন, ম্যানেজারী ক্ষমতা—সব-কিছু। শুধু যদি একটি দিন হতভাগা মানুষগুলোর মতো হতে পারেন—নিজের কামনা-মুক্তি দিতে পারেন—উচ্ছৃংখল বদমায়েস হয়ে স্ত্রীকে পিটতে পারেন—আর পড়শীর স্ত্রীর সংগে পারেন স্ফূর্তি লুটতে! আহা যদি তা পারতেন! তাঁর ইচ্ছে হ'ল, তিনিও উপবাসে ধুঁকে ধুঁকে মরবেন, শূন্য পাকস্থলী ব্যথায় কঁকিয়ে উঠবে, মাথা ঘুরবে—হয়তো তাতে নির্মম দুঃখের দহন থেকে পাবেন নিষ্কৃতি। ঐ আদিম জীবন তাঁর কাম্য—আর কিছু চাই না—মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াবেন কুশ্রী আর নোংরা কুলি-কামিনদের সংগে—এমনি করেই সুখী হবেন।

রুটি—রুটি—রুটি চাই!

তুমুল চীৎকার ছাপিয়ে উঠল তাঁর ক্রুদ্ধ স্বরঃ

রুটি—রুটি চাই? ওরে বোকারা—তোরা ভাবিস ওই বুঝি সব?

খাদ্য তো তাঁর ঘরে থরে থরে সাজানো, কিন্তু তবু তো তিনি ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছেন। তাঁর শূন্য বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে, তাঁর সমস্ত জীবন ক্ষত-বিক্ষত, আহত। সে ক্ষতের ব্যথা তো উথলে ওঠে, গলায় বেঁধে যায়। এযেন মৃত্যু-যন্ত্রণা। কারো কারো ঘরে খাবার আছে বলেই, জীবনে একেবারে ঢালাও সুখ নেই। কে এমন মূর্খ; যে ভাবে ধনেই পৃথিবীর সুখ? ওরা তো স্বাপ্নিক, ওরা তো কল্পনাবিলাসী বিপ্লবীর দল, ওরা এক সমাজ-ব্যবস্থাকে হয়তো ভেঙে-চুরে দিয়ে আর-এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। ওরা তো মানবতাকে কোন আনন্দই দিতে পারবে না—কোন দুঃখই ঘোচাতে পারবে না। রুটি আর মাখন সবাইকে ভাগ করে দিয়ে ওরা কি করবে? বরং শুধু তো দুঃখই বাড়বে; একদিন হয়তো ওদের প্রগতির হিড়িকে কুকুরগুলো অবধি কঁকিয়ে উঠবে নিরাশায়। চিরন্তন প্রবৃত্তির তাড়নাকে দাবিয়ে রেখে ওদের ধাপে ধাপে তুলে দিয়ে শুধু তো অতৃপ্ত কামনার দাহনই বাড়িয়ে তুলবে। না-না—এ পথ নয়। বেঁচে না থাকাই তো ভাল—ভাল তো নির্বাণ। আর যদি বাঁচতেই হয়, অস্তিত্বই যদি বজায় রাখতে হয়, তাহলে গাছ হয়ে, পাথর হয়ে বেঁচে থাক। নয় তো আরো নীচু ধাপে নেমে যাও, এক কণা বালি হয়ে থাক—পথিকের পায়ের আঘাতে তার বুক তো ক্ষতবিক্ষত হবে না, রক্ত ঝরবে না।

যন্ত্রণার চরমে এসে পেঁছেছেন মঁসিয়ে হানাবু, চোখে তাঁর জল। উত্তপ্ত গাল গড়িয়ে ঝরে পড়ছে। ঘনায়মান অন্ধকারে পথ আর দেখা যায় না। এবার ঢিল পড়তে লাগল কুঠির উপর, ঝাঁজরা করেই দেবে বুঝি গুলির মতো।

এই উপবাসী মানুষগুলোর উপর তাঁর আক্রোশ নেই—শুধু হৃদয়ের ক্ষতই জলছে, চোখে জল ঝরছে। তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে বার বার বলতে লাগলেন—

ওরে বোকার দল—ওরে—!

কিন্তু শূন্য পাকস্থলীর চীৎকার আবার প্রবল হয়ে উঠল, ঝড়ের গর্জন, সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যাবে—সবকিছু।

রুটি—রুটি—রুটি চাই!

ছয়

ক্যাথেরিনের হাতে মার খেয়ে এতিয়েনের চেতনা ফিরে এসেছে। সে এখনো আছে দলের পুরোভাগে। মৎসুর বিরুদ্ধে জনতার অভিযানে এখনো সে নেতা। গলা তার ভেঙে গেছে। কিন্তু আর একটা স্বর শুনতে পাচ্ছে তার অন্তরে। এ যুক্তির স্বর, অবাক হয়ে সে শুধাচ্ছে—এর মানে কি? এসব তো সে চায়নি। কি করে এমন ব্যাপার ঘটল? জাঁ-বার্তে রওনা হয়েছিল ঠাণ্ডা মাথায়—সর্বনাশ সে ঠেকাতে চেয়েছিল এমনি করে। কিন্তু ম্যানেজারের কুঠির উপর চড়াও হয়ে এই উত্তেজনাভরা দিনের সে শেষ করে দিচ্ছে। এ কি হ'ল?

সে নিজেই তো বলেছে, থাম, থাম! প্রথমে তার একমাত্র ভাবনা ছিল কোম্পানির ইয়ার্ড বাঁচাতে হবে—সেইটের উপরই পয়লা চড়াও হবার কথা ছিল। এখন তো ঢিল কুঠির ফটকের উপর গিয়ে পড়ছে। সে মাথা ঘামাতে লাগল, আইনসংগত কোন লক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা—যার উপর ছুঁড়ে ফেলবে এই জন-প্রবাহকে—দুর্ভাগ্য থেকে ওদের বাঁচাবে। বৃথা চেষ্টা। তাই এখন একা দাঁড়িয়ে আছে। পথের মাঝখানে অসহায় সে। হঠাৎ শুনলে, কে তাকে ডাকছে। তিসোঁর শুঁড়িখানার দরজায় দাঁড়িয়ে কে ডাকছে। মালিকানী জানালায় খড়খড়ি শার্সি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিচ্ছে। শুধু দরজাটাই এখন খোলা।

হ্যাঁ—আমি। একটা কথা শোন।

রাসেনার। দুশো বিশ নম্বর ধাওড়া থেকে প্রায় তিরিশ জন মরদ আর মাগী ভোর থেকে ঠায় বাড়িতে বসেছিল—তারা এখন বেরিয়েছে খবর নিতে। ধর্মঘটীদের আসার খবর পেয়ে ওরা ছুটে এসেছে ভাটিখানায়। জাচারি তার বৌ ফিলোমেনকে নিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসেছে। একটু দূরে পিয়েরোঁ আর পিয়েরোঁ-বৌ। পিছন ফিরে আছে। বুঝি মুখ দেখাতে তাদের ভয়। কেউ মদ খাচ্ছে না। আশ্রয় নিয়েছে মাত্র।

রাসেনারকে চিনতে পেরে এতিয়েন মুখ ঘুরিয়ে নিলে কিন্তু সে বললে,

আমার সংগে বুঝি দেখা করতে চাও না?...ভাল কথা—আমি তোমাকে আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম। এখন দেখছ তো, হাংগামা শুরু হয়ে গেছে। এখন যত খুশি রুটি চাইতে পার—কিন্তু তার বদলে ছুটবে গুলী।

এতিয়েন ফিরে তাকিয়ে বললে,

আমার কখন বিরক্তি লাগে জান—যখন দেখি ভীরুরা হাতে হাত জড়ো

করে ঠুঁটো হয়ে বসে আছে—আর আমরা জান দিতে চলেছি।

তাহলে তোমরা লুট করতেই চাও? রাসেনার শুধাল।

আমার কথা—সাঙাৎদের সঙ্গে শেষ অবধি থাকব, যদি দরকার হয় তো ওদের সঙ্গেই মরব।

হতাশ হয়ে এতিয়েঁ ভিড়ের মধ্যে আবার ছুটে এল। মরতে সে প্রস্তুত। পথে তিনটি ছেলেমেয়ে ঢিল ছুঁড়ছিল। সে তাদের জোরে লাথি মারল।

সাঙাৎদের চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলে, জানালা ভেঙে কিছু হয় না।

বেবের্তে আর লিদি এসে জুটেছে জাঁলিনের সঙ্গে—গুলতি-ছোঁড়া শিখছে। কে কতটা ক্ষতি করতে পারে তাই পরখ করার জন্য গুলতি ছুঁড়ছে, ভিড়ে একটি স্ত্রীলোকের মাথা ফাটিয়ে দিলে লিদি, দুটো ছেলের তাই নিয়ে কি হাসি! বনেমোর আর বুড়ো মোকে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়েছে—পিছন থেকে দেখছে। বনেমোরের সোঁতে-ফুলো পা, চলতে ভারি কষ্ট। এতদূর আসতে ধকল কম হয়নি। কেউ জানে না, কি কৌতূহলে সে এত দূর এল। যখন মুখ থেকে ওর একটা কথা কেউ খসাতে পারে না—ঠিক তখনকার মতোই ওর মুখের চেহারা পাঁশুটে হয়ে আছে।

যাহোক, এখন আর কেউ এতিয়েঁর কথা শুনছে না। নিজেদের খেয়াল-খুশীতে চলছে। তার হুকুম সত্ত্বেও ঢিল শিলাবৃষ্টির মত পড়তে লাগল। সে নিজেই এই বর্বরদের দেখে অবাক; ভীত। ওদের সে লাগাম খুলে দিয়েছে। ওরা এমনি তো বড় ধীর—জাগে না। কিন্তু জেগে উঠলে তো ওরা ভয়ঙ্কর—ওদের ক্রোধ তখন তো সহজে উবে যায় না। হলান্ডের পুরানো দিনের রক্তধারা ওদের শিরায় শিরায় বইছে—সে রক্ত তো ঘন, অচঞ্চল। মাসের পর মাস চলে যায় তাকে গরম করে তুলতে; কিন্তু তারপরে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতায় ফুঁসে ওঠে। যুক্তি শোনে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অমনি উষ্ণ হয়েই থাকে। সে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এসেছে সেখানে জনতা একটুকুতেই ফুঁসে ওঠে, কিন্তু ক্ষতি করে কম। লেভাকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তাকে কুড়ুলখানা কেড়ে আনতে হ'ল। মেয়ুদের বাগ মানানো গেল না। দুহাতে ওরা ঢিল ছুঁড়ছে। মেয়েদের সবচেয়ে তার ভয় বেশি। লেভাক-বৌ, মোকে-ছুঁড়ি আর সকলের মাথায় এখন খুন চেপেছে। ওরা যেন দাঁত আর নখ বার করেই আছে—একপাল মাদী কুত্তার মতো চেঁচাচ্ছে। বুড়ী-বুল ওদের নেত্রী—তার ঢেঙা শরীরটা সবার আগে দেখা যায়।

হঠাৎ বিরতি এল। মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে গেছে জনতা। এতিয়েঁর অনুনয়-বিনয়ে যা হয়নি, তাই-ই হ'ল। কিছুটা শান্ত হয়ে এল জনতা। গ্রিগোয়ের দম্পতি উকিলের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ম্যানেজারের কুঠিতে যাবার জন্যে রাস্তা পার হচ্ছেন। সামান্যই ব্যাপার। ওঁদের কিন্তু দেখে বেশ শান্ত বলেই মনে হয়।

ওঁরা যেন খনির মজুরদের ব্যাপার ঠাট্টা-তামাশা বলেই মনে করছেন। ওদের বশ্যতা তো একশো বছর ধরে তাঁদের জীইয়ে রেখেছে। ওরাও আর ঢিল ছুঁড়ছে না। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে ওরা আঘাত করতে চায় না। তারা যেন আকাশ থেকেই পড়েছেন। বাগানে তাঁদের ঢুকতেও দেওয়া হ'ল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে গড়-দেওয়া দরজার ঘন্টি বাজালেন। কিন্তু চট্ করে

দরজা খুলে গেল না। বাড়ির পরিচারিকা রোজও ফিরছিল। ঐ খ্যাপা মজুরদের দেখে সে ঠাট্টাই করল। সবাইকে সে চেনে—মঁতসুরই মেয়ে সে। সে দরজায় ধাক্কা মেরে মেরে শেষটায় হিপোলাইটকে দিয়ে দরজাটা খোলালে। সময়মতো খোলা হ'ল। গ্রিগোয়েররা ভিতরে অদৃশ্য হতেই আবার ঢিল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। জনতা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠেছে, আবার আরো জোরে জিগির উঠছে ঃ—

উপরওলা মালিক মুর্দাবাদ! মেহনতী জনতা জিন্দাবাদ!

হলঘরে রোজ তখনো হাসছে। এই ব্যাপারে ওর ভারি মজা লেগেছে। ভীত পরিবারকে বললে,

না, না, ওরা মারবে না! আমি ওদের চিনি গো চিনি!

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের অভ্যাস-মতো কোটটা ঝুলিয়ে রেখে মাদামকে তাঁর মোটা শালখানা খুলতে সাহায্য করলেন। বললেন,

ওদের ভিতরে বিদ্বেষ নেই। চেঁচিয়ে গলা ভেঙে আপনা থেকেই শান্ত হয়ে জোর খিদে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

এইবার মঁসিয়ে হানাবু তেতলা থেকে নেমে এলেন। দৃশ্যটা তিনি দেখেছেন। চির অভ্যস্ত শান্ত, ভদ্র ব্যবহার তাঁর। তিনি অতিথিদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলেন। দুঃখের মন্থনের চিহ্ন শুধু রয়ে গেছে তাঁর মুখের বিবর্ণতায়। মানুষটা যেন এখন ভীরু বনে গেছেন ,শুধু রয়ে গেছে নিখুঁত শাসক—কর্তব্যে অটুট শাসক।

তিনি বললেন, বাড়ির সবাই এখনো ফেরেননি।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন গ্রিগোয়ের-দম্পতি। সিসিলি এখনো ফেরেনি! খনির মজুররা যদি এমনি ঠাট্টা-তামাশা করতে থাকে, তাহলে কি করে ফিরবে!

মঁসিয়ে হানাবু অবার বললেন, ভিড় হটিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি করব আমি একা। তা ছাড়া কোথায় গেলে যে পুলিসের দেখা পাওয়া যাবে তাও জানি না।

রোজ এখনো যায়নি; সে অস্ফুটস্বরে বললে,

ওরা কিন্তু লোক খারাপ নয়!

ম্যানেজার মাথা নাড়লেন। সোরগোল বাড়ছে বাইরে। ঢিল এসে পড়ছে বাড়ির উপর, তার ভোঁতা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

ওদের উপরে কড়া হতে চাই নে। ক্ষমাও ওদের করতে পারি; ওরা বোকা বলেই ভাবছে আমরা ওদের ক্ষতি করবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এই হাঙ্গামা বন্ধ করে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি তো খবর পেয়েছিলাম, সারা পথে পুলিস মোতায়েন আছে—কিন্তু সকাল থেকে তো একজনকেও দেখা যাচ্ছে না।

কথাটা শেষ করা হ'ল না। আপনা থেকেই থেমে পড়লেন। তারপর গ্রিগোয়ের-গৃহিণীর কাছে গিয়ে বললেন,

আপনার কাছে অনুরোধ, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আসুন, বসবার ঘরে আসুন!

কিন্তু রাঁধুনী রেগে গজর গজর করতে করতে ছুটে এল। হলঘরে কিছু-ক্ষণের জন্য ওঁরা আটক রইলেন। সে এসে জানালে, খাবারের ব্যাপারে সে আর কোনো দায়িত্ব নেবে না। মার্সিয়েনের রুটিওয়ালার কাছে সে কিছু

বিস্কুটের গুঁড়োর ফরমায়েস দিয়ে এসেছিল চারটের সময়। তারই আশায় বসে আছে। হয়তো এই ডাকাতদের ভয়ে রুটিওয়ালা ফিরে গেছে। হয়তো ওর জিনিসপত্রও লুট করে নিয়েছে। সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, রুটির টুকরো এখনো ঝোপের আড়ালে ছড়িয়ে আছে। ঐ যে তিন হাজার হতভাগা রুটির জন্য জিগির তুলছে—ওদেরই পেট তাতে ভরবে। যাহোক, মনিবকে সে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল। সে সমস্ত খাবার না হয় উনুনে পুরে দেবে, তবু বিপ্লবের ডামাডোলে নষ্ট হতে দেবে না।

একটু সবুর কর, মঁসিয়ে হানাবু বুঝিয়ে বললেন, সবকিছুই একেবারে তছনছ হয়ে যায়নি। রুটিওয়ালা এখনি এসে হাজির হতে পারে।

গ্রিগোয়ের-গৃহিণীর দিকে ফিরে নিজেই বসবার ঘরের দরজা খুলে দিলেন। পেছন ফিরে তাকাতেই অবাক হয়ে দেখলেন হলঘরের সিঁড়িতে একটা লোক বসে আছে। গোধূলির আঁধার ঘন হয়ে এসেছে, তাই এতক্ষণ দেখতে পাননি।

কে—মাইগ্রাত? এখানে যে?

মাইগ্রাত উঠে দাঁড়াল। তার মাংসল মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে মেরে গেছে। আর সেই চির অভ্যস্ত শান্ত ভাব নেই; সে আস্তে আস্তে জানাল, সে পালিয়ে ম্যানেজারের কুঠিতে এসেছে। যদি ডাকাতগুলো দোকানে হানা দেয়, তাহলে তাকে সাহায্য করতে হবে, বাঁচাতে হবে।

হানাবু উত্তর দিলেন, দেখছ তো আমারই বিপদ, অথচ কেউ নেই। বরং বাড়িতে থেকে দোকান আগ্‌লালেই ভাল হোত।

আমি লোহার বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছি দোকান, বৌকে পাহারায় রেখে এসেছি।

ম্যানেজার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ঘৃণা আর চাপা রইল না। বাঃ, চমৎকার রক্ষী। বেচারী তো কিল-চড় লাথি-ঘুষিতে কাবু হয়েই আছে!

দেখ—আমি কিছু করতে পারব না; নিজেকে বাঁচাও গে! এখুনি যাও—ওরা আবার রুটির জিগির তুলেছে। শোন!

সত্যই আবার সোরগোল শুরু হয়ে গেল। মাইগ্রাতের মনে হ'ল, চীৎকারের ভিতরে তার নিজের নাম সে শুনতে পেল। আর তো ফেরা যাবে না—ওকে ওরা টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। তা ছাড়া, তার সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। দরজার শার্সির সঙ্গে মুখ লাগিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঘামছে, কাঁপছে আসন্ন সর্বনাশের আশংকায়। গ্রিগোয়েররা বসবার ঘরে চললেন।

মঁসিয়ে হানাবু শান্তভাবেই গৃহস্বামীর কর্তব্য সম্পাদন করতে লাগলেন। কিন্তু অতিথিদের বসতে বলা বৃথাই হ'ল। বন্ধঘর, চারদিকে আটকানো। দুটি বাতি জ্বলছে। অথচ বাইরে এখনো দিনের আলো। বাইরে থেকে সোরগোল উঠছে আর সবাই ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছেন। ভারী পর্দায় প্রতিহত হয়ে সংক্ষুব্ধ গর্জন এসে বাজছে—সে যেন আরো ভয়ংকর। অস্পষ্ট বলেই বুঝি ভয়ংকর। আলাপ শুরু হ'ল। কিন্তু নিজেদেরই অজান্তে কথার মোড় ঘুরে ফিরে এল এই হাঙ্গামার ব্যাপারে। আগে কিছুই বুঝতে পারেননি ভেবে অবাক হয়ে গেলেন। এমন ভুল খবর পেয়েছেন যে, রাসেনারকেই যত নষ্টের গোড়া ভেবে বসেছিলেন। রাসেনারের বিরুদ্ধে নানা কথাও বলেছেন—তার

প্রভাবেই এই ব্যাপার হয়েছে এই-ই তিনি আঁচ করেছিলেন। এখন তো পুলিস আনতেই হবে; নিজেদের তো আর অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে পারেন না। গ্রিগোয়ের-দম্পতির মেয়ের ভাবনা ছাড়া আর কোন উদ্বেগ নেই। আহা বেচারী! ও তো একটুকুতেই ভয় পায়। হয়তো বিপদ দেখে, গাড়ি আবার মার্সেয়েনেয় ফিরে গেছে। আরো মিনিট পনরো অপেক্ষা করা গেল। উদ্বেগ বাড়ছে পথের সোরগোলে, আর পড়ছে শার্সি-খড়খড়ির উপর ঢিলের পর ঢিল। জয়ঢাকের মতো বেজে-বেজে উঠছে। অসহ্য হয়ে উঠেছে ব্যাপার। মঁসিয়ে হানাবু শেষে বলে উঠলেন, তিনি একাই বাইরে গিয়ে এই খ্যাপা লোকগুলোকে তাড়িয়ে দেবেন। গাড়ি এল কিনা দেখবেন। এমন সময় হিপোলাইট চেঁচাতে-চেঁচাতে এসে হাজির হ'ল।

হুজুর, হুজুর ,মনিবানী এয়েছেন! খুন করে ফেলল!

গাড়ি রিকুইলার লেনের ভিতর দিয়ে যেতে পারেনি। তার কারণ ক্ষেপে-ওঠা জনতা, নিগ্রেল তাই হাঁটা পথে বাড়ি ঢোকার কল্পনাটা কাজে খাটিয়েছিল। তারা এসে বাগানের দরজায় ঘা মারলে। তার বিশ্বাস, মালী ওদের দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনতে পাবে, নয় তো অন্য কেউ এসে দরজা খুলে দেবে। প্রথমে পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে কার্যকরী হ'ল, সত্যই হানাবু-গৃহিণী আর মেয়েরা এসে বাগানের দরজায় ঘা মারতে লাগলেন। এরই মধ্যে কয়েকজন মেয়েমানুষ টের পেয়ে গলি পথে ছুটে এল। তারপর থেকে সব ভেস্তে গেল। দরজা খুলল না, নিগ্রেল কাঁধ দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলতে বৃথাই চেষ্টা করলে। মেয়েরা দলে ভারী হচ্ছে, হয় তো তারা ভিড়ের ভিতরে মিশে যেতে পারে—এই আশংকায় সে একেবারে মরিয়া হয়ে মামীকে আর মেয়েদের জোরে ঠেলতে লাগল, যাতে ঐ হানাদারদের দলের ভিতর দিয়ে গিয়ে সামনের দিকের সিঁড়িতে হাজির হতে পারেন। এই পরিকল্পনায় ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তাদের বাধা দিলে জনতা—চীৎকার করে পেছু পেছু ধেয়ে এল। ডানে বাঁয়ে জনতার জোয়ার। তারা বুঝতে পারছে না, কি করে এই লড়াইয়ের মাঝখানে এসে পড়ল এমন কায়দা-দুরস্ত ভদ্রমহিলারা—অবাক হয়ে গেল। তুমুল সোরগোল পড়ে গেছে—আবার ভুল হ'ল। লুসি আর জিনি সিঁড়িতে এসে পৌঁছে গেল। পরিচারিকা দরজা খোলাই রেখেছিল, ওরা সেই দরজা দিয়ে মিলিয়ে গেল। হানাবু-গৃহিণী ওদেরই অনুসরণ করলেন। নিগ্রেল পিছনে। সে দরজা বন্ধ করে দিলে। তার মনে হ'ল, সিসিলিকে সে আগেই ঢুকতে দেখেছে। কিন্তু সে তো নেই! পথেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে সে ছুটে গিয়ে বিপদের মুখে পড়েছে।

আবার জিগির উঠল,

মেহনতী জনতা জিন্দাবাদ! মালিকলোগ মুর্দাবাদ! ওদের সাবড়ে দাও—সাবড়ে দাও!

ওড়নায় ঢাকা সিসিলির মুখ। দূর থেকে কয়েকজন তাকে হানাবু-গৃহিণী বলেই মনে করে বসল।

কেউ কেউ ভাবলে, সে ম্যানেজার-বৌয়ের মিতানী। হয়তো কাছে-পিঠের কোন দুশমন কলের মালিকের ছুকরী-বৌ। যাই হোক কি যায় আসে—কার বৌ। ওর রেশমী পোষাক, ফারকোট আর মাথার টুপিতে সাদা পালক দেখে

ওরা ক্ষেপে গেল। গায়ে আবার খোসবাই ছাড়ছে, ঘড়ি আছে হাতে—আবার মেয়েটার চামড়াও বড় নরম। ওরা সব বাবু-মেয়ে, কয়লা ছোঁয়নি জন্মে।

সবুর কর না বাছা, বুড়ী-বুল চেঁচিয়ে উঠল, ঐ ফুরফুরে লেস তোমার মাগ্গে সেঁটে দেবনি!

ঐ কুত্তির পয়দারা মোদের কাছ থেকে ওসব কেড়ে নিয়েছে, লেভাক-বৌ বললে, ওরা চামড়া জানোয়ারের লোম দিয়ে ঢাকে আর মোরা তো ঠাণ্ডায় মরে যাই। ওকে উদোম করে ফেল্, দেখিয়ে দে কি করে জিন্দিগি কাটাতে হয়।

মোকে-ছুঁড়ি ছুটে এল,

দে—দে! ওকে চাবকে দে!

এ যেন বর্বর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল। ওরা ধস্তাধস্তি করছে। রাগে গরগর করছে—দেখাচ্ছে নিজেদের ছেঁড়াকানি—সবাই ঐ ধনীর দুলালীর পোষাকের একটা টুকরো ছিঁড়ে রাখতে চায়। ওর পাছাটা কিন্তু আর সবার চেয়ে ভাল নয়! ঐ চমৎকার পালকের আড়ালে আছে একেবারে পচা মাল! বহুদিন তো চলেছে এই অবিচার—ওরা তো কুলি-কামিনের পোষাক পরেই কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। আর এই বেশ্যারা একটা ঘাগরা ধোয়াতে অমন পঞ্চাশ সু ব্যয় করে বসে।

উদ্দামতা ঘিরে ফেলেছে, সিসিলি কাঁপছে। পা যেন ওর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, শুধু একই কথা জড়িয়ে জড়িয়ে বার বার বলছে ঃ

দোহাই তোমাদের! আমাকে মেরো না! দোহাই তোমাদের!

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠল সে, ঠাণ্ডা হাত ওর টুঁটি টিপে ধরেছে। ভিড়ের ঠেলায় ও এসে পড়েছে বুড়ো বনেমোরের কাছে—সে-ই ধরেছে ওর টুঁটি। ক্ষুধায় ও বুঝি মাতাল, দীর্ঘ দুঃখ-দুর্দশায় শীলীভূত। হঠাৎ জেগে উঠেছে শতাব্দীর বশ্যতা থেকে—কে জানে কোন উত্তেজনা ওকে জাগিয়ে তুলেছে—কোন্ বর্বরতা যোগান দিচ্ছে ওর ক্রোধের! ডজনখানেক সাথীকে সে বাঁচিয়েছে তার জীবনে মৃত্যু থেকে—ফায়ার-ড্যাম্পে, ধসে নিজের হাড় ক'খানা ভাঙবার ঝুঁকি নিয়েছে—কিন্তু সেও এখন উত্তেজনায় অধীর। সে এর নাম জানে না—একে প্রকাশ করতে পারে না। হয়তো মেয়েটার সাদা ঘাড় দেখেই ও মুগ্ধ—হয়তো তাই বাধ্য হয়েই চেপে ধরেছে ওকে। আজ তার মুখে কথা নেই—হাতের আঙুলগুলো মোচড়াচ্ছে—আর বুড়ো জানোয়ারের মতই জাবর কাটছে স্মৃতির।

না, না! মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল, ওর পাছা উদোম করে দে—উদোম করে দে!

কুঠিতে দুর্ঘটনা টের পেয়ে নিগ্রেল আর মঁসিয়ে হানাবু সাহস করে দরজা খুলে ফেললেন, সিসিলির সাহায্যে তাঁরা ছুটে যাবেন। কিন্তু ভিড় এবার বাগানের রেলিঙের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বার হওয়া তো সোজা নয়। ধস্তাধস্তি, ঠেলা-ঠেলি শুরু হয়ে গেল। গ্রিগোয়ের দম্পতি ভয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সিঁড়ির উপরে।

বুড়ো, করছ কি! ওঁকে ছেড়ে দাও, উনি পিয়েলোঁদের মেয়ে, মেয়ু-বৌ চেঁচিয়ে বুড়োদাদুকে বললে। সিসিলিকে সে চিনেছে। একটা মেয়েমানুষ ওড়নাখানা টেনে খুলে ফেলেছে তার।

এতিয়েঁও মেয়েটির উপর এই প্রতিশোধ নিতে দেখে অধীর। সেও চেষ্টা করছে ওকে ছাড়িয়ে নিতে। হঠাৎ মাথায় ওর বুদ্ধি খেলে গেল, লেভাকের হাত থেকে কুড়ুলখানা ছিনিয়ে নিয়ে সে ঘোরাতে লাগল।

চল—চল মাইগ্রাতের দোকানে চল! ওখানে রুটি আছে। আর দোকান আমরা চষে ফেলব! চল-চল!

দোকানের দরজায় সে-ই প্রথম এলোপাথাড়ি ঘা হানতে লাগল। লেভাক, মেয়ু আর আর কজন ছুটল তার পিছনে। কিন্তু মেয়েদের তো দাবিয়ে রাখা গেল না। সিসিলি এবার বনেমোরের হাত থেকে গিয়ে পড়ল বুড়ী-বুলের হাতে। জাঁলিনের নেতৃত্বে বেবের্ত আর লিদি চার হাত পায়ে হামা-গুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল তার ঘাগরার নীচে, ওরা অভিজাত মহিলার তলার দিকটা দেখতে চায়। এরই মধ্যে ওকে নিয়ে টানাটানি কম হয়নি। পোষাক ফালি ফালি হয়ে ছিঁড়ে গেছে। এমন সময় এক ঘোড়সওয়ার ছুটে এল। ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিলে ভিড়ে, যে না হটে গেল তার পিঠেই পড়ল চাবুক।

ওরে শুয়োরের দল। এবার আমাদের মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছিস!

লোকটি দেনেউলিঁ, ঠিক ডিনারের সময় এসে হাজির হয়েছেন। লাফিয়ে নেমে পড়ে সিসিলির কোমর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, অন্য হাতে ঘোড়ার রাশ টেনে রাখলেন। এমন তাঁর শক্তি যে ঘোড়া আর জনতার ভিতরে যেন একখানা জীবন্ত কীলক পুরে দেওয়া হ'ল, জনতা ভাগ হয়ে গেল, তারা সরে গেল আক্রমণের ভয়ে। এখনো রেলিঙের উপর চলছে লড়াই, তবু তিনিই জিতলেন—ডানে বাঁয়ে পাঁজর ভেঙে দিলেন জনতার। যাহোক, তিনি নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এলেন। সামান্য ক'টা আঁচড়ই লাগল গায়ে। নিগ্রেল আর মঁসিয়ে হানাবু এই অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁরা তো গালাগাল আর ঘুষোঘুষির ভিতরে মহা বিপদেই পড়েছিলেন। যুবক মূর্চ্ছিত সিসিলিকে ভিতরে নিয়ে গেল। দেনেউলিঁ তার বিরাট বপুর আড়ালে ম্যানেজারকে নিয়ে সিঁড়ির সব চেয়ে উঁচু ধাপে উঠে এলেন। এমন সময় একটা ঢিল এসে পড়ল। কাঁধের হাড়খানা আর একটু হলেই আল্‌গা হয়ে যেত।

বহুৎ আচ্ছা, চেঁচিয়ে উঠলেন মঁসিয়ে দেনেউলিঁ—আমার কলকারখানা তো ভেঙেছিস—এবার তোরা আমার হাড় ক'খানাও ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল্‌!

দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে ঢিল এসে দরজার কাঠ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে চলে গেল।

উঃ, কি ক্ষেপে গেছে! চেঁচিয়ে উঠলেন দেনেউলিঁ। আর দু' সেকেণ্ড দেরি করলেই ওরা আমার মাথাটা ফুটির মতো দুভাগ করে দিত, ওদের আর বলবার কিছু নেই! ওরা এখন সব কিছুর বাইরে চলে গেছে! পেড়ে ফেলা ছাড়া আর উপায় নেই।

বসবার ঘরে গ্রিগোয়ের-দম্পতি সজল চোখে সিসিলির দিকে তাকিয়ে রইলেন, মূর্ছা তার ভেঙে গেছে। কোন আঘাত লাগে নি, একটা আঁচড় পর্যন্ত না। শুধু গেছে ওড়নাখানা। তবুও উদ্বেগ আরো বেড়ে গেল গ্রিগোয়ের দম্পতির, যখন রাধুনী মেল্যাঁর কাছ থেকে শুনলেন—লা পিয়েলো

ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে জনতা। ভয়ে বিহ্বল হয়েই সে মনিব আর মনিবানীকে সতর্ক করে দিতে ছুটে এসেছিল—গোলমালের সময়ে অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছে। তার কথা যেন ফুরোয় না। কথা থেকে বোঝা গেল, জাঁলিন একটা ঢিল ছুঁড়ে একখানা শার্সি ভেঙেছিল—সেইটেই একেবারে বোমার দাগরাজি হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দেয়াল নাকি ভেঙেই দিয়ে গেছে। মঁসিয়ে গ্রিগোয়েরের সব ভাবনা তালগোল পাকিয়ে গেল। তাঁর মেয়েকে ওরা খুন করেছে, বাড়িখানা ধূলিসাৎ করে দিয়ে চলে গেছে। তাহলে একথা সত্য, ঐ খনির মজুররাও তাঁকে তাদের মেহনতের মুনাফা খেতে দেখলে চটে যায়!

পরিচারিকা তোয়ালে আর অ-দ্য-কোঁলে নিয়ে এল। সে মন্তব্য করলে যাই হোক, ওরা লোক খারাপ নয়।

হানাবু-গৃহিণী বসে আছেন। এখনো বিবর্ণ তাঁর মুখ, ধকল সামলে উঠতে পারেন নি। নিগ্রেলের সাহসের জন্য সবাই অভিনন্দন জানাতে তিনি একটু হাসলেন। সিসিলির মা-বাপ তো বেশি করেই ধন্যবাদ দিলেন—এখন তাহলে বিয়েটা পাকাপোক্ত হয়ে গেল। মঁসিয়ে হানাবু নীরবে তাকিয়ে রইলেন—স্ত্রী আর তার নাগরকে দেখছেন। ভোরবেলা তো ওদের খুন করবেন বলেই শপথ করেছিলেন। এবার সিসিলির উপর নজর পড়ল। তিনি হয়তো ঐ মেয়েটির দ্বারাই ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। কিছু তাড়া নেই। কিন্তু ভয় আছে, হয়তো এর পরে চাকর-বাকরের সঙ্গেই ও জুটে যাবে।

দেনেউলিঁ তাঁর মেয়েদের শুধালেন, কিন্তু তোমাদের তো কোনো হাড় ভাঙেনি?

লুসি আর জিনি খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু সবকিছু দেখতে পেয়ে খুশীও হয়েছে। ওরা হেসে উঠল।

বাবা! দেনেউলিঁ বলে উঠলেন—দিনটা কাটল বটে! এখন যদি যৌতুকের দরকার হয়, তোমরা নিজে রোজগার করে জোটাবে। তাছাড়া আমাকেও তোমাদের পুষতে হবে।

পরিহাস-তরল তাঁর স্বর। কিন্তু স্বর কাঁপছে। মেয়েরা যখন তাঁর বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল—চোখ সজল হয়ে এল।

মঁসিয়ে হানাবু তাঁর সর্বনাশের খবরটা শুনতে পেলেন। হঠাৎ কি ভেবে মুখখানা তাঁর ঝলমলিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই ভান্দাম খনি এবার মঁতসুর মালিকের হাতে আসবে। যাহোক, বহুদিনের একটা ক্ষতিপূরণ হবে, বরাতের জোরে তিনি আবার পরিচালকদের মন পাবেন। জীবনের প্রতিটি সংকটমুহূর্তে তিনি নিখুঁতভাবে হুকুম তামিল করেন—নিজের এই সামরিক শৃঙ্খলার ভিতরে তিনি জীবনের সামান্য সুখটুকু খুঁজে পান।

এবার উদ্বেগ কমে গেছে। ঘরে এখন শান্তি নেমেছে। ক্লান্তিতে বিবশ সে-শান্তি। দুটো বাতির মৃদু আলো আর পর্দার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে, বাইরের শব্দও আর নেই। কি হচ্ছে বাইরে কে জানে? চীৎকার তো আর শোনা যায় না। আর দেয়ালে এসে পড়ছে না ঢিল। শুধু শোনা যায় ভোঁতা শব্দ। যেন দূর বনে কেউ কাটছে কাঠ কুড়ুল দিয়ে। ওরা কৌতূহলী হয়ে উঠল। হলে গিয়ে সদর দরজার শার্সির ফাঁক দিয়ে উঁকি-

ঝুঁকি মারলে। মহিলারা পর্যন্ত দোতলার শার্সির আড়াল থেকে দেখতে লাগলেন।

ম'সিয়ে হানাবু দেনেউলিংকে বললেন, আপনি কি ঐ পাজী রাসেনারটাকে ওর সরাইখানার দরজায় দেখে এলেন? আমার তো মনে হয়—ও বেটাই নাটের গুরু!

রাসেনার নয়, এতিয়েংই প্রথম মাইগ্রাতের দোকানের দরজার উপর কুড়ুলের ঘা মারল। সবাইকে ডেকে-ডেকে সে বললে—ঐ দোকানের মাল কি খনির মজুরদের নয়? চোরটার কাছ থেকে নিজেদের জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কি তাদের দাবি নেই। ঐ বেটা তো অনেকদিন ধরে ওদের শোষণ করেছে। কোম্পানির একটু ইশারায় ওদের উপোস করিয়ে রেখেছে। ওরা ক্রমে ক্রমে সবাই চলে এল ম্যানেজারের কুঠি থেকে—এবার ছুটল পাশের দোকান লুট করতে। আবার শুরু হ'ল নতুন করে জিগির—রুটি—রুটি—চাই! ঐ দরজার আড়ালে আছে রুটি। ওরা তার হকদার ওয়ারিশ। বুভুক্ষায় ক্রোধে ওরা উদ্দাম। ওদের মনে হ'ল, আর তো সইতে পারছে না। এর পর যে পথে পড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে হবে। ভীষণ জোরে পড়তে লাগল আঘাত, প্রতিটি কোপে এতিয়েংর মনে হ'ল, সে বুঝি কাউকে আহত করেই বসবে।

এরই মধ্যে মাইগ্রাত ম্যানেজারের কুঠির হলঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে এসে আশ্রয় নিলে। কিন্তু সেখান থেকে কিছু শোনা যায় না। সে ভাবলে, হয়তো দোকানের উপর অসম্ভব হামলা হচ্ছে—তাই সে ইয়ার্ডের পাম্পের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল। সেখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল দরজা ভেঙে পড়ছে, আর বিভিন্ন স্বরে লুট করার জন্যে একে অপরকে উত্তেজিত করছে। তার নিজের নামটাও শোনা গেল। তাহলে দুঃস্বপ্ন তো নয়। দেখতে না পাক, শুনতে তো পাচ্ছে। আক্রমণের প্রতিটি খুঁটিনাটি শোনা যাচ্ছে, কান ঝালাপালা হয়ে গেল। প্রতিটি আঘাত যেন বুকে এসে বাজছে। একটা পাল্লার কব্জা হয়তো ভেঙে গেছে; আর পাঁচ মিনিট—তার পরেই দোকান দখল হয়ে যাবে, ব্যাপারগুলো যেন ভয়ংকর বাস্তব হয়ে ওর মগজে ছাপ ফেলে দিচ্ছে—ডাকাতরা এগিয়ে আসছে। এবার গেল দেরাজ ভেঙে—বস্তার পর বস্তা উজাড় হয়ে গেল। সবকিছু ওরা লুটেপুটে খেয়ে নিলে, মদ পান করলে, বাড়িখানাই নিয়ে চলল। কিছুই রইল না—একখানা লাঠিও না। লাঠিতে ভর দিয়ে যে গাঁয়ে ভিক্ষে মেগে বেড়াবে তারও আর উপায় নেই। নিজের জীবনটাই দেবে। এখান থেকে সে তার স্ত্রীর ক্ষীণ ছায়াটা বাড়ির জানালায় একবার দেখেছে। ফ্যাকাশে মুখ, বিভ্রান্ত চেহারা শার্সির আড়ালে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে। ও নিশ্চয়ই দেখছে নিঃশব্দে, কি করে আঘাত পড়ছে। আহা বেচারী—কি পিটুনিটাই না খায়! পাম্পের উপরে চালা। এমন ভাবে চালাটা আছে—বাগিচা থেকে যে কেউ বেয়ে বেয়ে উঠে আসতে পারে। তারপরে টালির ছাদ বেয়ে জানলায় পৌঁছনো সোজা। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে মাইগ্রাত—কেন সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এই ভাবেই সে বাড়ি ফিরে যাবে। এখনো হয়তো আসবাবপত্র দিয়ে গড় দেবার সময় আছে; আরও কত প্রতিরোধের সে স্বপ্ন দেখছে। ফুটন্ত তেল, পেট্রলে আগুন ধরিয়ে

দিয়ে উপর থেকে ঢেলে দেবে। কিন্তু ভয় আর সম্পত্তির লোভে বেঁধেছে সংঘর্ষ, ভীরুতার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে—ঘন ঘন পড়ছে নিঃশ্বাস। হঠাৎ কুড়ুলের জোর শব্দ শুনে সে মনস্থির করে ফেললে। লোভ জয়ী হ'ল। সে আর তার স্ত্রী নিজেদের লাশ দিয়ে বস্তাগুলো আগলে রাখবে—তবু এক টুকরো রুটি দেবে না।

ঠিক এমনি সময় শুরু হয়ে গেল বেড়াল-ডাকাঃ

দেখ্, দেখ্! ঐ যে হুলো বেড়ালটা ওখানে গিয়ে উঠেছে, ধর, ওকে ধর্!

মাইগ্রাতকে ওরা চালার উপর দেখে ফেলেছে। মোটাসোটা গতর হলেও সে কার্নিসের উপর দিয়ে তর্‌তর্ করে উঠে গেল, কি ক্ষিপ্রগতি তার! কোথায় কি ভাঙলো-চুরলো সেদিকে ওর খেয়াল নেই, এবার শুয়ে পড়েছে টালির উপর, বুকে হেঁটে চলেছে। জানালায় অমনি ভাবেই পেঁাছবে। কিন্তু ছাদের উপরটা ভারী খাড়া। ভুঁড়িটা বাদ সাধছে, নখ ভেঙে গেছে। তবুও অমনি করেই নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে সে উপরে উঠে আসতে পারতো। কিন্তু ঢিলের ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার উপরে জনতার ভয়। তাদের আর সে দেখতে পাচ্ছে না—কিন্তু চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

ওরে ধর্-ধর্—ঐ বেড়ালটাকে ধর্—ওকে নিকেশ করে দে!

হঠাৎ দুখানা হাতের মুঠোই আল্‌গা হয়ে এল। বলের মতো গড়িয়ে পড়ল মাইগ্রাত। নর্দামা ডিঙিয়ে একেবারে দেয়ালের উপর গিয়ে এমনভাবে ছিটকে পড়ল! বরাত খারাপ, সেখান থেকে আবার ডিগবাজি খেয়ে একেবারে পথে। একটা পাথরের পিল্‌পে ছিল পথে তারই উপর পড়ে মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সে মরে গেছে। তার বৌ জানালার শার্সির আড়ালে তখনো ম্লান মুখে, বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে জনতাকে।

সবাই প্রথমে যেন ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এতিয়েঁ থেমে পড়ল। হাত থেকে খসে পড়েছে কুড়ুল। মেয়ু, লেভাক—সবাই দোকানের কথা ভুলে গেছে। দেয়ালের দিকে তাদের নজর। একটা ক্ষীণ লাল ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে দেয়াল থেকে। চীৎকার স্তব্ধ, ঘন অন্ধকারে নীরবতা নেমে এল।

আবার হঠাৎ শুরু হ'ল চীৎকার। মেয়েরাই পয়লা ছুটে গেল—রক্ত-তৃষ্ণা ওদের পেয়ে বসেছে।

তাহলে ভগমান আছেন রে, আছেন! ওরে শুয়োর, তাহলে অক্কা পেলি!

এখনো দেহ উষ্ণ। সেই উষ্ণ দেহের চারদিকে ভিড় করল মেয়েরা। ঠাট্টা করছে, ওর চূর্ণবিচূর্ণ মাথাটাকে বলছে ধুলোমাখা চপ্, ওদের উপবাসী জীবনের সমস্ত অবরুদ্ধ ঘৃণা ওর মুখের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে চীৎকার করে।

ওরে—তোর কাছে না ষাট টাকা ধারি। এবার তো দেনা শোধ হ'ল! ওরে চোট্টা!—মেয়ু-বৌ আর সবার মতোই ক্ষেপে গেছে—সে-ই বলে উঠল। আর তো ধার দিবি না, বলতে পারবি নি রে খালভরা! একটু সবুর কর্ না—তোকে আর একটু মোটাসোটা করে দিই!

দশটা আঙুল দিয়ে এক খাবলা মাটি তুলে নিয়ে ওর মুখের ভিতরে খানিকটা মাটি পুরে দিলে।

কেমন লাগছে খেতে! মোদের যেমন খেতিস, তেমনি এখন মাটি খা!

গালাগাল, অপমান যেন মুষলধারায় ঝরছে। মরা মানুষটা চিতিয়ে পড়ে আছে—অসীম আকাশের দিকে তার চোখ। সেখান থেকে নেমে এল রাত। ঐ যে মুখে ওর মাটি—ঐ-ই ওর রুটি। ঐ-রুটি থেকে সে ওদের বঞ্চিত করেছে। এখন থেকে তো মাটিই খাবে। গরীব-গুরবোদের উপোস করিয়ে দিয়ে আচ্ছা জব্দই হ'ল।

কিন্তু গায়ের ঝাল তো মেটেনি। আরো আছে। মাদী নেকড়ে বাঘের মতো ওরা শুঁ শুঁ করে ওকে শুঁকতে লাগল, শুধু ভাবছে—আর কি অপমান ওকে করা যায়—কি অশ্লীল গাল ওকে দেওয়া যায়। তাহলে বুঝি ওরা খানিকটা স্বস্তি পাবে।

বুড়ী ব্রুলের স্বর শোনা গেল!

ওকে হুলো বেড়ালের মতোই খোজা করে দে!

হাঁ, হাঁ, দে দে! ঐ জানোয়ারটা তো ঢের ঢের করেছে!

মোকে-ছুঁড়ি ওর ট্রাউজারের বোতাম খুলে এরই মধ্যে টেনে খুলে দিতে শুরু করেছে। লেভাক-বৌ ঠ্যাং দুটো তুলে ধরে ওকে সাহায্য করছে। বুড়ী ব্রুল তার শুকনো প্যাকাটির মতো হাত দুখানা দিয়ে ওর ঊরু দু-ফাঁক করে দিয়ে ওর মৃত পুরুষাঙ্গটাকে মুঠোয় চেপে ধরল। সব কিছু ধরে টান—জোর টান—হাড়সার পিঠখানা কুজিয়ে গেছে—দুখানা লম্বা হাত বুঝি ভেঙেই যাবে এ চেষ্টায়। নরম চামড়া দিচ্ছে বাধা। আবার জোরে টানছে। শেষে সে খুলে নিয়ে এল রক্তাক্ত চুলেভরা একটা মাংসপিন্ড, বিজয়ের হাসি হেসে সেটা নেড়ে নেড়ে দেখালেঃ

পেয়েছি—পেয়েছি!

তীক্ষ্ন চীৎকারে বিজয়ের এই প্রতীককে ওরা অভিবাদন জানালে।

ওরে হারাম, আর তো মোদের ছুঁড়িদের পেট করতে পারবিনে! আর তো গায়ে-গতর দিয়ে তোর ধার শুধতে হবে নি! আর তো এক টুকরো রুটির জন্যে মরতে হবে নি।

ভ্যালারে মিনষে! তুই মোর কাছে দশ টাকা পাস! গায়েগতরে শোধ নিবি নাকিরে হারাম? যদি তাকত থাকে তো আয় না!

রসিকতায় ওরা হেসেই খুন! সবাইকে দেখাচ্ছে রক্তাক্ত মাংসপিন্ড—এ যেন এক সাংঘাতিক জানোয়ার—সবাই তার হাতে সয়েছে—এবার তাকে দিয়েছে দলেপিষে। এখন তো ওদের হাতে শক্তিহীন হয়ে সে পড়ে আছে। ওরা পুরুষাঙ্গের উপর মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থুথু ফেললে, আবার ঘৃণায় উদ্বেল হয়ে উঠছে!

আর তো ও পারবে নি! আর পারবে নি! গোর তো তোরা দিবি—কাকে দিবি—ওতো আর মরদ নেই। যা-যা গোরের নীচে পচে-গলে পড়ে থাক—তোকে দিয়ে তো আর কাম হবে নি।

এবার বুড়ী ব্রুল, মাংসপিন্ডটাকে একটা লাঠির ডগায় গেঁথে নিয়ে ভিড়ের উপরে তুলে ধরে ঝান্ডার মত বয়ে নিয়ে চলল পথ দিয়ে—পিছনে

চীৎকার তুলেছে মেয়ের দল। বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে মাটিতে—মাংসপিণ্ড যেন কষাইখানার পচা মাংসের মতোই ঝুলে আছে। উপরে দোতলার জানালায় এখনো মাইগ্রাতের বৌ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে জানালায়, শার্সির ঘষাকাঁচে পড়ে ওর মুখখানা বিকৃত করে দিচ্ছে। মনে হয়, ও যেন হাসছে। সারা জীবন মার খেয়েছে, সব সময়েই ঠকেছে, হিসাবের খাতায় সকাল থেকে সন্ধ্যে ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে হয়েছে। হয়তো সত্যিই ও হাসছে মেয়েদের ঐ মিছিল নীচ দিয়ে যেতে দেখে। ঐ শয়তানকে ওরা রচুমার করে দিয়েছে, তার পর বিঁধে নিয়ে চলেছে লাঠির ডগায়। সত্যই বুঝি হাসি পায়!

এক তুষারায়িত ভীতি নেমে এল। এই যে ভয়ংকর কাণ্ড হয়ে গেল তারই বুঝি এই আবহাওয়া। এতিয়েঁ, মেয়ু বা আর কেউ বাধা দেবার সময় পেলে না—ওরা এই ক্রোধের ঘূর্ণি ঝড়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিসোঁর ভাটিখানার দরজায় কয়েক জন লোক দেখা যাচ্ছে। রাসেনার তো ক্ষেপে গেছে। জাচারি আর ফিলোমেন ভয়ে শিউরিয়ে উঠছে, বনেমোর আর মোকে—দুই বুড়ো বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ছে। শুধু খিলখিল করে হাসছে জাঁলিন, ও বেবের্তকে ঠেলছে আর লিদিকে চেয়ে দেখতে বলছে। মেয়েরা আবার ফিরে এল। ম্যানেজারের কুঠির জানালার পাশ দিয়ে চলেছে। শার্সি-খড়খড়ির আড়ালে ভদ্রমহিলারা এখন গলা বাড়িয়ে আছেন। ওঁরা দৃশ্যটি দেখতে পাননি—দেয়ালের আড়ালে চাপা পড়েছিল। এখন তো আঁধার হয়ে এসেছে, তাই কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

সিসিলি শুধাল, লাঠির ডগায় ওটা কি নিয়ে চলেছে ওরা? এখন সে বাইরে তাকাবার সাহস ফিরে পেয়েছে।

লুসি আর জিনি বললে, হয়তো খরগোশের চামড়া নিয়ে চলেছে।

না, না, হানাবু-গৃহিণী বলে উঠলেন, ওরা বোধহয় কষাইখানা লুট করে ফিরল। দেখে তো একতাল শুয়োরের মাংস বলে মনে হ'ল।

হঠাৎ তিনি শিউরিয়ে উঠে চুপ করে গেলেন। গ্রেগোয়ের-গৃহিণী হাঁটু দিয়ে ঠেলা মারলেন তাঁকে। দুজনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেয়েরাও মৃতের মত বিবর্ণ। আর জিজ্ঞেসও করছে না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—ঐ রক্তাক্ত দৃশ্য মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

এতিয়েঁ আবার কুড়ুলখানা নিয়ে ঘোরাতে লাগল। কিন্তু ভীতির আবহাওয়া তো কাটল না। লাশটা পথের মাঝখানে পড়ে আছে—দোকান আগলাচ্ছে। অনেকেই ফিরে চলল। খিদে বুঝি মিটে গেছে। আর কোন কৌতূহল নেই।

মেয়ু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় তার কানের কাছে কে যেন বললে, সে এখুনি যেন সরে পড়ে। সে ফিরে তাকিয়ে ক্যাথেরিনকে দেখতে পেল। এখনো পুরুষের কোর্তা তার গায়ে, মুখে কয়লার কালি। হাঁফাচ্ছে মেয়েটা। একপাশে তাকে ঠেলে দিলে মেয়ু। ওর কথা শুনতে চায় না, ওকে বরং মারবে বলে শাসালে। ক্যাথেরিন ভয় পেয়ে দিশাহারা হয়ে গেছে, তবু কেমন যেন তার দ্বিধা। এবার সে এতিয়েঁকে দেখে ছুটে গেল।

পালাও, পালাও! পুলিস আসছে!

এতিয়েঁও ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলে, গাল দিচ্ছে—সেই যে ঘুষি মেরেছিল ক্যাথি, তার জবালা যেন আবার দুগাল পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া চলল না। কুড়ুলখানা ফেলে দিতে বাধ্য হ'ল এতিয়েঁ। ক্যাথেরিন তাকে সমস্ত শক্তি জড়ো করে দুহাত দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। ওকে তো বাধা দেওয়া যায় না।

বলছি—পুলিস এয়েছে! শোন—শোন! সাভাল গেছে ওদের খপর দিতে—আনতে। ওর উপরে মোর ভারী রাগ...তাই ছুটে এনু...চলে যাও—চলে যাও—তুমি ধরা পড়লে যে মোর লাগবে!

দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দে কেঁপে উঠছে পথ। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ক্যাথেরিন ওকে টেনে নিয়ে চলল। চীৎকার উঠল—পুলিস! পুলিস! অমনি ছত্রখান হয়ে গেল জনতা। সবাই প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে। দুমিনিটে পথ সাফ হয়ে গেল! একেবারে পরিষ্কার—যেন ঝড়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। সাদা মাটিতে শুধু ছায়া ফেলে পড়ে রইল মাইগ্রাতের লাশটা। তিসোঁর সরাইখানার সামনে রাসেনার ছাড়া আর কেউ নেই। তার মুখ চকচক করছে—তলোয়ারের অনায়াস বিজয় দেখে সে বুঝি খুশী। তার এতে সায় আছে। আর মঁতসুর অন্ধকার বন্ধবাড়ির আড়ালে মধ্যবিত্তের দল ঘর্মাক্ত দেহে, তখনো বাইরে তাকিয়ে দেখতে সাহস পেল না। দাঁত তাদের তখনো কাঁপছে ভয়ে। প্রান্তর রাতের ঘন আঁধারে মিলিয়ে গেল—শুধু আকাশে জেগে রইল ফার্নেস আর চুল্লীর লাল আভাস। আকাশ যেন ওদেরই আলোয় বিয়োগান্ত বিষণ্ণতা নিয়ে দেখা দিল। পুলিসের ঘোড়া জোর কদমে কাছে ছুটে আসছে এবার। ওরা সড়কে এসে পেঁাছেছে—ওরা যেন আবছা অন্ধকারে এক হয়ে ধেয়ে এল—বিচ্ছিন্নভাবে ওদের চেনা যায় না। আর ওদেরই পাহারায় এল রুটিওয়ালার গাড়ি মঁতসু থেকে। একখানা দু-চাকার হালকা গাড়ি—তা থেকে নামল একটা ছোকরা। সে খাবারের বাক্সগুলো নামাতে শুরু করে দিল।

ষষ্ঠ খণ্ড

এক

ফেব্রুআরি মাসের প্রথম পক্ষ কেটে গেল। তুষারপাত চলছে তো চলছেই। দুরন্ত শীত বটে, গরীবের প্রতি একফোঁটা মায়াদয়া নেই। আবার পথে পথে সরকারি ফৌজের টহলদারি শুরু হয়ে গেছে। লিল্-এর পুলিস সাহেব, সরকারী উকিল আর একজন সেনাপতিতে কুলোয় নি। ফৌজ এসে মঁতসু দখল করে বসেছে। একটা গোটা পল্টন মঁতসু আর বোগ্নির মাঝখানে ছাউনি ফেলেছে। পিটে পিটে এখন সশস্ত্র প্রহরী, প্রতি ইঞ্জিনটার মহড়া নিয়েছে একজন করে সৈন্য। ম্যানেজারের কুঠি, কোম্পানির ইয়ার্ড, এমন কি জনকয়েক বড় মানুষের বাড়ি অবধি সঙ্গীনে সঙ্গীনে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। পথে শুধু টহলদারি ফৌজের মন্দ গতি, অভিযান, আর কিছু শোনা যায় না। ভোরোর খাদের পারে সব সময়ে মোতায়েন আছে সান্ত্রী। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রান্তরের দিকে চেয়ে আছে। যেন সদ্য দখল-করা শত্রুর দেশ। দু' ঘণ্টা অন্তর চীৎকার উঠছে!

হুকাম দার? আগু বাড়ো, পাস দেখাও!

কাজ কোথাও শুরু হয় নি। বরং ধর্মঘট আরো ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রেভকুর, মিরো, মাদেলিন এখন ভোরোর মতোই বাঁজা। কয়লা উঠছে না। ফিউৎরি কাঁতেল আর ভিক্তরে রোজই ভোরে লোকের কমতি দেখা যাচ্ছে? এমন কি সাঁ-তমাসেও এখন লোকের ঘাটতি। এতদিন তো এই খাদটা রেহাই পেয়েছিল ধর্মঘটের হিড়িক থেকে। এই যে ঘটা করে ফৌজি টহলদারি চলছে—এরই বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে মূক প্রতিরোধ। মজুরদের গর্ব এখন আহত। বীট খেতের মাঝে মাঝে কুলি-ধাওড়াগুলি এখন পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। মজুররা কেউ বাইরে বেরোয় না; যদি বা কারো দেখা পাওয়া যায়, সে একা। এদিক-ওদিক ট্যারচা চোখে তাকায়, লাল পোষাক আর উর্দি

দেখলেই মাথা নীচু করে থাকে। এক গভীর প্রশান্তি নেমে এসেছে। বন্দুকের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—কিন্তু এরই আড়ালে রয়েছে এক ছদ্ম সহনশীলতা, খাঁচায়-পোরা বন্য পশুর ধৈর্য আর দায়ে-পড়া বাধ্যতা। বন্য পশু যেমন তার শিক্ষকের দিক থেকে মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে নেয় না, তক্কে তক্কে থাকে একবার পিছন ফিরলেই তার ঘাড়ে কামড়ে দেবে—এও যেন তাই। কোম্পানিও এখন কাজ অচল হওয়ায় সর্বনাশের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বেলজিয়াম সীমান্তের বরিনেজ থেকে মজুর আমদানীর কথা চলছে; কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। তাই লড়াই আগের মতই চলছে মজুরদের সঙ্গে। ও'রা বাড়িতে বসে আছে, আর মৃত পিটে পিটে মোতায়েন রয়েছে ফৌজ।

সেই ভয়ংকর দিনের পর থেকেই এমনি চলছে—এমনি নিঃশব্দতা এসে জাঁকিয়ে বসেছে। এরই আড়ালে চাপা পড়ে গেছে যত উদ্বেগ আর ভয়। ক্ষতি আর নৃশংসতার কথাও তেমন করে উঠতে পারে নি। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে মাইগ্রাত ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। তার লাশটাকে যে ভয়ংকর ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়, সে কথাটা নিয়ে তেমন জোর দেওয়া হয় নি। কিন্তু এরই মধ্যে তার কাহিনী পুরাবৃত্তের শামিল হয়ে উঠেছে। কোম্পানি নিজেদের পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি হয়েছে বলে স্বীকার করে নি; গ্রিগোয়েররাও তাঁদের মেয়েকে মামলার কেলেঙ্কারির ভিতর জড়াতে চান নি—মামলা হ'লে তাকে তো সাক্ষী হতেই হোত। তবুও কিছু কিছু ধরপাকড় হয়েছে। তারা অবশ্য দর্শক মাত্র। যেমন সচরাচর হয়ে থাকে তাই। ভীত, কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষই ধরা পড়ে—ওরা কোন কিছুই জানে না, অথচ জড়িয়ে পড়ে। ভুল করে পিয়েরোঁকে মার্সিয়েনেয় হাতে হাতকড়া এ'টে চালান দেওয়াও হয়েছিল। এতে তার সাঙাৎরা মজা দেখেছে বইকি! হেসেছেও খুব। রাসেনারকেও দু'জন পুলিস গ্রেফতার করেছিল আর কি! কর্তৃপক্ষ শুধু যাদের বরখাস্ত করবেন তাদের নামের তালিকা তৈরি করেছেন, কার্ডও একেবারে পাইকারি হারে ফেরত দেওয়া হয়েছে। মেয়ু ফেরত পেয়েছে, লেভাকও তাই—দুশো চল্লিশ নম্বর ধাওড়ার আরো চৌত্রিশ জন সাথীরও ঐ এক হাল। এতিয়ে'র উপর পড়েছে উপরওয়ালার সমস্ত রাগ। সে দাঙ্গার রাত থেকেই উধাও হয়ে গেছে। একেবারে পাত্তা মেলে নি। সাভাল তার উপর গায়ের ঝাল মেটাতে গিয়ে উপরওয়ালার কাছে বহু কথাই বলেছে, কিন্তু ক্যাথেরিনের অনুরোধে অন্য কারো নাম বলে নি। ক্যাথেরিন তার বাপ-মাকে বাঁচাবার জন্যই এ কাজ করেছে। যাহোক, দিন এমনি করেই কাটছে। সবাই জানে, বোঝে, ব্যাপারটা চুকেবুকে যায়নি। এর শেষ কোথায় তারা জানতে চায়।

ম'তসুতে মধ্যবিত্তরা তো এখন প্রতিরাতেই ভয় পেয়ে আচমকা জেগে ওঠে। তাদের কানে বাজে কল্পিত হুঁশিয়ারী ঘণ্টা, নাক বারুদের গন্ধে ভরে যায়। নতুন পাদরীর উপদেশ শুনে ওরা তো পাগল হয়ে ওঠে। রোগা ঢ্যাঙা পাদরী রাঁভিয়ে, প্রোজ্জ্বল তাঁর দুই চোখ। ইনি পাদরী জোরের জায়গায় এসেছেন। তিনি আগের সেই নাদুস-নুদুস, শান্তশিষ্ট, বিবেচক মানুষটির চেয়ে একেবারে আলাদা। তিনি তো সবার সঙ্গে মিলেজুলে সুখে শান্তিতেই থাকতে চাইতেন, কিন্তু পাদরী রাঁভিয়ের কি ঔদ্ধত্য—এ তল্লাটের ঐ ঘৃণ্য

দস্যুগুলোকে তিনি সমর্থন করে বসেন! ওরা তো এ অঞ্চলের সুনাম নষ্ট করে দিচ্ছে। ধর্মঘটীদের দুষ্কৃতির তিনি অজুহাত দেখান, মধ্যবিত্তদের উপর তীব্র আক্রমণ চালান—তারাই নাকি এই ব্যাপারের জন্য দায়ী। তাঁর মতে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই গির্জার সেই পুরাতন ঐতিহ্যগত স্বাধীনতা অপহরণ করে নিয়েছে, আর সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে পৃথিবীকে দুঃখ-দুর্দশা আর অন্যায়ের নরকে পরিণত করেছে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীই শ্রেণীগুলির মধ্যে ভুল বোঝার বীজ বুনে দিয়েছে, তাদের নাস্তিকতায় তারা পৃথিবীকে ঠেলে নিয়ে চলেছে এক মহা সর্বনাশের পথে। তারা তো পূর্ব-বর্তী খৃষ্টানদের মতবাদ বা ভ্রাতৃত্বের ঐতিহ্যের ধার ধারে না। এমন কি তিনি ধনীদের ভয় দেখাতেও কসুর করেন নি। হুঁশিয়ারী দিয়েছেন—যদি তারা হৃদয়কে এমনি কঠিন-কঠোর করে রাখে, যদি ভগবানের বাণী না শোনে, তাহলে ভগবান তো দরিদ্রের পক্ষই নেবেন। এই আত্মতুষ্ট নাস্তিকদের সম্পদ নিয়ে তিনি দুনিয়ার এই নীচুতলার মানুষদের ভিতরে বিলিয়ে দেবেন। এমনি করে তাঁর মহিমার পরম বিকাশ হবে। ধার্মিকের দল তাঁর কথা শুনে শিউরে উঠেছে, সরকারী উকিল বলেছেন, এ তো কড়া সমাজতন্ত্রবাদের কড়া বুলি। তাঁরা সবাই কল্পনা নেত্রে দেখতে শুরু করেছেন, এই পাদরী জনতার নেতৃত্ব নিয়ে ক্রুশ ঘোরাতে ঘোরাতে চলেছেন। ১৭৮৯ সালে গড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছেন।

মঁসিয়ে হানাবুর কানেও একথা গেল। তিনি শুধু ঘাড় নেড়ে বললেন, ও যদি তেমন হাঙ্গামা বাধায়, তাহলে প্রধান ধর্মযাজক ওকে সরিয়ে দেবেন।

ত্রাসের নিঃশ্বাস এমনি করে প্রান্তরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বয়ে যাচ্ছে। এদিকে এতিয়েং এখন অন্তরালের অধিবাসী। জাঁলিনের সেই আশ্রয়ে সে আছে—সেই পরিত্যক্ত রিকুইলারে। কেউ ভাবতে পারছে না, ও এত কাছে লুকিয়ে আছে। খনির পরিত্যক্ত কাঁথিতে আশ্রয় নেবার ঔদ্ধত্য তার হবে, একথা ভাবতে পারেনি তার পশ্চাৎধাবনকারীর দল। তাই তারা তার খোঁজও পায়নি। উপরে ব্ল্যাকথর্ন আর হথর্ন গজিয়ে উঠেছে হেডগীয়ারের ধসে-পড়া কাঠের মাঝে মাঝে, এতে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ সেখানে সাহস করে যায় না। রোয়ান গাছের ঝুরি ধরে ঝুলে ঝুলে নামবার হুনর থাকা চাই, তা ছাড়া নির্ভয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে মই-এর ধাপে। তাও আবার এমন ধাপ হবে যেগুলি এখনো মজবুত আছে। আরো বাধা আছে, সেগুলিও তাকে রক্ষা করছে। নিঃশ্বাসরোধ-করা স্যাফ্টের গরম, একেবারে একশো বিশ মিটার নীচে নেমে আসা—তার পরে বুকে হেঁটে দুই সরু দেয়ালের মাঝ-খান দিয়ে কিছুক্ষণ চলা। এমনি করে বিপদ মাথায় নিয়ে চলতে-চলতে তবে তো আবিষ্কার করা যাবে এই দস্যুর গুহা আর তার লুণ্ঠিত সামগ্রী। এখানে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে এতিয়েং। জিন আছে, শুঁটকি কড্ মাছ আছে, আরো নানা খাদ্য সম্ভার। খড়ের বিছানাটিও চমৎকার, এখানে কন-কনে হাওয়াও বয় না। এখানে আবহাওয়া সমধর্মী—যেন হামামের উষ্ণতা নিয়ে ছড়িয়ে আছে। শুধু আলোরই যা অভাব। জাঁলিন সরবরাহকারী। সে আদিম মানুষের বুদ্ধি আর বিবেচনা নিয়ে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে

জিনিসপত্র নিয়ে আসে। চুলে মাখবার তেলও এনে দিয়েছে, কিন্তু এক বাণ্ডিল মোম এখনো যোগাড় করতে পারে নি।

পাঁচ দিনের দিন শুধু খাবার সময় ছাড়া এতিয়ে মোম জ্বালালে না। অন্ধকারে সে খেতে পারে না। এই যে অসীম, অফুরন্ত অন্ধকার—অহোরাত্র ব্যাপি অন্ধকার—এই তো ওর সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। নিরাপদে এই যে নিদ্রা—এ তো ভালই—আর খাবারও আছে প্রচুর—আছে উত্তাপ—কিন্তু এমন করে কখনো অন্ধকার তো ওর উপর চেপে বসে নি। মনে হয় যেন ওর সমস্ত ভাবনা দলে পিষে দিয়ে যায়। এখন তো চোরাই খাবারের উপর সে বেঁচে আছে। কমিউনিস্ট মতবাদ তার যাই-ই থাক, জন্মগত কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে তাই শুকনো রুটি চিবিয়েই দিন কাটাতে লাগল। আর কি করা যায়? তাকে বাঁচতে হবে, তার কাজ এখনো শেষ হয়নি। আর এক লজ্জাও এসে তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। জিন খেয়ে সেই যে মাতলামি করেছিল—তারই জন্য অনুশোচনা। খালি পেটে কনকনে ঠাণ্ডায় জিন গিলে সে কি কাণ্ড। সে ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাভালের উপর। একথা ভাবলেও রাজ্যের অজানা ভয় এসে দেখা দেয়—তার ওয়ারিশানসূত্রে পাওয়া যত পাপ—যত মাতলামি চাগিয়ে ওঠে—এক ফোঁটা খেলেই অমনি খুনের নেশা চেপে যায়। সে কি শেষে খুনীই হবে? এই মাটির নীচের নিঃশব্দতায় আশ্রয় নেবার পর থেকে সে তো দর্দম কামনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। দুদিন সে আদিম মানুষের ঘুমে বিভোর হয়ে ছিল। শুধু পেট পুরে খেয়েছে, আর অবসাদে এলিয়ে পড়েছে। কিন্তু তবু মাথা ঘোরার জের চলেছে। থেঁতলে, ছড়ে গেছে সারা গা, মুখে এখনো তেতো স্বাদ, মাথায় যন্ত্রণা—যেন এক বেসামাল পানোন্মত্ততা থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। এক সপ্তাহ এমনি করে কেটে গেল। মেয়ুরা তার গোপন আশ্রয়ের কথা জানে, তবু একখানা মোমও পাঠাতে পারেনি; আলো দেখার আশা ছেড়ে দিয়েছে। খাবার সময়েও আর আলো জোটে না।

এখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খড়ের উপর শুয়ে-শুয়ে কাটিয়ে দেয়। কত ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, নিজের ভাবনা বলে চিনতেও পারে না। কেমন যেন কর্তৃত্বের চেতনা তাকে পেয়ে বসে। সে যেন সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তার বুদ্ধি বেড়েছে তাই সে উঠে এসেছে অনেক উপরে—আত্মিক বিকাশের তুঙ্গে। এমন গভীরভাবে আগে সে কখনো ভাবতে বসেনি। ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে যায়, পিটে পিটে যে খ্যাপার মত ছুটে গিয়েছিল—তার পরে হঠাৎ এ বিরক্তি এল কেন। কিন্তু নিজের প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো সাহসও তার নেই। তার স্মৃতি যে নিজের কাছেই অতি হীন বলে মনে হয়। হীনতা-প্রণোদিত ছিল তার কামনা, ছিল নীচ প্রবৃত্তির তাড়না—আর ছিল দারিদ্র্যের পচা গলা গন্ধ। হাওয়া তো সেদিন ভরে উঠেছিল সেই গন্ধে। অন্ধকার তাকে পীড়া দেয়, তবু যখন ধাওড়ায় ফিরে যাবার সময় আসবে, সে তো সেই মুহূর্তকে ঘৃণাই করবে। উঃ, হতভাগারা কি করে স্তূপের মতো একই টবের ভিতর যেন গাদাগাদি করে পড়ে আছে—ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। এমন কেউ নেই যে যার সঙ্গে ভাল করে রাজনীতির কথা বলে। এ যেন পশুর জীবন। সেই একই পেঁয়াজের বদবুতে বিষাক্ত হাওয়া—

নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে যায়। ও চেয়েছিল ওদের দিগন্তকে বাড়িয়ে দিতে, চেয়েছিল মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর, রীতিনীতি আমদানী করতে—তাদের মালিকের আসনে বসাতে। কিন্তু সে তো দীর্ঘ-দিনের কাজ। আর তো বিজয়ের আশায় বসে থাকারও সাহস নেই। কে থাকবে এই বুভুক্ষার কারাগারে বন্দী হয়ে। ওদের নেতা—ওদের হয়ে ওকেই ভাবতে হয়—ক্রমেই এ অহমিকা ওকে ওদের থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। তার ভিতরে এমনি করে মধ্যবিত্ত মানস পত্তন হয়েছে, দেখা দিয়েছে—অথচ মধ্য-বিত্তের প্রতি তার তো অপরিসীম ঘৃণা।

এক সন্ধ্যেয় জাঁলিন নিয়ে এল এক টুকরো মোম। একজন ঠেলাওলার লণ্ঠনের ভিতর থেকে চুরি করে আনল। এতিয়েঁর এ যেন পরম স্বস্তি। এখন অন্ধকার তো তাকে প্রায় পাগল করে দেয়, মাথার খুলির উপরে যেন ভারী হয়ে চেপে বসে। তাই সে মাঝে মাঝে এক-আধ মিনিটের জন্য আলো জ্বালায়। এমনি করে দুঃস্বপ্ন দূরে যায়। আবার নিবিয়ে দেয় ফুঁ দিয়ে। আলো সম্বন্ধেও সে কৃপণ। রুটির মতোই আলো তার জীবনে এখন সমান দরকারী। নিস্তব্ধতা যেন কানে এসে বাজে, ভন্‌ভন্‌ করে মগজে। শুধু কানে আসে পলাতক ইঁদুরদের শব্দ। আর পুরানো কাঠের মচ্‌মচানি। আর একটা মাকড়সা জাল বোনে অন্ধকারে তারই অস্পষ্ট শব্দ। এই বন্ধ গুমোট শূন্যতায় চোখ মেলে একমাত্র ভাবনা ভাবে—কি করছে এখন তার সাথীরা উপরে। সে যদি দল ছেড়ে আসতো, তার চেয়ে আর চরম ভীরুতা কি হোত। এই যে সে লুকিয়ে আছে, এ তো জেলের বাইরে থেকে ওদের পরামর্শ দেবার জন্যে, কিছু করবার জন্যে। এই দীর্ঘ ভাবনায় ওর উচ্চা-কাঙ্ক্ষার হদিস ও পেয়ে গেছে। সে এখন প্লুচার্তের ভাগ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়—তার চেয়ে বড় হবার আশা করবে না। ছেড়ে দেবে মেহনতীর কাজ, রাজনীতিতে ঢেলে দেবে তার সমস্ত সময়। কিন্তু একা সে থাকবে, ঘরখানা হবে ছিমছাম। সে নিজেই আবার মনকে বুঝ দেয়—মগজের খাটনিতে জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি দরকার।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে, জাঁলিন এসে তাকে খবর দিলে, পুলিস ভেবেছে সে বেলজিয়াম সীমান্ত পার হয়ে গেছে। এতিয়েঁ তাই এখন সাহস করে গর্ত থেকে রাতে বেরিয়ে আসে। চারিদিক সরজমিনে তদন্ত করে দেখতে চায়। এখনো ধর্মঘট চালু রাখা যায় কিনা তারও একটা সিদ্ধান্ত করা দরকার। নিজে সে ধর্মঘটের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান। ধর্মঘটের আগেও সে এমনি সন্দিহানই ছিল, কিন্তু অবস্থাগতিকে রাজী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তো বিদ্রোহের নেশা কেটে গেছে, আবার সেই আগেকার সন্দেহ-সংশয় এসে দেখা দিয়েছে। কোম্পানিকে যে কখন তাদের দাবি-দাওয়া মানতে বাধ্য করাতে পারবে সে আশাও আর নেই। কিন্তু তবু নিজের মনে মনেও একথা সে স্বীকার করতে চায় না। পরাজয়ের দুঃখের কথা ভাবলেই তার মন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। এই সুতীব্র যন্ত্রণার দায়-দায়িত্ব যেন তার মনে গুরুভার হয়ে চেপে বসে। ধর্মঘট শেষ মানে কি তার ভূমিকারও শেষ নয়? তার আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ, পিটের জীবনের পুনরাবৃত্তি। ধাওড়ার শোচনীয় জীবনেরও কি শেষ নয়? সে নিজেকে ভোলাতে চায় না। বিচারে

তার ভুল হয় না। সে চায় আবার তার সেই আদর্শকে ফিরে পেতে—নিজের কাছে সে প্রমাণ করতে চায়—এখনো প্রতিরোধ সম্ভব। মেহনতী মানুষ যদি শহীদ হতে পারে, ধনবাদ তো আপনা-আপনি গুঁড়িয়ে যাবে।

সারা অঞ্চল জুড়ে আর তো কিছু নেই—শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস, ধ্বংসের যেন এক দীর্ঘ প্রতিধ্বনি উঠছে। রাতে নেকড়ে বাঘ যেমন তার বনের আশ্রয় থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসে, তেমনি করে রাতে বেরিয়ে পড়ে সে। কয়লা-কালো অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এই অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুনতে পায় আর্থিক সংকটের ধস্ নামার শব্দ। পথের পাশে শুধু দেখে বন্ধ কারখানার সার। একেবারে মৃত তারা—কারখানা বাড়িগুলি ছাই-রঙা আকাশের নীচে পড়ে আছে, যেন পচন ধরেছে ওদের। চিনির কল-গুলির অবস্থাই চরম। হটনের চিনির কল, ফবিলের কারখানা—মজুর ছাঁটাই করে দিয়ে প্রথমে চালাচ্ছিল। এখন একে একে লালবাতি জেবলেছে। দুতিলিল-এর ময়দার কলে শেষ যাঁতাখানা ঘুরেছে সেই মাসের দ্বিতীয় শনি-বারে; ব্লুজ-এর দড়ির কারখানায় খনির দড়ি আর তার তৈরি হয়—সে কারখানা তো একেবারে বন্ধ। মার্সিয়েনে এলাকায় দিনের পর দিন অবস্থা মন্দ হচ্ছে। গায়বোয়া কাচের কারখানায় এখন হাপর আর জ্বলে না, সোমারভিল কারখানা থেকে মজুর ছাঁটাই চলছে, ফোর্জেস-এর তিনটে ব্লাস্ট ফার্নেসের এখন একটা শুধু জ্বলে। আর কোক-কয়লার চুল্লীগুলো জ্বলে না—দিগন্তে আগুন ধরিয়ে দেয় না। যে-শিল্প সংকট আজ দু' বছর হ'ল তীব্র হয়ে উঠেছে, মঁতসুর খনির মজুরদের ধর্মঘট তারই ফল। আবার এই ধর্মঘটে সংকট আরো বেড়ে উঠেছে—এখন তো সর্বনাশ উপস্থিত। এই দুর্দশার আরো কারণ আছে। আমেরিকা থেকে মালের চাহিদা কমে গেছে, অতিরিক্ত উৎপাদনে আমানতি পুঁজি বেড়ে গেছে। তার উপরে এখন এসে তার সঙ্গে জুটেছে কয়লার অভাব। যে-কটা বয়লার এখনো চালু আছে তারও কয়লা পাওয়া ভার। খনি আর যোগান দিতে পারে না কলের খাবার। তার মানে তো কল-কারখানার মৃত্যু। এ এক সর্বময় সংকট—উদ্বেগ। তাই কোম্পানি কয়লা তোলার কাজ কমিয়ে দিয়ে মজুরদের উপোস করিয়ে রাখছে। তার অবশ্য-ম্ভাবী ফলও ফলল। ডিসেম্বরের শেষে ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে কয়লার গুঁড়ো অবধি আর রইল না। সবকিছুই যেন একসঙ্গে গাঁথা। সর্বনাশের হাওয়া বয়ে গেল। একটা সর্বনাশ থেকে আর একটা সর্বনাশ এসে দেখা দিল। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো ধসে পড়বার সময় এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। এমনই বিপর্যয়ের পালা শুরু হয়ে গেল যে, আশে পাশের শহর লিল্, দুয়াই, ভ্যালেঁসিয়েনেতেও তার চোট গিয়ে পড়ল। সেখানে ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক ফেল হতে লাগল। শহরের বাসিন্দেরা ফকির হয়ে গেল।

তুষার-ঝরা রাতে প্রায়ই এতিয়েঁ একটা পথের মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, শোনে, চুন সুরকি বালি খসে খসে পড়ছে। অন্ধকারে নিঃশ্বাস নেয় জোরে। ধ্বংসের আনন্দ তাকে পেয়ে বসেছে। তার আশা—পুরানো পৃথিবী এমনি করেই লোপ পাবে—আর তার পরে দেখা দেবে আগামীর প্রভাত। তখন তো সাম্যের কাস্তে জমির উপর দিয়ে চলে যাবে; সব সমান করে দিয়ে যাবে—একটি ধনীও আর থাকবে না দুনিয়ায়। এই যে সর্বাত্মক ধ্বংস এরই মধ্যে

কোম্পানির পিটের দশাই বেশি করে তার মন টানে। সে আবার অন্ধকরা অন্ধকারের ভিতরে যাত্রা করে। একে একে পিটগুলো ঘুরে বেড়ায়। নতুন কোন ক্ষতির কথা শুনলে তার আনন্দ হয়। কাঁথিগুলির এখন আর খপরদারি তেমন করে হয় না, তাই এখানে ওখানে নিতান্তই ধস্ নামে। আবার সে ধস্ তো দিনে দিনে আরো ভীষণ হয়ে ওঠে। মিরুর উত্তর দিকের কাঁথির উপরে মাটি এমন বসে গেছে যে, একশো গজ দূরের জয়সেল রোড অবধি ভেঙে গেছে। মনে হয় যেন ভূমিকম্পই হয়েছে। কোম্পানি এই দুর্ঘটনার গুজবে এমন অধির হয়ে পড়েছে যে, যাদের জমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই মালিকদের দরাদরি না করে খেসারত দিয়েছে। ক্রেভকুর আর মাদেলিনে পাথর বড়ই আল্‌গা হয়ে এসেছে, তাই কাজও থেমে আসছে সেখানে। লোকে বলে, দুজন ছোট সর্দার নাকি লা ভিক্তরে চাপা পড়েছে। ফিউৎরি-কাঁতেল তো জলে জলময়, আর সাঁ-তমাসের একটা কাঁথিকে কাঁথি নাকি দেয়াল ঘিরে দিতে হবে। রোলার কাজ নাকি সেখানে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। প্রতি ঘণ্টায় এমনি করে মোটা টাকা খরচ হচ্ছে, অংশীদারদের লভ্যাংশে ধরছে ফাটল। আর দ্রুত হয়ে আসছে পিটগুলির ধ্বংস। মঁতসুর সেই বহুখ্যাত দিনেয়ার গ্রাস করে বুঝি সে ক্ষান্ত হবে। অথচ সে দিনেয়ার তো একশো বছরে অমন একশো গুণ বেড়ে উঠেছে।

সর্বনাশের পুনরাবৃত্তি চলছে। এরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতিয়েনের আশা তো আবার জেগে উঠল। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিলে, তৃতীয় মাসে যদি প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যায়—তাহলে ঐ বিরাট দৈত্যটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ও তো ভুরিভোজে তন্দ্রালু পশু, মন্দিরের গোপনতায় মূর্তির মতো ওত পেতে আছে। সে জানে মঁতসুর এই বিপর্যয় পারীর খবরের কাগজে-কাগজে তুলেছে উত্তেজনার ঝড়। শুরু হয়ে গেছে সরকারী মুখপত্র আর বিরোধীদলের কাগজে বাগ-বিতণ্ডা। বিশেষ করে আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে বেরিয়েছে লোমহর্ষক সব বিবরণ। সাম্রাজ্যবাদী সরকার প্রথমে সেগুলিতে উৎসাহের যোগান দিয়েছে বটে, কিন্তু এখন সে ভয় পেয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ আর কালা হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। দুজন পরিচালক তো এসে তদন্তও করে গেছেন। কিন্তু এ তো অনিচ্ছায় তদন্ত, ফলাফলের জন্য তাই মাথাও ঘামান নি। সত্যিই তাঁদের 'নিরপেক্ষতা' এমনই যে, তদন্ত সেরে তিন দিনের ভিতরেই আবার স্বস্থানে ফিরে গেছেন। আর জানিয়ে দিয়েছেন যে, সবকিছুই এখানে চমৎকার চলছে। কিন্তু আর এক তরফ থেকে সে খবর পেয়েছে, এখানে যখন এই ভদ্রলোকেরা ছিলেন, তাঁরা বসে বসে অবিশ্রান্ত কাজ করে গেছেন। যেন জ্বরের ঘোরের মতোই তাঁদের কাজের ঘোর পেয়ে বসেছিল। এমন সব কাজে তাঁরা ডুবে ছিলেন, যার কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। সে তো কাজকে অভিনয় বলেই মনে করে। তার মনে হয়, ভদ্রলোকেরা ভয়ে পালিয়ে গেছেন। এখন তো সে জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, এই ভয়ানক জীবের দল তো সব আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু পরের রাতে আবার হতাশা এসে দেখা দিল। কোম্পানির শিরদাঁড়া খুবই মজবুত। অতো সহজে ভাঙবে না। ওদের লাখো লাখো টাকার

ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু শেষে ঠিক মজুরদের রুজি থেকে কেটেকুটে সবটা আদায় করে নেবে। খুবলে নেবে ওদের রুজির ভাগ। রাতে সে জাঁ-বার্ত অবধি ঘুরতে ঘুরতে চলে এল। সেখানে ভাবনার সত্যও প্রমাণিত হ'ল। একজন ওভারসিয়ার তাকে জানালে, ভান্দাম মঁতসুর হাতে সঁপে দেবার কথা চলছে। দেনেউলি'র বাড়িতে এখন নাকি চরম দারিদ্র্য। অবশ্য এ দারিদ্র্য ধনীজনের। ধনী নেমে এসেছে তলায়। ব্যর্থতায়, টাকাকড়ির উদ্বেগে বাপ অসুস্থ; দেনার হিসাব পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। মেয়েরা ঘুরছে তারই ভিতরে। তারা এই ধ্বংসের ভিতর থেকে তাদের জামা-কাপড় ক'টা বাঁচাবারও অন্তত চেষ্টা করছে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কুলি-বস্তির দুর্দশাও বুঝি সংগতিপন্নের এই অবস্থার চেয়ে শ্রেয়। সংগতিপন্ন মধ্যবিত্ত তো পাছে কেউ দেখে ফেলে নিষ্ঠে জল খাচ্ছে—এই ভয়ে দোর বন্ধ করে বসে থাকে। জাঁ-বার্তে আর কাজ চালু হয় নি। গ্যাস্তঁ-মারির পাম্পটা আবার বদলাতে হয়েছে। যত তাড়াতাড়িই বিলি-ব্যবস্থা হোক, জলে জলময় হয়ে গেছে। এতে খরচান্ত হতে হচ্ছে। শেষে দেনেউলিঁ গ্রিগোয়েরদের কাছে গিয়েই এক লক্ষ পাউন্ড মুখ ফুটে ধার চেয়ে বসলেন। তিনি জানতেন, তাঁরা রাজী হবেন না। কিন্তু তবু একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন। এ যেন চরম দুর্দশা এসে চেপে বসল। তাঁরা বলেছেন, তাঁকে ভালবাসেন বলেই রাজী হননি। এমন অসম্ভব লড়াই থেকে তাঁকে নিরস্ত করতেই চান। তা ছাড়া পরামর্শ দিয়েছেন, উনি যেন বেচে দেন পিটটা। কিন্তু আগের মতই তিনি হুংকার দিয়ে বলেছেন—না, তা হবে না। ধর্মঘটের সমস্ত চাপটা তাঁর উপর পড়ায় তিনি রেগে গেছেন। প্রথমে তো মনে হয়েছিল মাথায় রক্ত উঠে সন্ন্যাস-রোগে মারাই যাবেন। কি করা যায়? মঁতসুর পরিচালকদের প্রস্তাবটা খতিয়ে দেখতে বসলেন। ওঁরা দরাদরি করছেন—এমন দাঁওটাকে যেন সামান্য ব্যাপার বলেই মনে করছেন। একেবারে আহেলি বিলায়েৎ সাজসরঞ্জামওয়ালা পিট—শুধু নগদ টাকা নেই বলেই কাজ বন্ধ আছে। তিনি যদি নিজের পাওনাদারদের পাওনা শোধ দেবার মত টাকা পান তো তাঁকে ভাগ্যবানই বলতে হবে। দুদিন মঁতসুর পরিচালকদের বিরুদ্ধে যুঝলেন। তাঁরা এসে তাঁবু খাটিয়ে বসলেন দর কষাকষি করতে। তাঁরা তো একেবারে শান্ত। তাঁর দুর্দশার সুযোগ নিচ্ছেন বলে, ক্ষেপে গেলেন। বার বার হুংকার ছাড়লেন—না, কখনো না। এইখানেই ব্যাপারটা চাপা রইল। পরিচালকেরা ফিরে গেলেন প্যারীতে। সেখানে তাঁরা ধৈর্য ধরে বসে থাকবেন—কখন মৃত্যু-মুহূর্তের ঘড়ঘড়ানি ওঠে সেই আশায়। এতিয়েঁ বুঝতে পারল, এই ভাবেই কোম্পানি তার ক্ষতিপূরণ করে নেবে। সে আরো হতাশ হয়ে পড়ল। এই তো বৃহত্তর পুঁজির অজেয় শক্তি। সংগ্রামে সে দুর্ধর্ষ। পরাজয়েও সে ক্ষুদ্র পুঁজির লাশটা খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে ওঠে।

ভাগ্য ভাল, জাঁলিন পরদিন কয়েকটা সুখবর নিয়ে এল। লা ভোরোতে রোলার কাজ নাকি ভেঙে পড়েছে আর প্রতিটি ফাটল দিয়ে জল এসে ঢুকছে। একদল ছুতার সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে ছুটেছে।

এতদিন লা ভোরোর দিকটা এড়িয়েই চলেছে এতিয়েঁ। সান্ত্রীর চেহারাটা তার ভাল লাগেনি। পিটের পাড়ে মাঠের দিকে মুখিয়ে ওর কালো

ছায়াটা তো সব সময়েই দেখা যায়। ওকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সব কিছুর মালিক হয়ে যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। যেন পল্টনি নিশান উঁচুতে উড়ছে। ভোরের দিকে তিনটের সময় আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। সেও অমনি পিটে চলে গেল। সেখানে কয়েকজন সাথী তাকে জানালে রোলার কথা। ওদের মত সবটাই আবার নতুন করে করতে হবে। আর তাতে তিনমাস পিটে কয়লা তোলা বন্ধ থাকবে। বহুক্ষণ সে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। স্যাফটে শুনল ছুতোরের ছেনি-বাটালির শব্দ। সে খুশী। হ্যাঁ, ক্ষত হয়েছে বটে, সে ক্ষতস্থানের শুশ্রূষা দরকার।

ভোরের দিকে ফিরতি পথে সে সান্ত্রীকে দেখতে পেলে পিটের পাড়ে। এবারে সান্ত্রীও তাকে দেখতে পাবে। উপায় নেই। চলতে চলতে সে ভাবলে এই সিপাহীদের কথা—ওদের তো জনগণের মধ্য থেকেই সংগ্রহ করা হয়—আবার জনগণের বিরুদ্ধেই ওদের হাতে তুলে দেয় হাতিয়ার। যদি সৈন্য-বাহিনী তাদের পক্ষে আসত, তাহলে কত সহজে বিপ্লব হোত সার্থক! শুধু সেনাছাউনির ঐ মজুর আর চাষীকে স্মরণ করতে হবে তার জন্মকথা। সে তো এক ভয়ানক কান্ড—এক ভীষণ সর্বনাশ—ফৌজে ভাঙন ধরতে পারে একথা ভাবতেও যে মধ্যবিত্তদের দাঁতকপাটি লেগে যাবে। দু'ঘণ্টার ভিতরেই তারা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মুছে যাবে তাদের বিলাস-আলসে ভরা নীচ জীবন। এখনি তো শোনা যায়, পল্টনে পল্টনে নাকি সমাজতন্ত্রবাদের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, সংক্রামিত হয়েছে। তা কি সত্যি? মধ্যবিত্তরা যে কার্তুজ তাদের দিয়েছে, সেই কার্তুজ দিয়েই কি তারা দুনিয়ায় ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে? আবার নতুন আশা এসে দেখা দিল। যুবক স্বপ্ন দেখলে, যে গোটা পল্টনটা পিটে পিটে পাহারা দিচ্ছে—তারা ধর্মঘটীদের সঙ্গে এককাট্টা হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিরেক্টরদের সবাইকে তারা গুলী করে মেরে ফেলল, তারপর খনি তুলে দিল খনির গোলাম মজুরদের হাতে।

এমনি ধারা ভাবতে ভাবতে সে পিটের পাড়ে উঠে এল। সান্ত্রীটির সঙ্গে কথা বললে হয় না? ওর মনের ভাবটা আঁচ করে নিতে পারবে। বেপরোয়া ভাবে সে এগুতে লাগল। ভাবখানা যেন আবর্জনার ভিতরে কাঠ-কুটরো খুঁজছে। সান্ত্রী অচল-অটল।

এতিয়েঁ এবার বলে উঠল, সাঙাৎ—কি বিচ্ছিরী দিনই পড়ল। কি জানি হয়ত বরফ পড়াই শুরু হবে।

সান্ত্রীটি বেঁটেখাটো, রং ফরসা, ভারি মিষ্টি নিরীহ মুখখানি; জেল্লা নেই মুখে! এখানে ওখানে উঠেছে ফুসকুড়ি। ফৌজে আনকোরা আমদানী রঙরুট। তাই মস্ত ফৌজি জোব্বাটা এখনো ভাল করে গায়ে আঁটতে শেখেনি।

সে বিড় বিড় করে বললে, তা হবে।...আমার তো মনে হয়...

নীল চোখ দুটো মেলে বহুক্ষণ বিবর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। দূরে প্রান্তরে কালোঝুল মাখা ঊষা যেন সীসের মতো গুরুভার হয়ে চেপে বসেছে।

এতিয়েঁ আবার বললে, ওরা কত বড় হাঁদা ভাব তো, তোমাকে এখানে মোতায়েন রেখেছে, এদিকে তুমি যে বরফে জমে যাবে! এখানে তো সব সময়েই এমনি জবর হাওয়া!

সান্ত্রীটির মুখে নালিশ নেই, সে শুধু কাঁপছে। পাথরের একটা কুঠরি আছে কাছেই। ঝড়-বাদলা রাতে বুড়ো বনেমোর সেখানেই ঠাঁই নিত। কিন্তু হুকুম আছে, কোন মতেই পিটের পাড় ছেড়ে যাওয়া চলবে না। তাই সে নড়ে-চড়ে না। তার হাত ঠান্ডায় অবশ হয়ে গেছে। এমন অবশ যে, এখন আর হাতিয়ার হাতে আছে বলে মনে হয় না। ভোরো রক্ষীবাহিনীর ষাটজন সিপাহীর মধ্যে সে একজন। এখানে প্রায়ই তার পাহারার পালা পড়ে। এই তো আগের পালায় সে তো একরকম জমেই গিছল। পা তুষারে গিয়েছিল একেবারে অবশ হয়ে। তার চাকরির এই দাবি; এক নিষ্ক্রিয় বাধ্যতায় এ অবসাদ যেন আরো চরমে উঠেছে। সে বিড়বিড় করে ঘুমন্ত শিশুর মতো কি সব প্রলাপ বকে গেল।

এতিয়েঁ তাকে রাজনীতির কথা বলাবার জন্যে পনেরো মিনিট ধরে চেষ্টা করলে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সে যেন বুঝতে পারছে না, এমনিভাবে হাঁ-হুঁ দিয়ে গেল। হাঁ, কোন কোন সাঙাৎ বলে বটে যে, ক্যাপটেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তার নিজের কথা, সে ওসব খবর রাখে না। ধারও ধারে না। যদি গুলী ছোঁড়বার হুকুম পায়, গুলীই সে ছুঁড়বে। শাস্তি এড়াবার ভয়েই ছুঁড়তে হবে। এতিয়েঁ শুনলে; ফৌজের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা তাকে পেয়ে বসেছে। ওরা তাদেরই ভাই, অথচ লাল পাজামায় পাছা ঢেকেছে বলে মনও বদলে গেছে।

কি নাম তোমার ভাই ?

জুল্।

কোথায় বাড়ি ?

ওই হোথায় প্লোগফে।

হাত সে বার বার তুলছে। ব্রিটানির একখানি গ্রাম। তার বেশি সে জানে না। খুদে মুখখানায় উত্তেজনা। হাসছে, চাঙ্গা বোধ করছে।

মা আর বোন আছে। ওরা আমার পথ চেয়ে বসে আছে। আজ-কালই যাব এমন নয়। আমি যখন আসি, ওরা প'লা আবি অবধি এল। আমরা লেপালমেকের ঘোড়াটা চেয়ে নিলাম। তা ঘোড়াটা আবার অদিয়ান পাহাড়ের তলায় পা ভেঙে থুবড়ে পড়ে আর কি। আমার খুড়তুতো ভাই চার্লি এল সসেজ নিয়ে। কিন্তু মেয়েরা এমন কান্না জুড়ে দিলে যে আমরা বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতেই নারলাম। উঃ, ঘর থেকে কত দূরে এলাম।

এখনো হাসছে সান্ত্রী, কিন্তু চোখ তার ভেজা। প্লোগফের সেই ছন্ন-ছাড়া জলাভূমি, দুর্দান্ত ঝোড়ো হাওয়াময় রাজ্ যেন ভেসে এল ওর চোখের সামনে। সে তো জলাভূমির রঙের মরশুমে স্বর্ণাভ, সূর্যস্নাত এক দৃশ্য।

সে শুধালে, আচ্ছা, যদি ভাল হয়ে থাকি, সাজা না পাই—ওরা কি দু' বছরে মাস দুয়েকের ছুটিও দেবে না ?

এতিয়েঁ এবার তার নিজের দেশের কথা বলতে শুরু করলে। প্রভেন্সে তার বাস। যখন খুব ছোট, তখন থেকে দেশছাড়া। দিনের আলো ফুটে উঠছে, সীসেরঙের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে তুষারকণা। শেষে জাঁলিনকে দেখে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সে ঝোপের ভিতরে গুঁড়ি মেরে চলেছে। হতবুদ্ধি হয়ে গেল এতিয়েঁ। তাকে ইশারা করছে ছেলেটা। কি হবে

ফৌজের সঙ্গে ভাই-বেরাদারি পাতাবার স্বপ্নে। কি ফায়দা। বছরের পর বছর চলে যাবে কিছুই হবে না। মনটা ভারী হয়ে গেল—যেন সাফল্যের আশাই করেছিল। হঠাৎ সে জাঁলিনের ইশারার মানে খুঁজে পেল—সান্ত্রীর এবার বদলির পালা। এতিয়েঁ চলে এল। সে এবার রিকুইলরের গর্তে গিয়ে মাথা গুঁজে থাকবে। আবার নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনায় বুকখানা দলে-পিষে যেতে লাগল। ছেলেটাও তার পেছু পেছু ছুটল। ওরা যে রক্ষীদের এনে মজুরদের উপর গুলী ছোঁড়ার হুকুম দিয়েছে—তারই নালিশ জানালে।

জুল তখনো পিটের চূড়ায় অচল-অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে তুষারপাত। সার্জেন্ট দলবল নিয়ে এল, নিয়ম-মাফিক জিগির উঠলঃ

হুকুমদার? আগু বাড়ো, পাস দেখাও!

আবার ভারী পায়ের শব্দ ওরা শুনতে পেল। যেন বিজিত দেশ কাঁপিয়ে চলেছে বিজয়ীর দল। দিনের আলো এখন সুস্পষ্ট, ধাওড়া এখনো স্পন্দন-বিহীন। খনির গোলামেরা জঙ্গী বুটের তলায় নিঃশব্দ ক্রোধে গুমরে মরছে।

দুই

দুদিন ধরে অবিরাম তুষারপাত চলছিল, আজ সকালে হয়েছে বিরাম। তুষারে তুষারে প্রান্তর ঢাকা—যেন এক বিস্তীর্ণ তুষারের চাদর বিছিয়ে আছে। কালো কয়লার দেশ; কালিময় পথঘাট দেয়াল আর গাছপালা। কয়লার গুঁড়োয় ঢাকা। এখন সেগুলি সব সাদা। এক অখণ্ড শুভ্রতা যেন বিছিয়ে আছে—অন্ত তার নেই। দুশো চল্লিশ নম্বর ধাওড়াও তুষারের নীচে চাপা পড়ে গেছে। যেন তার হদিসই মেলে না। চোঙ দিয়ে আর ধোঁয়া বার হয় না; বাড়িগুলিতে আগুন জ্বলে না কুণ্ডে কুণ্ডে। যেন পথের পাথরের মতোই তারা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ছাদের উপরের বরফের ঘন আস্তরণ আর গলে না। গোটা ধাওড়া দেখে সাদা পাথরের খনি বলে মনে হয়। সাদা প্রান্তরে সাদা পাথরের খনি। মনে হয়—শ্বেত আচ্ছাদনে ঢাকা মৃত গ্রাম। শুধু সিপাহীর দল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের পায়ের চাপে পথ কাদায় কাদা।

মেয়ুদের বাড়িতে পিটের পাড় থেকে কুড়ানো কয়লা কালই পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। এই ভীষণ আবহাওয়ায় কয়লা কুড়োতে আর বেরুনোও চলে না। এখন তো স্পারোও একটা ঘাসের শীষ খুঁজে পায় না। আলঝির হাত দিয়ে বরফ ঘেঁটে ঘেঁটে এখন মরতে বসেছে। মা তাকে পুরানো এক টুকরো বিছানার চাদরে ঢেকে রেখে বসে আছে ডাক্তারের অপেক্ষায়। এরই মধ্যে দু-দুবার তাঁর বাড়ি গিয়ে ঘুরে এসেছে। কিন্তু নিষ্ফল গতায়াত। বাড়ির পরিচারিকা বলেছে, সন্ধ্যের আগে তিনি ফিরবেন না। তাই এখন জানালার ধারে বসে বসে নজর রাখছে। আর রোগা মেয়েটা বায়না ধরেছে নীচে যাবে। কিন্তু তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সে কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। নিবন্ত উনুনের সামনে বসলে হয় তো চাঙ্গা হয়ে উঠবে—এ মোহটুকু তার

এখনো আছে। বুড়ো বনেমোর বসে আছে উল্‌টো দিকে, আবার পায়ে সোঁত হয়েছে—মনে হয় ঘুমুচ্ছে। লেনোর আর আঁরি কেউই ভিক্ষে করে ফেরেনি। ওরা জাঁলিনের সঙ্গে আজকাল পথঘাট এমনি করে চষে বেড়ায়। মেয়ু শুধু একা ঘরে। এধার ওধার করে বেড়াচ্ছে। ফি-বারেই দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সে যেন হতবুদ্ধি জন্তু—আর খাঁচাটার ঠাহর করবার অনুভূতিও তার নেই। কেরোসিন তেলও বাড়ন্ত। কিন্তু বাইরের তুষারের জেল্লা এমন উজ্জ্বল যে তাতেই ঘর ম্লান আলোয় ভরে গেছে। বাইরে এখন ঘনায়মান রাত।

এবার কাঠের গোড়তোলা জুতোর আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে। লেভাক-বৌ যেন দমকা হাওয়ার মতোই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। রাগে সে অধীর। মেয়ু-বৌকে দাওয়া থেকেই হাঁক পেড়ে বললে,

মোর সঙ্গে বাসাড়ে যদি শোয় তো বিশ সু লাগবে—একথা তাহলে তুই-ই বাত্‌লে দিয়েছিস লা?

মেয়ু-বৌ ঘাড় নাড়লে।

দেখ গা, জ্বালিয়ো না বলছি! মুই এমন কথা কেনে বলব…কে বললে, এমন কথা আমি বলেছি?

কে বললে, তা দিয়ে তোর কাম কি রে! শুনলাম, বলেছিস। আরো বললি, মোদের নোংরা ব্যাপার-স্যাপার নাকি দেয়ালের ওপাশ থেকে শুনতে পাস? চিৎ হয়েই থাকি বলে নাকি মোর ঘরবাড়ি সব নোংরা…বল্‌ তো, তুই বলিস নি লা?

প্রতিদিনই এমনি ব্যাপার ঘটে। মেয়েদের অবিরাম গুজবেই অমনি হয়। লাগোয়া বাড়িগুলিতে তো বিশেষ করে বিবাদ আর মিলন দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু এমন তিক্ততা নিয়ে কেউ একে অপরের উপর আগে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। ধর্মঘটের সময় থেকে ওদের বিদ্বেষ বাড়িয়ে তুলেছে বুভুক্ষা। তাই তারা কিল-ঘুষির কথা এখন ভাবে। দুটি গুজবপ্রবণ স্ত্রীলোকের বিবাদ শেষে তাদের দুটি মরদের মারাত্মক লড়াইয়ে পরিণত হয়।

পালা-মতো এবার লেভাক এসে হাজির হ'ল। বুতেলুপকেও টেনে নিয়ে এল।

এইতো মোদের সাঙাৎও এসে গেছে। এবার ও-ই বলুক, মোর বৌয়ের সাথে আশনাই করার জন্যি ও বিশ সু দিয়েছে কি না।

বাসাড়ের বিরাট দাড়ি, তারই আড়ালে নিজের ভীরুতা প্রচ্ছন্ন। সে আমতা-আমতা করে প্রতিবাদ জানালে।

না-না! এমন কথাও হয় নি! কখ্‌খনো না!

তৎক্ষণাৎ লেভাক ভীষণ হয়ে উঠল। মেয়ুর নাকের সামনে ঘুষি বাগিয়ে ছুটে এল।

দেখ, এসব চলবে নি! তোমার বৌ যদি অমন কথা বলে, তাকে ধরে পিটতে পার না! তার মানে, ওর কথা সাচ্চা বলেই তুমি মনে কর?

মেয়ু হতাশায় ডুবে ছিল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সে রেগে গেল।

ভগবানের দোহাই, এসব কি বাজে গুজব বল তো! মোদের কি শিক্ষা হয়নি। এত বিপদের পরেও আরো চাই নাকি! যাও চলে যাও, নইলে

এখুনি পেড়ে ফেলব বলছি!...তা ছাড়া, মোর জরু একথা বলেছে কে বললে?

কে বললে? কেনে পিয়েরোঁ-বৌ।

মেয়ু-বৌ হি হি করে হেসে উঠল। তারপর লেভাক বৌকে বললে, ওঃ, মোদের পিয়েরোঁ-বৌ বলেছে? বহুৎ আচ্ছা! ও তোর নামে কি বললে, বলিনি বুঝি, না? ও বললে, তুই নাকি দুটো মরদকে এক সঙ্গে নিয়ে শুয়ে পড়িস। একটা থাকে উপরে, আর একটা নীচে।

এর পরে আর বোঝাপড়া চলে না। সবাই রেগে টং। লেভাকরা মেয়ুদের কথার জবাবে বললে, পিয়েরোঁ-বৌ নাকি ওদের নামেও ঢের ঢের লাগিয়েছে। ওরা নাকি ক্যাথিকে বেচে দিয়েছে। এতিয়েঁ ভল্‌কান থেকে দুষ্ট রোগ নাকি নিয়ে এসেছে, সেই রোগ নাকি সবাইকে—এমন কি বাচ্চা-কাচ্চাদের অবধি ছেয়ে ফেলেছে।

মেয়ু চেঁচিয়ে উঠল—তাই বলেছে নাকি! তাই বলেছে! বহুৎ আচ্ছা। সোজা ওদের ওখানেই যাব। ও যদি বলে, সত্যিই বলেছে, তাহলে চোয়ালে একখানা ঝেড়ে দেব না!

ছুটে বেরিয়ে গেল মেয়ু। পিছনে লেভাকরা ছুটল সাক্ষী হিসেবে। বুতেলুপ এসব নাটকীয় ব্যাপার পছন্দ করে না। তাই সে ওদের এড়িয়ে চুপি চুপি সরে পড়ল। মেয়ু-বৌও তর্কে-বিতর্কে খুবই চটে আছে। সেও ওদের পেছু ছুটছিল, কিন্তু আলঝিরের কান্না শুনে থেমে গেল। ঐ ছেঁড়া চাদরের টুকরোখানি ও শিশুর কম্পিত দেহে ভাল করে জড়িয়ে দিলে। তারপর জানালায় ফিরে গেল নজর রাখতে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কখন আসবে ডাক্তার।

পিয়েরোঁদের বাড়ির দরজায় মেয়ু আর লেভাকদের লিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তুষারে ছুটোছুটি করছে। বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ, কিন্তু একটা শার্সির ফাঁক দিয়ে একটি আলোর রেখা ঝিলমিল করে উঠছে। ওদের জেরায় মেয়েটা প্রথমে হক্‌চকিয়ে গেল। না, বাপি তো বাড়ি নেই। ধোবিখানায় গেছে বুড়ী ব্রুলের কাছে। সেখান থেকে কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে ফিরবে। তারপরে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সবকিছুই বলে ফেললে। মুখে তার ধূর্তামির হাসি—সে বুঝি মা-বাপের উপর শোধ তুলতেই চায়। মঁসিয়ে দাঁসার আসতেই, মা তাকে বাইরে বার করে দিয়েছে। লিদি থাকলে ওদের কথায় বাগড়া দেয়। ভোর থেকে দুজন পুলিস নিয়ে ধাওড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে দাঁসার। কাজের লোক যোগাড়েরও চেষ্টা করছে। যারা দুর্বল তাদের কাছে ফলাও করে বলেছে,...ভোরোতে যদি সোমবারেও ওরা কাজে না নামে তাহলে বরিনেজ থেকে কোম্পানি কুলি ভাড়া করে আনবেন। রাত হতেই পুলিস দুজনকে বিদায় দিয়ে এসেছে পিয়েরোঁদের বাড়িতে। পিয়েরোঁ-বৌকে একা পেয়ে এখানেই আছে। আগুনের কুণ্ডের ধারে বসে এক পাত্র জিন খাচ্ছে আর ওর সঙ্গে খোশগল্প করছে।

চুপ, চুপ! কথা কোয়ো না! ওদের দেখা চাই, লেভাক ইতর হাসি হাসলে। তারপরে অন্য ব্যাপার। এই বৌ, তুই ঘরে যা!

লিদি কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ভাঙা শার্সির ফাঁকে লেভাক চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। চাপা স্বরে চীৎকার করে উঠছে, শিরদাঁড়ায় কম্পন।

লেভাক-বৌ এবার ফুটোয় চোখ রেখে দেখতে লাগল। কিন্তু সে এমন ভাব দেখালে যেন তার ফিক্ ব্যথা ধরেছে। মুখে বললে, ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মেয়ু তাকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল দেখতে। সে বললে, যা হোক দেখলাম বটে! টাকা দিয়েও এমনটি দেখা যায় না! আবার ফিরে ফিরতি দেখা শুরু হয়ে গেল। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে একজনের পর একজন যেন দেখছে ছায়া-বাজির খেলা। বসবার ঘরখানি ছিমছাম—ঝক্ঝকে তক্তকে। অগ্নি-কুণ্ডের আগুনে গরম। টেবিলে কেক থরে থরে সাজানো। বোতল আর ক'টা গেলাস আছে। একেবারে রীতিমত ভোজ। যা ব্যাপার চলছে, অন্য সময় হলে তাদের ছ'মাসের ঠাট্টা-তামাশার খোরাক জুটতো। কিন্তু এখন তো ওরা চটেই উঠল। মেয়েমানুষটা গলা অবধি সোহাগ খাচ্ছে, হাওয়ায় উড়ছে তার ঘাগরা—দেখে ভারি মজা লাগে। কিন্তু অমন তোফা আগুনের ধারে বসে অমন করতে বিরক্তি ধরে না। আবার তাকত বজায় রাখার জন্য খাচ্ছে বিস্কুট—আর ওরই সাঙাতদের সেই এক টুকরো রুটি—বা এক কণা কয়লার গুঁড়ো।

ঐ বাপি আসছে। লিদি বলেই ছুটে চলে গেল।

পিয়েরোঁ ধোবিখানা থেকে কাঁধে মোট বয়ে ফিরছে। শান্ত মানুষটি, মেয়ু তাকে গিয়ে ধরল।

দেখ, শুনলাম, তোমার বৌ নাকি কাকে বলেছে, আমি ক্যাথিকে বেচে দিয়েছি। তাছাড়া বাড়ির সবারই রোগ। তা সাঙাৎ শুনি, তোমার বৌকে অমন নাস্তানাবুদ করবার জন্য ঐ ভদ্দরলোকটি কত করে দেয়? এই তো, এখন তো নাকাল করে তুলেছে!

হঠাৎ শুনে, পিয়েরোঁ বুঝতে পারলে না; এমন সময় তার বৌ গলার স্বর শুনে ভয় পেয়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে দরজা ফাঁক করে সে দেখতে গেল—কি ব্যাপার। ওরা ওকে দেখতে পেল। বুক খোলা, ঘাগরা তোলা অবস্থা, লজ্জায় লাল হয়ে উঠল পিয়েরোঁ-বৌ আর পিছনে দাঁসার তো পাগলের মতো নিজের ট্রাউজার টেনে তুলছে। সর্দার তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। সে ভয় পেয়ে গেল। ম্যানেজারের কানে একথা উঠলে সর্বনাশ। অমনি পিছনে জোর চীৎকার উঠল। হাসি—বেড়াল ডাক আর অপমান।

পিয়েরোঁ-বৌকে লেভাক-বৌ বললে, তুই তো ছুঁড়ী সবাইকেই আস্তা-কুঁড় ভাবিস। তা ভাই তুই যে অমন ছিমছাম—কর্তারা তোর গা দলাই-মলাই করে দেয় বলেই তো।

লেভাক বলে উঠল, মুখ নেড়ে বলার মানুষ বটে! মাদী কুত্তা কোথাকার! বেবুশ্যে বলে কি না, পরিবার বাসাড়ে আর মোর সাথে শোয়—একজন থাকে ওপরে, আর একজন নীচে! তুই নাকি বলেছিস? শুনলাম তো তাই।

এরই মধ্যে পিয়েরোঁ-বৌ সামলে নিয়েছে। সে ঘৃণাভরে অপমান উপেক্ষা করছে। তার এ জ্ঞানটুকু আছে—যেমন সে আর সবার চেয়ে সুন্দরী, তেমনি ধনবতী।

যা বলেছি, বলেছি, এখন দূর হও! আমি কি করি না করি তাতে তোমাদের কি? সবারই মোর ওপর হিংসে। মোরা ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি জমাই

বলে সবাই ক্ষেপে আছে দেখ না! যাও-যাও! যা ইচ্ছে বল না, কিন্তু মোর সোয়ামী জানে কেনে সর্দার মোদের বাড়িতে এয়েছিল।

সত্যিই, এরই মধ্যে পিয়েরোঁ রেগে উঠে বৌয়ের হয়ে সাফাই গাইছে। বিবাদ এবার সুর বদলাল। ওরা অভিযোগ জানালে, পিয়েরোঁ এখন কোম্পানির কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছে। সে এখন পোষা কুত্তা, টাকার লোভে গোয়েন্দা বনে গেছে। সে চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকে, মালিকরা তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে ভালমন্দ জিনিস দেয়—আর তাই গিলে গিলে সে নাদাপেটা হয়ে উঠেছে। পিয়েরোঁও বার বার বললে, মেয়ু তার দরজার নীচ দিয়ে একখানা চিঠি গলিয়ে দিয়ে গেছে। সেই চিঠিতে আছে শাসানি। তাতে নাকি আড়াআড়ি করে দুখানা হাড় আর এক ভোজালীর ছবি আঁকা। তারপরে যা হয় তাই, মরদদের মধ্যে এবার লড়াই শুরু হয়ে গেল। মেয়েদের বিবাদ তো হামেশাই এমনি হয়। যেদিন থেকে আকাল লেগেছে, সেদিন থেকে যে মুখ ফুটে কথা কয় না, সেও খান্ডারনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়ু আর লেভাক পিয়েরোঁর দিকে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে গেল, তাদের কোন রকমে ছাড়িয়ে আনা হ'ল।

জামাইয়ের নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, এমন সময় বুড়ী বুল ফিরে এল ধোবি-খানা থেকে। ঘটনা শুনে সে শুধু বললে,

ঐ শুয়োরটা মোর মান-ইজ্জত রাখলে না!

পথঘাট আস্তে আস্তে জনশূন্য হয়ে এল। উলঙ্গ শুভ্রতায় জ্বলছে তুষার, তার উপরে ছায়ার দাগ পর্যন্ত নেই। ধাওড়া আবার মৃত্যুর নিস্পন্দ-তায় ফিরে গেল। এই দুরন্ত শীতে আবার বুভুক্ষার জ্বালায় জ্বলতে লাগল।

মেয়ু দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে, ডাক্তার এয়েছিল?

না, আসেনি। বৌ উত্তর দিলে। এখনো সে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাচ্চারা ফিরেছে।

না।

মেয়ুর আবার পদচারণা শুরু হয়ে গেল। এক দেয়াল থেকে আর-এক দেয়াল অবধি তার হুন্দা। যেন এক বিভ্রান্ত ষাঁড়। দাদু বনেমোর চেয়ারখানায় জবুথবু হয়ে বসে আছে। একবার মাথা তুলেও দেখলে না। আলঝিরও চুপচাপ। সে চেষ্টা করছে, যাতে না কাঁপে—বাপ-মাকে আর কষ্ট দিতে চায় না। শত কষ্টেও সাহস দেখাচ্ছে মেয়ে, তবু মাঝে মাঝে এমন কেঁপে উঠছে যে, ঐ চাদরের আড়াল থেকেও এই পঙ্গু মেয়েটার শীর্ণ দেহের কম্পন অনুভব করা যায়—বুঝি বা শোনা যায়। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। সেখানে এসে পড়েছে তুষারময় বাগানের ছায়া। সেই ছায়া জ্যোৎস্নার মতোই ঘরখানা আলো করে তুলেছে।

বাড়িখানি এখন মৃত্যু-মুহূর্তের যন্ত্রণায় বুঝি অধীর। একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। শূন্য বাড়ি; ঘোর দারিদ্র্য। গদির অড় চলে গেছে পশমের মতোই দোকানে। চাদর গেছে, তারপরে কাপড়-চোপড়—বিক্রি করা যায় হেন জিনিস আর নেই। সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো দাদুর একখানা রুমাল বেচে দু' সু নিয়ে এসেছে। এই দরিদ্র গৃহে প্রতি জিনিস বেচে দেবার সময়

ঝরছে চোখের জল, মা ঘাগরার তলায় সেই লাল পিজবোর্ডের বাক্সটা নিয়ে যাবার সময় কেঁদেছেন আরো বেশি। ওটা তার প্রেমিক একদিন দিয়েছিল। ওটা বেচে দেওয়া মানে তো নিজের সন্তানকে অন্যের দোরগোড়ায় ফেলে আসারই শামিল। এখন বাড়ি একেবারে শূন্য। নিজেদের গায়ের চামড়া ছাড়া বিক্রি করবার আর কিছু বাকি নেই। আর সে চামড়াও এমন যে তার জন্যে এক পয়সাও কেউ দেবে না। আর তল্লাশ করেও দেখে না ওরা। জানে যে, আর কিছুই নেই। সব কিছুই গেছে, চরমে এসে ঠেকেছে দশা। একখানা মোমবাতি যোগাড়েরও আশা নেই। এক কণা কয়লা, একটা আলুর আশাও দিলাশা মাত্র। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে। শুধু ছেলেমেয়েদের জন্যই যা দুঃখ। আর ভগবানের অন্যায়ে ওদের ক্রোধ—মেয়েটা যখন মরতই—কেন তাকে এমনি করে রোগে পেড়ে ফেললে বিধাতা!

মেয়ু-বৌ বললে, ঐ যে এতক্ষণে এল!

জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল কালো ছায়া। দরজা খোলা হ'ল। না, ডাঃ ভ্যান্দার হাগেন নন। নয়া পাদরী আবে রাঁভিয়াকে দেখে ওরা চিনলে। তিনি এমন মৃত্যুময় স্তব্ধতা দেখে অবাক হননি। আলো নেই, আগুন নেই, রুটি নেই দেখেও তাক্ লাগেনি। তিন-তিনটি বাড়ি ঘুরেই এসেছেন। পরিবার থেকে পরিবারে গেছেন, দাঁসার আর পুলিস দুটির মতোই লোক খুঁজতে বেরিয়েছেন। তবে কাজের লোক নয়, উপাসনার লোক। ধর্মোন্মাদনায় অধীর হয়ে পাদরী বলে উঠলেন,

বাছারা, গত রোববারে প্রার্থনায় যাওনি কেন? তোমরা ভুল করেছ, এখন গির্জাই তোমাদের একমাত্র বাঁচাতে পারে। বল, কথা দাও সামনের রোববার আসবে?

মেয়ু তার দিকে তাকিয়ে আবার পদচারণা শুরু করে দিলে। মুখে তার রা নেই।

মেয়ু-বৌ এবার জবাব দিলে—

কোথা যাব—পাত্থনায়? কেনে যাব? ভগমান কি মোদের নিয়ে তামাশা করছেনি। দেখ গো—দেখো! মোর বাচ্চা মেয়েটা ওই ভগমানের কি করেছিল—যার জন্যে থরথরানি জ্বাড় দিয়েছিল? মোদের কি দুঃখুর অভাব যে, এখুনি জ্বাড়ে ফেলে দিলে! এক পেয়ালা জাউ খাওয়াতে তো নারলাম রে!

পাদরী এবার কথা বললেন। প্রচারক যেমন করে বর্বর জাতির কাছে ধর্মের মহিমা ব্যাখ্যা করেন, তেমনি করে তিনি বলে গেলেন ধর্মঘট আর চরম দুর্দশার কথা। আর তারই ফলে যে বিদ্বেষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে তাও বাদ দিলেন না। গির্জা তো দরিদ্রেরই পক্ষে, তাদেরই সহায়। ধনীর এই অন্যায়ের উপর একদিন তো গির্জাই ভগবানের অভিশাপ ডেকে আনবে। তারপর ন্যায়ের হবে জয়। আর সেদিন তো আগতপ্রায়; কারণ ধনীরা এখন ঈশ্বরের আসনে গিয়ে বসেছে, তাঁকে ছাড়াই তারা শাসন করছে। তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু মজুরেরা যদি এই দুনিয়ায় তাদের প্রাপ্য অংশ পেতে চায়, তাহলে এখুনি পাদরীদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। যীশুর মৃত্যুর পর এমনি করেই তো গরীব আর অবহেলিতের দল যীশুর ধর্মপ্রচারকগণের চারপাশে এসে সমবেত হয়েছিল। যদি এই অগণিত শ্রমিকদের তাঁরা পান—কি অসীম শক্তিমান

হবেন তখন ধর্মগুরু পোপ, কি বিরাট-বাহিনী পাবেন প্রচারকের দল! এক সপ্তাহে সারা দুনিয়া থেকে তাঁরা দুষ্টদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন—ঐ অযোগ্য মালিকদের দেবেন তাড়িয়ে। তারপরেই দেখা দেবে প্রকৃত স্বর্গরাজ্য। গুণ অনুসারে সবাই পাবে পুরস্কার। আর শ্রমের বিধান হবে সর্বমানবের সুখের ভিত্তিভূমি।

তাঁর কথা শুনে মেয়ু-বৌয়ের মনে হ'ল এতিয়ের কথাই শুনছে। হেমন্তের সেই সন্ধ্যাগুলির কথা মনে পড়ল। তখন সে তো এই পাপ যেদিন শেষ হবে সেদিনের কথাই বলত। শুধু তফাৎ এই, পাদরীদের সে কখনো বিশ্বাস করে না।

বললে, আপনি যা বললে, খুব সাচ্চা কথা। কিন্তু এর মানে তো এই আপনার সঙ্গে ঐ বড় মানুষদের ঝগড়া লেগেছে। সব পাদরীবাবারাই তো ম্যানেজারের কুঠিতে খানাপিনা করত, আর মোরা রুটি মাঙলে অমনি জাহান্নমের আগুনের ভয় দেখাত।

পাদরী আবার গির্জা আর জনগণের মধ্যে এই শোচনীয় সম্বন্ধের কথা বলতে লাগলেন। কথার মারপ্যাঁচে তিনি শহুরে পাদরীদের উপর আক্রমণ চালালেন। প্রধান ধর্মযাজক, হোমরা-চোমরা উপরওয়ালা তাঁরা, থাকেন আলস্যে-বিলাসে; ক্ষমতামদে মত্ত অন্ধ বলেই তাঁরা উদার ধনীদের হরিহর আত্মা হয়ে ওঠেন। একবারও ভাবেন না যে, এই ধনী সম্প্রদায়ই তাঁদের পৃথিবীর সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এই অবস্থা থেকে একমাত্র মুক্তি দিতে পারেন গ্রাম্য ধর্মযাজকের দল। তাঁরা এক হয়ে জেগে উঠে ধরাতলে নামাবেন যীশুর রাজ্য। দারিদ্র্য হবে তাদের সহায়। তিনি নিজেকে যেন তাদের পুরোধা বলেই ঠাউরে নিলেন। হাড়সার দেহখানি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। যেন এক দলপতি। ভগবানের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত বিপ্লবী। চোখে আগুন জ্বলে উঠল, আর সেই আগুনে আলো হয়ে উঠল অন্ধকার ঘর। তাঁর বাণী উৎসাহে আশায় ভরা—আর তারই অনুপ্রেরণায় তিনি কোন আলোকপন্থার শিখরে চলে গেছেন। বেচারী মজুরদের কাছে বহুক্ষণ হ'ল তিনি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন।

মেয়ু হঠাৎ বলে উঠল, অতো কথায় মোদের কি কাম! আপনি যদি এর চেয়ে একখানা রুটি নিয়ে আসতেন তাহলে মোদের ভালই হোত।

পাদরী বলে উঠলেন, রোববারে প্রার্থনায় এস। ঈশ্বর তোমাদের সব কিছু দেবেন।

এবার চললেন লেভাকদের দীক্ষা দিতে। গির্জার চূড়ান্ত বিজয়ের স্বপ্নে তিনি বিভোর, তাই বাস্তবের প্রতি তাঁর ঘৃণা। তিনি এমনি করেই ধাওড়ার ঘরে ঘরে যাবেন। দাক্ষিণ্য করবেন না, শুধু হাতে এই বুভুক্ষায় মুমূর্ষু বাহিনীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে গির্জার বিজয়ের বাণী ছড়াবেন—এই তাঁর সাধ। বেচারী! দুঃখ-দুর্দশাকে তিনি মুক্তিরই অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন।

মেয়ুর পদচারণা আবার শুরু হয়ে গেল। শুধু শোনা যাচ্ছে নিয়মিত পায়ের শব্দ। মেঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। জং-ধরা কপিকলের মত একটা আওয়াজ উঠল, বুড়ো বনেমোর শূন্য অগ্নিকুণ্ডে গয়ার ফেললে। আলঝির

জ্বরের ঘোরে অচেতন। প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। হাসছে সে; ভাবছে রোদে খেলা করছে।

মেয়ের গালে হাত রেখে মেয়ু-বৌ চেঁচিয়ে উঠল, হারে কপাল, মেয়ের গায়ে যেন আগুন জ্বলছে! আর সেই হারামটার জন্যি বসে থেকে কি হবে। বাজি রাখতে পারি, ঐ জানোয়ারগুলো তাকে আসতে বারণ করেছে।

ডাক্তার আর কোম্পানিকে উদ্দেশ্য করেই সে বললে। তবু, দরজা আর একবার খুলে যেতেই আনন্দে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু হাত নেমে এল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মেয়ু-বৌ। মুখ গম্ভীর।

সেলাম। এতিয়েং দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল। সন্ধ্যা হবার পর ও প্রায়ই এমনি আসে। দ্বিতীয় দিনেই মেয়ুরা ওর গোপন ডেরার কথা জেনে ফেলে। কিন্তু কথাটা নিজেদের মধ্যেই গোপন রেখেছে। সারা ধাওড়ায় আর কেউ জানে না ছোকরার কি হয়েছে। এতে ওকে ঘিরে নানা গল্প রটছে। মানুষ এখনো ওকে বিশ্বাস করে, আর তাই রহস্যময় গুজবটাও ছড়িয়ে পড়েছে। কি গুজব? সে নাকি একটা গোটা পল্টন আর সিন্দুক ভর্তি সোনা নিয়ে এসে হাজির হবে। সব সময়েই অঘটন ঘটবার আশায় ওরা উন্মুখ। ধর্মোন্মাদনায় ওদের এ দশা করেছে। এমনি করে ওদের আদর্শ ফলবতী হয়—সে আসবে, সে তার প্রতিশ্রুত ন্যায়ের নগরীতে ওদের হঠাৎ নিয়ে যাবে। কেউ বা বলে, মার্সিয়েনের সড়কে ওকে তিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কে নাকি গাড়িতে দেখেছে। ও শুয়ে ছিল তখন। কেউ বা হলফ করে বলে, ও ক'দিনের জন্য ইংলন্ড সফরে গেছে। অবশেষে সন্দেহ-সংশয় এসে দেখা দিল। রঙ্গপ্রিয় যারা তারা বললে, ও নিশ্চয়ই কোথাও কোন তয়খানায় লুকিয়ে আছে। আর মোকে-ছুঁড়ি ওকে চাঙ্গা করে রাখছে গায়ের গরমে। ওর মোকে-ছুঁড়ির সঙ্গে ভাবের কথা জানাজানি হয়ে গেছে এখন, আর তাতে তার কোন উপকারই হয়নি। ওর জনপ্রিয়তায় চিড় খেয়ে গেছে। বিশ্বস্ত যারা তারাও এখন হতাশ হয়ে পড়ছে। আর দিন দিন বাড়ছে তাদের সংখ্যা।

সে বললে, কি বিশ্রী দিন দেখেছো! তোমাদের হাল কি—নতুন কিছুই নয় এ—খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে? খবর পেলাম, আমাদের খুদে নিগ্রেল নাকি বেলজিয়ামে গেছে কুলি আনতে। হা ভগবান। তা যদি হয় তো আমরা মলাম!

এই অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকেই সে কেঁপে উঠল। অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে সেই হতভাগ্যদের দেখতে পেলে। শুধু ঘন ছায়া দেখেই মালুম হয়, ওরা আছে। আবার এল বিতৃষ্ণা, এল অপ্রতিভতা। যে মজুর তার নিজের শ্রেণী থেকে উঠে এসেছে, যার পড়াশুনো আছে, যার আকাঙ্ক্ষা আছে—তার তো হবেই।

উঃ—এ কি হাল! কি বদবু ছাড়ছে! সমস্ত দেহগুলো যেন স্তূপের মতো একটার উপরে একটা পড়ে আছে। এই চরম দুর্দশা দেখে গলায় যেন স্ফীতি ঘনিয়ে এল। রুদ্ধ হয়ে এসেছে স্বর—কণ্ঠনালী। ভাষা যোগাচ্ছে না—ওদের যে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেবে তাও পারছে না।

মেয়ু চীৎকার করে তার কাছে ছুটে এল।

কুলি আসছে! না—না বেটারা সাহস পাবে না। ওদের যদি পিটকে পিট ছারখার করে দেবার ইচ্ছে না থাকে, ওরা বেলজিয়ামের কুলিদের নামাবে না।

এতিয়েঁ কুণ্ঠিত হয়ে জানালে, তাদের কিছু করবার উপায় নেই। সিপাহীরা পিট রক্ষা করছে, তারাই বেলজিয়ামের কুলিদের নামাবার পথ খালাস করে দেবে।

কিন্তু, মেয়ু ঘুষি বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। পিঠের উপর সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে সিপাহীর দল বলেই ওর রাগ। তাহলে মজুররা আর তাদের নিজেদের মালিক নয়? এখন তারা কয়েদীর শামিল—গুলী-ভর্তি বন্দুকের ভয়ে ওরা মেহনত করবে? মেয়ু তো তার পিটকে ভালবাসে। দুমাস পিটে নামেনি বলে তার খুবই দুঃখ। এই অপমানে সে ক্ষেপে উঠল। ওরা কতগুলো বিদেশীকে এনে বদলী নামাবে? তার পরেই মনে পড়ল, তার কার্ড তাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। কথা গলায় আটকে গেল। বিড়বিড় করে বললে মেয়ু, কেন যে রাগি জানি। এখন তো আমি কেউ নই। ওরা যখন খেদিয়ে দিলে, এবার তো সড়কে পড়ে মরে থাকব।

এতিয়েঁ বললে, সে-কথা যদি বল, ওরা কালই কার্ড ফেরত নিতে রাজি। পাকা মজুরকে কে আর তাড়াতে চায়?

নিজেই কথা থামিয়ে দিলে। আলঝির জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, মৃদু হাসছে; শুনে অবাক হয়ে গেছে এতিয়েঁ। এতক্ষণ অবধি দাদু বনেমোরের অচল ছায়াই সে দেখতে পেয়েছে। এবার এই রুগ্ন শিশুর আনন্দ দেখে সে ভয় পেলে। যদি শিশুরা মারা যায়, তাহলে তো সত্যই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দাঁড়াবে। তাই সে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিলে। কম্পিত স্বরে বললে,

শোন। এমনিধারা আর চলতে পারে না! আমরা ফৌত্ হয়ে গেছি। এবার ধর্মঘট শেষ করে দিতে হবে।

এতক্ষণ অবধি মেয়ু-বৌ চুপ করে ছিল। হঠাৎ সে ফেটে পড়ল, মরদের মতোই গাল পাড়তে লাগল, কি বললে? হা ভগমান, শেষে তুমিই এ-কথা বললে!

যুক্তি দেখাতে গেল এতিয়েঁ, কিন্তু মেয়ু-বৌ তাকে কথা বলতে দিলে না, ভগমানের দোহাই, অমন কথাটি বোলোনি। আমি যে মেয়েছেলে, আমিই তোমার মুখে থাবড়া কষিয়ে দেব। দু'মাস ধরে ধুঁকে ধুঁকে মরনু, ঘরবাড়িতে যা কিছু ছেল, বেচে সারা হয়ে গেনু—মোর কাচ্চা-বাচ্চারা রোগে পড়ল—আর কোন ফায়দা হবেনি? আবার কি সেই আগের মত জোর জুলুম মোদের উপর চলবে!

জান, ওকথা যখন ভাবি, মোর লো থমকে যায়। মূচ্ছা যাই আর কি। না, না, তা হবেনি! সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেব, সবাইকে খুন করব, তবু ধর্মঘট ছাড়বনি!

অন্ধকারে মেয়ুর দিকে দেখিয়ে দিলে। তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট, কিন্তু হুমকি বজায় আছে।

শোন গো বেটা ছেলে! মোর মরদ যদি পিটে নামতি যায় তো, সড়কে

দাঁড়িয়ে থাকব ওর জন্য—তারপর মুখে থুথু ফেলে দেবনি, ভীতুয়া বলে চেঁচিয়ে উঠবনি!

এতিয়েং ওকে দেখতে পেলে না, কিন্তু ঘেয়ো কুকুরের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করলে। সে এই উত্তেজনা দেখে অবাক হয়ে পিছিয়ে এল। এ তো তারই সৃষ্টি—হাতে গড়া।

মেয়ু-বৌ একেবারে বদলে গেছে—আলাদা স্ত্রীলোক বলেই মনে হয়। এক-সময়ে ও ছিল বড় বুঝদার মেয়েমানুষ। ওকে ওর উগ্রপন্থার জন্য কত দুষতো—বলত কারো মরণ চাইতে নেই। এখন তো ও আর যুক্তি শুনতে চায় না, মানুষ খুন করার কথা বলে। তার বদলে মেয়ু-বৌ-ই রাজনীতির বুলি আওড়াচ্ছে—এক আঘাতে ধনিক শ্রেণীকে লুপ্ত করে দিতে চাইছে। তার দাবি গণরাষ্ট্র আর গিলোটিন। এই যে উপবাসী জনগণের শ্রমে মেদবহুল ধনী দস্যুর দল, দুনিয়াকে এদের ভারমুক্ত করে দেবে।

ওদের টুঁটি টিপে মারব। অনেক তো হ'ল—আর কেন? এবার মোদের পালা, তুমি তো ঐ কথাই বলতে সাঙাৎ। যখন ভাবি, বাপ-ঠাকুর্দা, তার বাপ—আগে যারা ছিল তারাই সয়েছে, মোরাও সইছি—আবার মোদের বেটারা—আবার তাদের বেটারাও সইবে—তখন তো ক্ষেপে যাইগো—ক্ষেপে যাই—ছোরা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে মন চায়।...সেদিন তো কিচ্ছুটি করা হ'লনি—ঐ মঁতসু শহর পাপের থান—ঐ পাপের থানকে ভুঁয়ে চষে দিতি পাল্লে ঠিক হোত। এক-খানা ইঁটও যদি না রাখতাম বেশ হোত। জান, মোর এক দুঃখ—বুড়ো পিয়েলোঁদের ছুঁড়ীটাকে বাগে পেয়েছিল, মোরা তাকে ছাড়িয়ে আনলাম কেনে! ওরা তো মোর কাচ্চা-বাচ্চাদের উপর ভুখা-দানোকে লেলিয়ে দিচ্ছে—তার মোরা কি কচ্চি!

অন্ধকারে কুঠারের আঘাতের মত কথা ঝরে পড়ছে। বদ্ধ দিগন্ত তার কাছে আর উন্মুক্ত হবে না। ওর মগজ তো দুঃখে পিষে গেছে—তারই গভীরে ব্যর্থ আদর্শ এখন বিষে রূপান্তরিত।

এতিয়েং হার মানল। কোনরকমে বললে, তুমি ভুল বুঝেছ বৌ, কোম্পানির সাথে মোদের একটা সমঝোতা হওয়া চাই। পিটগুলোর হাল খুব খারাপ, তাই মনে হয় কোম্পানি হয়তো একটা সমঝোতা করতে রাজী হয়ে যাবে।

না, কখ্খনো না! চেঁচিয়ে উঠল মেয়ু-বৌ।

এমন সময় লেনোর আর আঁরি ফিরে এল খালি হাতে। এক ভদ্রলোক দুটো পয়সা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মেয়েটা ছোট ভাইটাকে লাথি মারতে শুরু করলে, পয়সা দুটো তুষারের ভিতরে হারিয়ে গেছে। জাঁলিনও তল্লাশিতে যোগ দেয়, তাই বোধহয় পয়সার আর পাত্তা মেলেনি।

জাঁলিন কোথায়?

মা, কোথা চলে গেল। বললে, কাম আছে।

এতিয়েং বেদনা-বিহ্বল। সবই শুনলে। একদিন ছিল, কারো কাছে ছেলেমেয়েরা হাত পাতলে, মেয়ু-বৌ ওদের খুন করবে বলে শাসাত। এখন সে নিজেই ওদের পাঠায় ভিক্ষায়। তার প্রস্তাব—মঁতসুর দশহাজার কুলি লাঠি আর ঝুলি নিয়ে সাবেক কালের ভিখারীদের মত বেরিয়ে পড়ুক। এই ভীত সন্ত্রস্ত অঞ্চল তারা চষে চষে বেড়াক।

অন্ধকার ঘরে উদ্বেগ আরো বেড়ে উঠল। ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরে এসেছে, তারা খাবার চায়। খাবার কেন তারা পাবে না? গজর-গজর করছে, কাঁদছে। এদিক-ওদিক গড়াগড়ি দিচ্ছে—মুমূর্ষু বোনের পা মাড়িয়ে দিলে। গোঙানি উঠল।

মা এলোপাথাড়ি ওদের কানে থাবড়া কষিয়ে দিলে। এখন ওদের কান্না উচ্চগ্রামে উঠেছে। চীৎকার করে চাইছে খাবার। হঠাৎ ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললে মা, মেঝেয় বসে পড়ে ওদের সবাইকে জড়িয়ে ধরে রইল বহুক্ষণ। পঙ্গু মুমূর্ষু শিশুটিও বাদ গেল না। জল ঝরছে—স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া। অবসন্ন, ক্লান্ত শরীর—বার বার একই কথা বলছে—মৃত্যুকে ডাকছে।

হেই ভগমান! মোদের নাও না কেনে? হেই ভগমান! দয়া করে নাও, মোদের সব চুকে-বুকে যাক গো!

বুড়ো দাদু এখনো তেমনি নিস্পন্দ, এক বুড়ো গাছ যেন শিকড় চালিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়বাদলে বার-বার বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে। আর বাপ এখনো পায়চারি করছে। অগ্নিকুন্ড থেকে আলমারি অবধি তার হুদ্দা। একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না।

দরজা আবার খুলে গেল। এবার সত্যই ডাক্তার ভান্দারহাগেন এলেন।

বললেন, শয়তানে নিক তোমাদের! মোমের আলোয় চোখের নজর যাবে না...জলদি কর, আমার অনেক কাজ।

গজর-গজর করা তাঁর স্বভাব। মেহনত তাঁর বেশিই হয় তাই নালিশের অন্ত নেই। বরাত ভাল, তাঁর কাছে দেশলাইয়ের ক'টা কাঠি ছিল। বাপ পর পর ছ'টা কাঠি জেবলে ধরল, ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করলেন। রোগীর গায়ের চাদর খুলে নেওয়া হ'ল। কম্পমান আলোয় দেখা গেল সে থর থর করে কাঁপছে। যেন তুষারে মৃতপ্রায় ছোট একটি পাখী সে। হাড়জিরজিরে শরীর —শুধু দেখা যায় ওর উঁচু কুঁজটা। তার মুখে এখনো হাসি—মুমূর্ষুর অস্পষ্ট হাসি। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে। খুদে হাত দুখানি দিয়ে ফাঁপা বুকখানি চেপে আছে।

দুঃখভারে বিবশ মা। সে শুধু জিজ্ঞেস করছে, এই যে মেয়ে—যে একা ঘরগৃহস্থালীর কাজ করত, এমন যার বুদ্ধি—এমন নম্র যার স্বভাব— তাকে কি মার কোল থেকে ঈশ্বর ছিনিয়ে নেবেন? ডাক্তার অসহিষ্ণু হয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন,

ও তো মারা গেছে! তোমার অমন মেয়ে উপোসে উপোসে অক্কা পেয়েছে! আর এতো আর একটি নয়, এইমাত্র আর-একটিকে দেখে এলাম। তোমরা সবাই তো আমাকে ডেকে পাঠাও, কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না। মাংসই তোমাদের দাওয়াই। ওতেই আরাম হবে।

মেয়ুর হাতে ছেঁকা লাগছে, সে কাঠিটা ফেলে দিলে। ক্ষুদ্র শবদেহ ঘিরে নেমে এল ঘন অন্ধকার। এখনো দেহ উষ্ণ আছে। ডাক্তার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। এতিয়েঁ সেই অন্ধকার ঘরে মেয়ু-বৌয়ের ফোঁপানি কান্না ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলে না। মৃত্যু-কামনা বার বার করছে মেয়ু-বৌ। অবিরাম কান্না ঝরে পড়ছে।

হেই ভগমান, এবার তো মোদের পালা। নাও, মোকে নাও? মোর মরদকে নাও, মোদের সব্বাইকে নাও! দোহাই তোমার, সব শেষ করে দাও!

তিন

রোববার। অটটা থেকে স্যুভেরিন একা আঁভাতাসের পানশালায় বসে আছে তার নিজের জায়গাটিতে। দেয়ালে ঠেস-দেওয়া তার মাথাটা। এখন আর এমন মজুর নেই যে বীয়ার খাবার জন্য দুটো পয়সা বার করতে পারে। বারেও এত কম লোকের আমদানী আর কখনো হয়নি। রাসেনার-গিন্নী কাউন্টারে অচল-অটল হয়ে বসে আছে। বিরক্তিকর নিস্তব্ধতায় মুখখানি বিকৃত। রাসেনার লোহার উনুনটার সামনে দাঁড়িয়ে—কয়লার ধূসর ধোঁয়া বুঝি এক মনে দেখছে।

এই প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত কক্ষের নিস্তব্ধতায় হঠাৎ শার্সিতে তিনবার টোকা পড়ল। স্যুভেরিন ফিরে তাকাল। সে উঠে পড়ল। সংকেত সে চেনে। এতিয়েঁ তাকে ডাকতে এসে কয়েকবার এমনি সংকেতই করেছে। বাইরে থেকে সে দেখে নিয়েছে, স্যুভেরিন শূন্য টেবিলে একা একা বসে সিগারেট ফুঁকছে। স্যুভেরিন দরজার কাছে যেতে-না-যেতেই রাসেনার দরজা খুলে দিলে। জানালা দিয়ে এসে পড়েছে আলো, সেই আলোয় সে মানুষটিকে চিনতে পেরে বলে উঠল,

তোমাকে ধরিয়ে দেব বলে ভয় পাচ্ছ নাকি সাঙাৎ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ভিতরে এসে অনেক ভাল করে কথা কইতে পারবে।

এতিয়েঁ ঢুকে পড়ল। রাসেনার-গিন্নী ভদ্রতা করে এক গেলাস মদ দিতে চাইল।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল এতিয়েঁ। সরাইখানার মালিক এবার বললে,

তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ, বহুদিন থেকেই জানি।

তোমার পেয়ারের দোস্ত্‌রা তো বলে আমি নাকি টিকটিকি। যদি তা হতাম, তাহলে এক হপ্তা আগেই তোমার উপর পুলিস লেলিয়ে দিতাম।

যুবক উত্তর দিলে, তোমাকে নিজের সাফাই গাইতে হবে না। তুমি যে টিকটিকিগিরি করে রুজি রোজগার কখনো করনি তা আমি জানি। মানুষের মতের অমিল থাকতে পারে, তাই বলে একে অন্যকে মানবে না এমন তো কথা নেই।

আবার নিস্তব্ধতা। স্যুভেরিন ফিরে গেছে তার চেয়ারে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে, সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তার তন্ময় দৃষ্টি, কিন্তু অস্থির আঙুলগুলো নড়ছে, হাঁটুর উপর দিয়ে বুলিয়ে যাচ্ছে, চাইছে পোল্যাণ্ডের উষ্ণ রোমের স্পর্শ। আজ কিন্তু সে গরহাজির। এ এক অবচেতন মনের অস্বস্তি—কিসের যেন অভাব—কি যেন চাহিদা মিটছে না—সে নিজেও এর জবাব দিতে পারে না।

এতিয়েঁ টেবিলের উলটো দিকে বসে পড়ে বললে,

কাল থেকে ভোরোতে কাজ শুরু হবে। খুদে নিগ্রেল-টার সঙ্গে বেল-জিয়ামের কুলিরা এসে গেছে।

রাসেনার দাঁড়িয়ে ছিল, সে অস্ফুট স্বরে বললে, হ্যাঁ, কাল রাতে ওরা এসে নেমেছে। ওরা নিজেদের ভিতর খুনোখুনি না হাওয়া অবধি এখানে টিকে থাকবে।

এবার গলা চড়িয়ে বললে,

না, না, আমি আর পুরানো ঝগড়া ফিরে-ফিরতি শুরু করতে চাই না। কিন্তু তোমরা যদি ধর্মঘট চালু রাখ, তাহলে খারাপই হবে। তোমাদের আর আন্তর্জাতিকের হাল-হালৎ এক। পরশু প্লুচার্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি কাজে গিয়েছিলাম লিল্-এ, সেখানেই দেখা হ'ল। মনে হ'ল তার জারি-জুরি সব শেষ।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে বসল রাসেনার। প্রচারের আতসবাজি ছুঁড়ে, ছড়িয়ে এই সংঘ দুনিয়ার মজুরদের জয় করে নিয়েছিল। ধনীশ্রেণী তো তখন ভয়ে থরো-থরো। এখন তো অন্তর্বিরোধ হতে বসেছে। সেখানে জয়লাভ করেছে সন্ত্রাসবাদীর দল, তারাই এখন তার নিয়ন্তা। সাবেক আমলের ক্রমিক প্রগতিওয়ালাদের তারা দূর করে দিয়েছে। ভাঙন ধরেছে চারিদিকে। প্রথমে যে লক্ষ্য ছিল তা আর নেই—বেতন-ব্যবস্থার সংস্কার এখন দলগত বিরোধে হারিয়ে গেছে, বিজ্ঞানসম্মত প্রাকার এখন শৃঙ্খলার অভাবে ধসে পড়ছে। এরই মধ্যে এই গণঅভ্যুত্থানের ফলাফলও বোঝা যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, সে বুঝি পুরানো পচাগলা সমাজ-ব্যবস্থাকে লোপ করে দেবে, কিন্তু এখন আর সে-আশা নেই।

রাসেনার বলে চলল, প্লুচার্ত তো ভাবনায় অস্থির। যদিও তার কোন হাত নেই, তবুও সে একথা বলে, প্যারীও যেতে চায়। তিন-তিনবার বলেছে, আমাদের ধর্মটের দফা রফা হয়ে গেছে।

এতিয়েঁ চোখ নীচু করে আছে। সে বাধা দিলে না ওর কথায়। গতকাল রাতে সে কয়েকজন সাথীর সঙ্গে আলাপ করেছে। তাদের ভিতরে আঁচ করেছে তিক্ততা আর সন্দেহ-সংশয়। পরাজয়ের আগে যে অপযশ দেখা দেয়, এ তারই শুরু। সে মুখ গোমড়া করে বসে রইল। লোকটাই একদিন বলে-ছিল তার পালাও একদিন আসবে। জনতা তাকে ভুলের জন্য দুষো দেবে।

সে বললে, হাঁ, ধর্মঘটের দফা হয়ে গেছে। প্লুচার্তের মত আমিও সেকথা জানি। আমরা আগেই তা ভেবে রেখেছিলাম। ইচ্ছে ছিল না, তবুও ধর্মঘট করতে হ'ল, কোম্পানিকে একেবারে ফৌত করে দেব এমন কথাও ভাবিনি সাঙাৎ।...তবে হিড়িকে মাথা ঘুলিয়ে যায়, তখন অনেক কিছুই মানুষ আশা করে। আবার খারাপি হলে, তখন মনে হয় এমনটি তো ভাবিনি। তখন কাঁদে আর তকরার করে, ভগবানকে মানুষ দোষ দেয়। যেন কত বড় সর্বনাশটা আকাশ ভেঙে মাথায় পড়ল।

রাসেনার শুধালে, তাই যদি ভেবে থাক, তাহলে সাঙাৎদের সলা-পরামর্শ দাও না কেনে—ওদের বোঝাও না কেনে?

শোন, এসব কথা ঢের হয়েছে। তোমার মত তোমার কাছে, আমার মত আমার কাছে। আমি তোমার কাছে আমাদের মতের অমিল থাকলেও ছুটে

এসেছি—তার কারণ তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে; তবে এখনো আমার ধারণা, আমরা যদি ধর্মঘট করে গোরেও যাই, আমাদের উপোসী কঙ্কালটা মানুষের আজাদীর জন্য যা করবে—তোমার ঐ কাণ্ডজ্ঞানে ভরতি রাজনীতির মামুলী বুলি তা করতে পারবে না। হা ঈশ্বর, যদি একটা সিপাই আমার বুকে গুলী দেগে দিত, তাহলে তো বাঁচতাম!

চোখ তার ভেজা। চীৎকারে পরাজিতের গোপন কামনা। সেইখানেই সে আশ্রয় নিয়ে চিরকালের জন্য তার বেদনা সমর্পণ করে বসে থাকবে।

বেশ বললে গো কথাটা! রাসেনার-গিন্নী স্বামীর দিকে তাকাল। ঘৃণা-ভরা তার দৃষ্টি। নিজের বিদ্রোহী মতবাদে সে দৃষ্টি আরো তীব্র।

সুভেরিনের তেমনি আনমনা দৃষ্টি, অস্থির হাতে সে কি যেন অনুভব করতে চাইছে, শুনেও শুনলে না কথা। তার কমনীয় মেয়েলী মুখখানা—সরু নাক আর ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দাঁত। কিন্তু সে-মুখ যেন এখন এক রক্তাপ্লুত দৃশ্যের রহস্যময় স্বপ্নে ভরা—মনে হয় বর্বরতা সেখানে জেগে জেগে উঠছে। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে রাসেনার আলাপ-আলোচনায় মন্তব্য করতেই সে সোচ্চার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল।

ওরা সবাই ভীরু। ওদের মধ্যে একজন শুধু আছেন, যিনি এই যন্ত্রটাকে ধ্বংসের ভয়ংকর অস্ত্রে পরিণত করতে পারেন। এতে চাই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। ওদের আর কারো তো তা নেই। তাই বিপ্লব আবার ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বিরক্তিভরে সে বলতে লাগল মানুষের অক্ষমতার কথা। এ-যেন কথা নয়, বিলাপ। যেন নিশায়-পাওয়া মানুষের গোপন কথার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে বলেই অপর দুজনের মনে হ'ল। নিশাগ্রস্ত মানুষ তার গোপন কথা বলে চলেছে রাত্রির ছায়া-ঘন অন্ধকারকে। তারা বিব্রত হয়ে পড়ল। সুভেরিনের কথা থামে না। রাশিয়ার খারাপ খবর, সব কিছুই সেখানে বিকল। সে তো খবর পেয়ে হতাশ হয়ে গেছে। তার সাবেক আমলের সাথীরা এখন রাজনীতি চর্চায় মত্ত। যে-সব বিখ্যাত নিহিলিস্ট একদিন ইউরোপ কাঁপিয়ে তুলেছিলেন —যাঁরা ছিলেন গাঁয়ের পাদরীর ছেলে, নয় তো মধ্যবিত্ত ঘরের বা দোকানীর সন্তান—তাঁরাই এখন আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বাইরে সাহস করে যেতে চান না। তাঁরা বোধহয় ভাবছেন, নিজের দেশের অত্যাচারী শাসককে খুন করতে পারলেই বুঝি আসবে দুনিয়ার মুক্তি। সে যখনই তাঁদের কাছে সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংসের কথা বলতে গেছে—পাকা ফসলের মতোই নিড়িয়ে নেবার কথা তুলেছে—এমন কি শিশুসুলভ 'লোকরাষ্ট্র' কথাটা উচ্চারণ করছে—তখনি তার মনে হয়েছে তাঁরা তাকে ভুল বুঝেছেন, তাঁদের কাছে সে বিপজ্জনক ব্যক্তি, শ্রেণীচ্যুত—বিশ্ববিপ্লবের হৃতগৌরব নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু দেশপ্রেমে ভরা বুকখানি নিয়ে সে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আজ সে-কথার পুনরাবৃত্তি করতেও সে ব্যথা পায়।

নির্বুদ্ধিতা! ওরা তো নির্বুদ্ধিতা দিয়ে এর থেকে রেহাই পাবে না।

তারপরে গলা আরো খাদে নামিয়ে তার সেই সাবেক বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্নের কথা বলতে লাগল। কথায় তার তিক্ততা। সে তার পদমর্যাদা আর সৌভাগ্য ছেড়ে এসেছে; মজুরদের মধ্যে কাজ করছে। এইসব কিসের আশায়? সে তো এক নয়া সমাজ-ব্যবস্থা দেখতে চায়—সে হবে সকলের শ্রমে-গড়া সমাজ-

ব্যবস্থা। তার পকেটের সব পয়সা যায় ধাওড়ার ছেলেমেয়েদের বিলিয়ে দিতে। মজুরদের সঙ্গে ভাই-বেরাদারি তার ভাব, ওদের সন্দেহ-সংশয়ে সে হাসে। তার মজুরের মতো ব্যবহারে সকলকে জিনে নিয়েছে। তা ছাড়া গল্প-গুজবও সে ভাল বাসে না। কিন্তু তবু যেন তার সঙ্গে তারা মিশ খায়নি। সে যেন এখনো ভিনদেশী। মানুষের যত রকম বন্ধন আছে সব কিছুর প্রতিই তার ঘৃণা, তাছাড়া তুচ্ছ অহংকার আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকেও সে দূরে থাকতে চায়। আজ সকালে কাগজে একটা ঘটনা পড়ে সে আরো রেগে আছে।

স্বর তার বদলে গেল, চোখ উজ্জ্বল। এতিয়েঁর দিকে তাকিয়ে তাকেই বললে,

এখন বুঝেছ তো? মার্সাইয়ের টুপীর কারখানার কারিগররা এক লক্ষ ফ্রাঁর মত লটারি খেলায় জিতে তখনি সেটা ব্যবসায় খাটিয়েছে। তারা জাহির করেছে, আর মেহনত না করে তারা জীবন কাটাবে। হাঁ, তোমরা ফরাসী মজুর—এই-ই তোমাদের সকলের কামনা। তোমরা চাও ধনদৌলত মাটি খুঁড়ে পেয়ে তারপরে কোথাও বসে নিজেরা আলসে-বিলাসে ভোগ করতে। ধনীদের বিরুদ্ধে তোমরা যত খুশি চেঁচাতে পার, কিন্তু বরাতক্রমে টাকা পেয়ে তা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাও না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃস্ব না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুখী তোমরা হতে পারবে না। বুর্জোয়াদের প্রতি তোমাদের বিরাগ কেন জান, তোমরা নিজেরাই বুর্জোয়া বনে যেতে চাও। তাই তোমাদের অতো রাগ।

রাসেনার হেসে উঠল। মার্সাই-এর দুজন কারিগর তাদের মোটা টাকা বিলিয়ে দেবে, একথাই ওর কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু সুভেরিনের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। রং বদলাল মুখের, ভয়ংকর হয়ে উঠল মুখের চেহারা। এ যেন সেই ধর্মোন্মাদনা দেখা দিয়েছে, যার ফলে জাতির পর জাতি লোপ পায়। সে চীৎকার করে উঠলঃ—

তোমাদের দলে-পিষে দেবে, ছুঁড়ে ফেলবে। গোবর-গাদায় তোমরা গিয়ে ঠাঁই নেবে। একজন আসবে, সে তোমাদের এই ভীরু আর আমুদে জাতটাকে ধ্বংস করে দেবে। এদিকে তাকাও! আমার হাত দুখানা দেখছ! আমার হাত দুটো যদি তেমন সবল হোত, এই হাতে এমনি করে আমি এই গোটা দুনিয়াটাকে তুলে নিতাম—তারপরে এমন জোরে নাড়া দিতাম যাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়—আর তোমরা সেই ভাঙাচোরা স্তূপে চাপা পড়ে মর।

ঠিক বলেছ! রাসেনার-গিন্নী বলে উঠল। কথা তার মোলায়েম, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস সেখানে আছে।

আবার নীরবতা। এতিয়েঁ আবার বরিনেজের কুলিদের কথা পাড়ল। ভোরোতে কি ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে। কিন্তু সুভেরিন এখনো ভাবে-বিভোর, সে তেমন কিছু বললে না। সে শুধু জানে পিট-রক্ষী সিপাহীদের ভিতরে কার্তুজ বিলি করা হয়েছে। অস্থির আঙুলগুলো হাঁটুর উপর দিয়ে চলেছে, বাড়ছে তাদের গতিবেগ। অবশেষে তার চৈতন্য হ'ল—কিসের যেন অভাব। সেই পোষা খরগোশটার নরম, মোলায়েম লোম তার চাই।

পোল্যান্ড কোথায় গেল? সে শুধালে।

সরাইখানার মালিক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল। কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রী নীরবতা জমে উঠল। এবার সে মনস্থির করে ফেললে।

পোল্যান্ড এখন কড়ায় সেদ্ধ হচ্ছে।

জাঁলিন-ঘটিত ব্যাপারে গর্ভবতী খরগোশটা বোধহয় জখম হয়েছিল। সে কয়েকটা মরা ছানা প্রসব করে। তাই বৃথা না পুষে তাকে আলুর সঙ্গে খদ্দেরদের পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে।

তুমি তো আজ সন্ধ্যায় ওর একটা ঠ্যাং খেলে। তারপরে আঙুল চুষতেও তো দেখলুম।

সুভেরিন প্রথমে বুঝতে পারেনি। সে হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। গা বমি-বমি করছে, মুখ বিকৃত; সে যতই গম্ভীর হোক, তার চোখের মণিতে দুফোঁটা জল উথলে উঠল।

কিন্তু এই ভাবাবেগ দেখার মতো কারো সময় নেই। দরজা এরই মধ্যে দড়াম করে খুলে গেল—সাভাল ক্যাথেরিনকে ঠেলতে-ঠেলতে ঢুকে পড়ল ভিতরে। বীয়ার খেয়ে মাতাল হয়ে মঁতসুর সরাইখানায় সরাইখানায় বেলেল্লা কান্ড করে এসেছে। তারপরে তার মনে হয়, আঁভাতাসে গিয়ে তার পুরানো সাথীদের সে দেখিয়ে দেবে—সে ভয় পায়নি। ঢুকেই সে ক্যাথেরিনকে বললে,

তোকে বলিনি, এখানে এক পাত্তর খাবি। আমার দিকে কেউ যদি এক-বারটিও তাকায় ঘুষিয়ে তার চোয়াল ভেঙে দেবনি।

ক্যাথেরিন এতিয়েঁকে দেখে চমকে উঠল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সাভালও তাকে দেখেছে। সে মুখভঙ্গী করে বললে,

দাও তো রাসেনার-গিন্নী, দু' পাত্তরই দাও! কাম শুরু হবে তাই একটু ফুর্তি করতে আলাম।

নিঃশব্দে রাসেনার-গিন্নী দু'পাত্র ঢেলে দিলে। বীয়ার দিতে তার বাছ-বিচার নেই। ঘরে সবাই চুপচাপ। সরাইখানার মালিক বা আর দুজন লোক নড়ছে-চড়ছে না।

সাভাল বড়াই করে বলে চলল, জানি, মানুষ বলবে আমি টিকটিকি। বলুক তো কেউ আমার সামনে—তাহলে তো ব্যাপারটার ফয়সালা হয়।

কারো মুখে রা নেই। পুরুষরা মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে আরো জোরে বলে চলল, কেউ কাম করে, কেউ করে না। আমার অতো চোরাছাপা নেই বাপু। দিনেউলি'র ঐ বাজে কাম ছেড়ে আলাম। কাল থেকে লা ভোরোতেই কাম শুরু করব। বারোটা বেলজিয়ামের কুলির সর্দার হব আমি। মালিকরা আমাকে একটু নেকনজরে দেখছেন কি না। তাতে যদি কারো খারাপ লাগে, সে মুখ ফুটে বলুক না। আমি তার সঙ্গে বাতচিত করতে চাই।

তার উত্তেজনার প্রত্যুত্তরে তেমনি নিঃশব্দ ঘৃণাই ফুটে উঠল। এবার সে ক্যাথেরিনের উপর রুখে উঠল।

বল মাগী, তুই খাবি কিনা? যারা মেহন্নত করতে চায় না, সেই সব জানোয়াররা গোল্লায় যাক। আয় তাদের গোল্লায় দিয়ে এক পাত্তর গিলে নেই!

ক্যাথেরিন পান করলে। হাত তার কাঁপছে, গেলাসে গেলাসে ঝংকার

উঠল। এক মুঠো টাকা বার করে সাভাল এবার টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিলে। এ মাতালের জাঁক আর ঝোঁক। সে বলছে, এ তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা। যারা কুঁড়ে তারা দশটা পয়সা দেখাক তো দেখি। তার সাথীদের ব্যবহার দেখে সে রেগে উঠছে। এবার সোজাসুজি অপমান করে বসল,

তাহলে রাত্তিরও হ'ল, আর নেউলও গর্ত থেকে বেরুলো? তাহলে পুলিসগুলো দেখছি ঘুমোচ্ছে—নইলে চোর বেরুবে কি করে?

এতিয়েং উঠে পড়ল। শান্ত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে।

শোন! যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! হাঁ, তুই টিকটিকি, তোর ঐ টাকায় হারামির বদবু উঠছে। নিজেকে তো বিকিয়ে দিয়েছিস, তাই তোর চামড়া ছুঁতেও আমার বিরক্তি লাগে। যাহোক, আমি তোর পাল্টা মানুষ—এবার তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

সাভাল ঘুষি পাকাচ্ছে।

আয়, চলে আয়। ওরে ভীতুয়া কুত্তা! তোকে চাঙ্গা করার জন্যে গাল না দিলে তো চলে না! আয়, একা আয়—আমাকে যত অপমান করেছিস তার শোধ নিতে চাই।

ক্যাথেরিন ওদের ভিতরে ছুটে যেতে চাইল। কাকুতি-মিনতিতে হাত দুখানি তার তোলা। কিন্তু ওরা তাকে ঠেলে সরিয়ে পর্যন্ত দিলে না। ও বুঝলে, লড়াই হবেই। তাই আস্তে আস্তে পেছু হটে গেল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বড় বড় চোখদুটি মেলে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। ওরা তারই জন্য পরস্পরকে হত্যা করবে।

রাসেনার-গিন্নী সহজভাবেই গেলাস ক'টা কাউন্টার থেকে সরিয়ে নিলে। কি জানি যদি ভেঙেই যায়। এ তার বৈষয়িক বুদ্ধিরই উদাহরণ। এবার এসে বসে পড়ল বেঞ্চিতে। অহেতুক কৌতূহল তার নেই। কিন্তু দুজন পুরানো সাথীকে তো খুন হতে দেওয়া চলে না। রাসেনার তাই বাধা দিতে চায়। সুভেরিন তাকে ঘাড় ধরে টেবিলে এনে বসিয়ে দিয়ে বললে,

তোমার তো ব্যাপার নয়। দুনিয়ায় ওদের দুজনের ঠাঁই নেই। যার জোর বেশী সেই টিকবে।

আক্রমণের অপেক্ষা না করে সাভাল শূন্যে ঘুষি ছুঁড়তে লাগল পাগলের মতো। দুজনের মধ্যে সে ঢ্যাঙা, দশাসই লোক। এতিয়েং'র মুখখানা লক্ষ্য করে জোরে সে ঘুষি মারছে—দুহাত দিয়ে ছুঁড়ছে ঘুষি—যেন দুহাত দিয়ে দোলাচ্ছে জোড়া তলোয়ার। কথা বলছে বকবক করে, যেন গ্যালারির দর্শকের কাছে এ তার অভিনয়। গালাগালির তুবড়ি ছুটছে। আর সেই গালাগালিতেই চাঙ্গা হচ্ছে।

ওরে শয়তান, ওরে মাগীর দালাল! তোর নাকটাই থেবড়ে দেব, তারপরে কোথা লাগিয়ে দেব নাকটা তুই তো তা জানিস। তোর ঐ চাঁদপানা চোপা-খানা একবার দেখি। বেবুশ্যেগুলোর তো ঐ চোপা দেখে আর চোখ ফেরে না! আমি ঐ চোপা দিয়ে কিমা বানিয়ে শুয়োরের খাবার করে দেব। তারপরে দেখি, বেবুশ্যে মাগীগুলো তোর পেছু পেছু ধাওয়া করে কি না!

নিঃশব্দে, দাঁতে দাঁত চেপে এতিয়েং তার ছোটখাটো দেহটি তুলে দাঁড়াল

নিজের জায়গায়, মুখ আর বুক সে রক্ষা করছে দুই মুঠো-করা হাতে, সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তারপরে উৎক্ষিপ্ত হ'ল ঘুষি—সোজা গিয়ে পড়তে লাগল ছেড়ে-দেওয়া স্প্রিঙের মতো।

প্রথমে কারোই তেমন ক্ষতি হ'ল না। এলোপাথাড়ি যাঁতাকলের ঘূর্ণায়মান চক্রের মতো একজনের ঘুষি, আর একজন ধীর, সজাগ হয়ে আছে। এতেই লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হ'ল। একটা চেয়ার উলটে পড়ল। মেঝেয় সাদা বালি ছড়ানো, দুজনের ভারি বুটে ছড়িয়ে পড়ল বালি। অবশেষে দুজনেই হাঁপাতে লাগল। ওদের হাঁপ-ধরা নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মুখ লাল, ফুলো। অন্তর্নিহিত আগুনে বুঝি স্ফীত আর সে-আগুন চোখের গর্ত দিয়ে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে।

বাগে পেয়েছি এবার! সাভাল চেঁচিয়ে উঠল। তোর লাশটা এবার বাজি।

তার ঘুষি শস্য ঝাড়াই লাঠির মতো ট্যারচা হয়ে পড়ল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাঁধে, এতিয়েঁ গোঙানি চেপে রাখল। শুধু তার মাংসপেশীর উপর পড়ে একটা ভোঁতা আওয়াজ বেরুল। এতিয়েঁও সোজাসুজি বুকে ঘুষি মেরে জবাব দিলে। ঘুষি লাগলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত সাভাল, কিন্তু সে শুধু ছাগলে লাফ লাফাচ্ছে বলেই রক্ষে। কিন্তু ঘুষিটা গিয়ে লাগল তার বাঁ পাশে। এমন প্রচণ্ড ঘুষি যে সে টলে পড়ে আর কি। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। হাত অসাড় হয়ে গেছে ব্যথায়, তাই সে চেপে গেল। এবার বুনো জানোয়ারের মতো শত্রুর তলপেট লক্ষ্য করে লাথি মারলে।

তোর নাড়িভুঁড়ি লাথিয়ে বার করে দেব! হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সাভাল, একেবারে দিনের আলোয় টেনে-হিঁচড়ে বার করে আনব।

এতিয়েঁ লাথিটা এড়িয়ে গেল। ন্যায় যুদ্ধের আইন কানুন সাভাল ভেঙেছে বলে সে রেগে উঠল। আর চুপ করেও থাকতে পারলে না।

এই জানোয়ার, রা কাড়িস নি বলছি। অমন লাথি মারিস নি, তাহলে একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে তোকে দুরমুস করে দেব।

এবার আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠল লড়াই। রাসেনার বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সে আবার বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বৌয়ের চোখের হুঁশিয়ারীতে থেমে গেল। সরাইখানায় খদ্দেরদের কি নিজেদের ব্যাপারে বোঝাপড়া করবার এক্তিয়ার নেই নাকি? তাই সে আগুনের কুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই খুশী রইল। কি জানি ঘুষোঘুষি করতে করতে ওরা যদি আগুনের ভিতরে এসেই পড়ে। সুভেরিন শান্ত, সে আপন মনে সিগারেট পাকাচ্ছে, কিন্তু আগুন ধরাবার কথা ভুলে গেছে। ক্যাথেরিন দেয়াল ঘেঁষে তেমনি চুপটি করেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অজান্তে বুকের উপর এনে রেখেছে হাত। আর আবেগে বুকের কাপড় একবার দুমড়ে দিচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। তার সমস্ত দেহমন যেন তদ্গত হয়ে আছে—সে চেঁচিয়ে উঠবে না—একজনের প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে অপরকে খুন হতে দেবে না। কিন্তু এখন তো সে একেবারে দিশেহারা—কাকে সে বেছে নেবে তার ধারণা নেই।

সাভাল শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘামে জবজবে, নেয়ে উঠেছে। এলোপাথাড়ি ছুঁড়ছে ঘুষি। সে ক্ষেপে গেছে। কিন্তু এতিয়েঁ এখনো হুঁশিয়ার আছে। সে প্রতিটি ঘুষি ঠেকাচ্ছে—তবে কোন কোনটা এসে লাগছে কাঁধে,

ছড়ে যাচ্ছে। একখানা কান ছিঁড়ে গেছে, নখের আঁচড়ে কেটে গেছে গলার খানিকটা। বড় জ্বালা! তাই সেও গাল দিতে শুরু করেছে। আবার তেমনি প্রচণ্ড ঘুষি সোজাসুজি ছুঁড়ে মারছে। সাভাল আবার বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়া ঘুষি লাফ মেরে এড়িয়ে গেল, কিন্তু এড়াতে গিয়ে সে মাথা গুঁজে বসে পড়েছিল, এমন সময় এতিয়েঁর আঘাত এসে পড়ল নাকে। নাক থেবড়ে গেল, একটা চোখ একেবারে বন্ধ করে দিলে। নাসারন্ধ্র দিয়ে ছুটছে গলগল করে রক্ত, চোখ ফুলে উঠেছে, কালশিরা পড়েছে। রক্তের ধারায় অন্ধ সাভাল, মাথা ঘুরছে ঘুষি খেয়ে, বেচারী শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ছে। এমনি সময় আর একটি ঘুষি এসে, তাকে পেড়ে ফেললে। একটা হুড়মুড় শব্দ, তার পরেই সিমেন্টের বস্তা উজাড় করে দিলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দে সে চিত হয়ে পড়ে গেল।

এতিয়েঁ অপেক্ষা করছে।

ওঠ্ বলছি। আরো যদি ক'টা খাবার সাধ থাকে—আবার শুরু করে দেব।

উত্তর দিলে না সাভাল। কিছুক্ষণ হতচেতন হয়ে থেকে মাটিতে সে গড়াগড়ি দিতে লাগল। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজছে। এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর এক আদিম হুংকারে ছুটে এল। কণ্ঠনালী ফুলে উঠছে তার।

ক্যাথেরিন কিন্তু দেখতে পেলে। নিজেরই অজান্তে বুক ঠেলে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ন চীৎকার—যাকে তার পছন্দ এ-যেন তারই স্বীকারোক্তি হয়ে এল। সে নিজেও অবাক হয়ে গেল।

হুঁশিয়ার! ওর কাছে ভোজালি আছে!

এতিয়েঁ শুধু প্রথম আঘাত হাত দিয়ে ঠেকালে। তার পশমের জামা কেটে দিয়ে গেল ভারী ফলায়। এ-ভোজালিগুলো কাঠের বাঁটের সঙ্গে পিতলের আঙটা দিয়ে আঁটা। সাভালের কব্জি চেপে ধরলে এতিয়েঁ, এবার তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল। সে জানে, যদি ছেড়ে দেয়, সে মরবে। আবার শত্রু ঝাঁকুনি দিচ্ছে হাত ছাড়িয়ে নিতে। ছাড়া পেলেই সে আঘাত করবে। আস্তে আস্তে ভোজালিখানা নীচু হয়ে এল। অবসন্ন দেহ ওদের আরো অবসন্ন। এতিয়েঁ একবার ইস্পাতের শীতল স্পর্শ অনুভব করল চামড়ার ওপরে। শেষ চেষ্টা সে করল। সাভালের কব্জি ধরে এমন জোরে মোচড়াতে লাগল যে, হাত থেকে ছোরাখানা পড়ে গেল। দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোরাখানার উপর। কিন্তু এতিয়েঁ তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। এবার তার পালা। সাভালকে সে হাঁটুর নীচে চেপে ধরে আছে, তার টুঁটিটা কেটে ফেলবে বলে একেবারে তৈরী।

ওরে হারামি! এবার তোর দফা নিকেশ করে দেব।

এক ভয়ঙ্কর, বধির-করা স্বর যেন উঠে আসছে তার সত্তার গভীর থেকে। তার অন্ত্রের ভিতর থেকে যেন উঠে আসছে, মগজে হাতুড়ির ঘার মতো বাজছে। এ-এক হঠাৎ হত্যার উন্মাদনা—রক্ততৃষ্ণা। আগে তো কখনো এমনি করে এ ঝোঁক তাকে চেপে বসেনি। আবার এখন সে মাতালও নয়। বংশগতির এই দুষ্ট রোগের বিরুদ্ধে তার লড়াই শুরু হয়ে গেল। উন্মাদনায় অধীর মানুষের কম্পন দেখা দিয়েছে। বলাৎকারের পূর্বে মানুষের এমনি সংগ্রামই শুরু হয়।

অবশেষে সে জয়ী হ'ল। পিছনে ফেলে দিলে ভোজালি—ভাঙা গলায় জড়ানো স্বরে বললে,

ওঠ্—ভাগ্ এখান থেকে!

এরই মধ্যে রাসেনার ছুটে এসেছে। কিন্তু দুজনের মধ্যে গিয়ে পড়বার সাহস তার নেই। কি জানি যদি ভোজালির একটা সাংঘাতিক চোপ এসে তার উপরই পড়ে। কেউ তার সরাইখানায় খুন হোক সে তা চায় না। তার স্ত্রী কাউন্টারে সোজা হয়ে বসে আছে। সে বলছে, একটু বেশী তাড়াতাড়ি সে চীৎকার করে উঠছে। সে এতে আরো রেগে উঠছে।

সুভেরিনের পায়ে ভোজালিখানা আর-একটু হলেই লেগেছিল, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এবার সিগারেট ধরাবে ঠিক করলে। তাহলে পালা সাঙ্গ হ'ল? ক্যাথেরিন দুজনের দিকে হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে আছে। দুজনেই বেঁচে আছে—এ-যে তার আশাতীত।

এতিয়েঁ আবার বললে, যা—ভাগ্। যা—নইলে তোকে সাবড়ে দেব।

সাভাল উঠে দাঁড়াল। নাক দিয়ে ঝরছে রক্ত, সে হাতের চেটো দিয়ে মুছে ফেললে। চোখ কালশিরে-পড়া, চোয়াল রক্তমাখা। নেঙচাতে নেঙচাতে সে চলে গেল। পরাজয়ে সে ভীষণ হয়ে উঠেছে। ক্যাথেরিন অজান্তেই তার পিছনে পিছনে চলতে যাবে, এমন সময় ফিরে দাঁড়াল। তার ঘৃণা অশ্লীল গালাগাল হয়ে ঝরে পড়ল।

না, না, তোকে আসতে হবেনি। তুই তো ওকে চাস—ওর সঙ্গে গিয়ে শুয়ে পড়, ওরে ঢেমনি। যদি পরাণডার মায়া করিস তো মোর ঘরও আর মাড়াসনি!

দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল সাভাল।

উত্তপ্ত ঘর। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে শুধু আগুনের গর্জন। মেঝেয় পড়ে আছে উলটানো চেয়ারখানা। আর মেঝেয় ছড়ানো বালি শুষে নিচ্ছে রক্তের ধারা।

চার

রাসেনারের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে চলছিল ক্যাথেরিন আর এতিয়েঁ, তুষার গলতে শুরু করেছে। অতি আস্তে, শুরু হয়েছে তার ক্রিয়া। তুষার এখনো গলেনি, তবে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে। বিবর্ণ আকাশে বিরাট মেঘ-সম্ভারের আড়ালে স্পষ্ট দেখা যায় পূর্ণ চন্দ্র। মেঘ যেন কালো কালো নেকড়ার ফালি হয়ে ঝোড়ো-হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। নীচে কিন্তু হাওয়ার একটু সাড়াশব্দ নেই। ছাদ থেকে তুষার-ঝরার শব্দ অবধি না।

এতিয়েঁ মেয়েটির সঙ্গে চলেছে। সে বিব্রত। তার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে গেছে সাভাল। বিব্রত হয়ে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ওকে রিকুইলারের গোপন ডেরায় নিয়ে যাবে সেও তো অতি অসম্ভব। বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে শুনে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। না, না—ওদের ফেলে পালিয়ে এসে এখন গিয়ে ওদের বোঝা হয়ে থাকার থেকে ওর যা হয় হোক না! তাই কেউ আর কথা বলেনি। শুধু পথ বেয়ে চলেছে তো চলেছেই। পথ

তো নয় যেন কাদার নদী। কোথায় যাবে তাও তারা জানে না। প্রথমে ওরা লা ভোরোর দিকে যাচ্ছিল, তারপরে পিটের পাড় আর খালের মাঝামাঝি এসে আবার ফিরল।

এতিয়েং এবার বললে, কিন্তু কোথাও ঘুমুতে তো হবে। আমার যদি একটা কামরাও থাকতো, তোমাকে সেখেনে নিয়ে গিয়ে তুলতে—

কথাটা শেষ করতে পারলে না। কেমন এক অদ্ভুত ভীরুতা এসে যেন বাধা দিলে। অতীতের কথা মনে হ'ল। ওদের ছিল উদগ্র কামনা—ছিল সংকোচ, লজ্জা—ওরা তাই মিলতে পারেনি। এখনো কি এতিয়েং ওকে তেমনি করে কামনা করে। সে বিব্রত হয়ে পড়ল।

আবার নতুন করে কামনার উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে বুকে? গাস্তং-মারীতে ক্যাথি ওকে আঘাত করেছিল, তার স্মৃতি তো আজ ঘৃণা বয়ে আনে না, বরং ওর মন টানে।

সে অবাক হয়ে গেছে; রিকুইলারের ডেরায় নিয়ে যাওয়া যেন ওর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

দেখ, মন ঠিক কর। বল—কোথায় নিয়ে যাব? তুমি কি আমাকে খুব ঘেন্না কর—আমার সঙ্গে যাবে না?

আস্তে আস্তে পেছু চলেছে ক্যাথি। গর্তে গোড়া-তোলা জুতো বার বার পিছলে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মাথা না তুলেই বললে,

এমনি তো বহুৎ দুঃখ আছে—আর বাড়িয়ো না গো। গিয়ে কি ভালাই হবে—এখন তো মোরও পিরিতের মানুষ জুটেছে, তোমারও আছে মেয়েমানুষ।

মোকে-ছুঁড়ির কথাই সে বলছে। তার বিশ্বাস এখনো মেয়েটার সঙ্গে তার লটাপটি আছে। অন্তত এই পক্ষকাল ধরে তো তাই-ই গুজব। সে যখন হলপ করে বললে, না মোটেই তা নয়, ক্যাথি মাথা নাড়ল। তার সেই সন্ধ্যার কথা মনে আছে। দুজনে দুজনকে চুমু খাচ্ছিল ব্যগ্রভাবে—সে তা দেখেছে।

এতিয়েং থেমে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললে, এসব বাজে গুজব! আমরা তো দুজনে দুজনকে ভাল করে চিনি।

কেঁপে উঠল ক্যাথেরিন; বললে,

দুঃখ করে লাভ নেই! তাতে আর কি হয়েছে। যদি জানতে গো কি বাজে চিমড়ে ছুঁড়ী আমি...দুই পয়সার মাখনের তালের চেয়েও রোগা, এমন মোর শরীল যে কোনদিনই পুরোপুরি মেয়েমানুষ হতে পারবনি।

লজ্জা নেই। বলে যেতে লাগল তার নিজের দেহের কথা। এই বহু-বিলম্বিত যৌবন যেন তার নিজেরই পাপ—তাই সে নিজেকে দুষছে। সে মরদ পেয়েছিল বটে, কিন্তু এতেই তার কিম্মৎ কমে গেছে—এখনও ছেলে-মানুষদেরই শামিল সে।

এতিয়েং'র মন করুণায় ভরে গেল। সে বিড়বিড় করে বললে, আহা বেচারী!

পিটের পাড়ের কাছে ওরা এসে পড়ল। বিরাট ছায়ার আড়ালে ছায়াময়। কালো-কালো মেঘ চাঁদের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। দুজনে দুজনের মুখও দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তবু নিঃশ্বাস এসে নিঃশ্বাসে মিশল, ঠোঁট খুঁজে

বেড়াতে লাগল ঠোঁট—দীর্ঘ মাসের পর মাস ধরে এই কামনাই তো তারা করেছে। এ-যেন তাদের ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠেছিল। চাঁদ আবার হঠাৎ বেরিয়ে এল মেঘের স্তর থেকে। ওরা সান্ত্রীকে দেখতে পেল। আলোয় আলো পিটের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুম্বনের আগেই লজ্জা এসে দেখা দিলে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এ-সেই সাবেক লজ্জা—এতে রাগ আর অস্পষ্ট বিতৃষ্ণার অনুভূতি আছে—আর আছে অনেকখানি বন্ধুত্বের মিশেল। আবার পথ চলা শুরু হ'ল, কাদায় হাঁটু অবধি ডুবে যাচ্ছে।

তাহলে এই তোমার শেষ কথা। তুমি আসতে চাও না?

ক্যাথেরিন বললে, না গো না, সাভালের পরে তুমি, তারপরে আর-একটা এসে জুটবে। না, না, ও আপদ-বালাই মোর ভাল লাগেনি। ফুর্তি তো পাইনে, তবে মরদ জোটাব কেনে?

ওরা চুপচাপ। কথা না বলে কিছু দূর এগিয়ে গেল।

এতিয়েং এবার বললে, যাহোক, এখন কোথায় যাবে বল? তোমাকে তো আর রাত-বিরেতে ফেলে যেতে পারিনে!

সহজ সুরে উত্তর দিলে ক্যাথেরিন, ওখানেই ফিরে যাব। সাভাল মোর মানুষ। ওর সাথে ছাড়া কার কাছে শুতি যাব?

সে তো তোমাকে পিটিয়েই জান নিকলে দেবে।

আবার নীরবতা। আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে মেয়ে। পিটবে বই কি সাভাল, তারপর হাঁপিয়ে পড়ে ক্ষান্ত দেবে। এমনি ভবঘুরের মতো পথ চলার চেয়ে সে কি ভাল নয়? তা ছাড়া কিল-ঘুষি খেয়ে সে অভ্যস্ত। সে তো নিজেকে সান্ত্বনা দেয়—দশজন মেয়ের ভিতরে আটজন তার চেয়ে কিছু সরেসভাবে থাকে না। যদি ভালবাসার মানুষ কোনদিন তাকে বিয়ে করে, তাহলে তো চমৎকারই হবে।

মঁতসুর দিকে ওরা কলের পুতুলের মত চলতে লাগল। মঁতসু যত কাছে আসছে, তত তাদের নীরবতা বাড়ছে। যেন কখন ওরা একসঙ্গে ছিল না। ওকে বোঝাবে এমন যুক্তি এতিয়েং খুঁজে পেলে না। যদিও সাভালের কাছে ফিরে যাবে শুনে ওর বিরক্তি বেড়ে গেছে। বুকখানা ভেঙে যাচ্ছে। সে তো আর কিছুই দিতে পারবে না ক্যাথিকে—হতভাগ্য ফেরারীর জীবন তার। তার আছে রাত্রি, আগামী কালের সম্ভাবনা তার নেই। একটা গুলী চলে যাবে মাথা ফুঁড়ে দিয়ে—আর শেষ হয়ে যাবে। হয়তো বর্তমানের দুঃখ সয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ—আবার নতুন দুঃখ সৃষ্টি করে লাভ কি। তাহলে সে ক্যাথিকে তার প্রেমিকের কাছে ফিরিয়ে দিতেই চলেছে। মাথা তার হেঁট হয়ে গেল। ইয়ার্ডের কোণে এসে ক্যাথেরিন সদর সড়কের উপর থেমে পড়ল। পিকেতের সরাইখানা আর মাত্র বিশ গজ দূরে। এতিয়েং প্রতিবাদ করলে না।

আর এসনি গো। তোমাকে দেখলে আবার কি হাঙগামা বাঁধাবে সেই-ই জানে।

এগারোটা বাজে। সরাইখানা বন্ধ। শুধু শার্সির ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যায়।

যাই, ক্যাথেরিন ফিসফিসিয়ে বলে উঠল।

হাতখানা ধরতে দিয়েছিল ক্যাথি, এতিয়েং সে-হাত আর ছাড়েনি। এবার

বড় দুঃখে আস্তে আস্তে হাতখানা টেনে নিলে। বিদায় নিচ্ছে। ফিরেও তাকালে না। পাশের একটা ছোট দরজার তালা খুলে ঢুকে পড়ল। এতিয়েঁ চলে গেল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে আছে বাড়িখানার দিকে—ভাবছে, কি না জানি ঘটছে ওখানে। কান পেতে শুনছে—এখুনি স্ত্রীলোকের আর্তনাদ উঠবে সেই ভয়েই বুঝি ভীত। কিন্তু জানালা খুলে গেল। এতিয়েঁ ঐ শীর্ণ ছায়া দেখে চিনেছে। সে কাছে এগিয়ে গেল। ছায়া পথের উপর ঝুঁকে পড়ল।

ক্যাথেরিন এবার ফিসফিস করে বললে,

ও এখনো ফেরেনি। শুতে যাচ্ছি। দোহাই তোমার, তুমি চলে যাও।

এতিয়েঁ চলে গেল। তুষার গলা শুরু হয়ে গেছে, বাড়ছে। বাড়ির ছাদ থেকে ঝরছে ধারা—একটা স্যাঁতসেঁতে ঘাম যেন দেয়াল আর বেড়া বেয়ে নামছে। এই শিল্প-অঞ্চলের সমস্ত বাড়ি-ঘর রাতে আবছা দেখা যায়। ক্লান্ত, হতাশ হয়ে এতিয়েঁ প্রথমে রিকুইলারের দিকে চলল। গর্তে গিয়ে ঠাঁই নেওয়া আর ধুঁকতে ধুঁকতে সেখানে মরা ছাড়া অন্য কামনা তার নেই। হঠাৎ ভোরোর কথা মনে পড়ে গেল। বেলজিয়ামবাসী মজুরের দল কাজে নামতে যাচ্ছে, ধাওড়ার সাথীরা সিপাইদের বিরুদ্ধে রুখে আছে—ওরা ভিন দেশী মজুরদের তো কিছুতেই সইতে পারবে না। আবার সে কাদা ঠেলে খাল-ধার দিয়ে চলতে লাগল।

পিটের পাড়ের কাছে আবার এসে দাঁড়াল। চাঁদের আলো এখন আরো উজ্জ্বল। চোখ তুলে আকাশ পানে চেয়ে দেখলে। মেঘ ছুটেছে জোর কদমে, উপরের জোরালো হাওয়ায় ক্ষেপে ক্ষেপে উঠছে। কিন্তু নীচে এসে সাদা আর পাতলা হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। চাঁদের কাছে এসে তো রহস্যময় স্বচ্ছতায় ফুটে উঠছে। যেন কুঞ্চিত জলরাশি। এমনি দ্রুত ছুটছে মেঘদল, চাঁদ শুধু অবগুণ্ঠনে মুহূর্তের জন্য ঢাকা পড়ছে—চির-উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে।

এই নির্মল আলোয় চোখ ঝলসে গেছে এতিয়েঁর। সে চোখ নামিয়ে নিলে। এবারে পিটের পাড়ে কি যেন দেখতে পেলে। ঠাণ্ডায় বিবশ সান্ত্রী—পায়চারি করছে। বিশ হাত মার্সিয়িনের দিকে এগিয়ে আসছে, আবার বিশ হাত ফিরে যাচ্ছে মঁতসুর দিকে। শরীরের কালো আদরাটা দেখা যাচ্ছে, তার উপরে জেগে আছে সঙ্গীনের শুভ্র ফলক—বিবর্ণ আকাশের পটভূমিতে ফুটে আছে। এতিয়েঁর সেদিকে মন নেই। বুড়ো বনেমোর ঝড়ের রাতে যে ডেরায় ঠাঁই নিত, সেই ডেরার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা কালো ছায়া। যেন সজাগ জানোয়ার ওত পেতে আছে। সে চিনতে পারলে, ও তো জাঁলিন। সান্ত্রী তাকে দেখতে পায়নি। ঐ দস্যি ছেলেটা হয়তো একটা কোন মতলব এঁটেই এসেছে। এখানে ফৌজের উপর সে ভারী চটা। সে তো বার বার জিজ্ঞাসা করে, কখন এই খুনেদের হাত থেকে তারা রেহাই পাবে। ওদের তো বন্দুক হাতে দিয়ে মজুরদের খুন করতেই পাঠানো হয়েছে।

এতিয়েঁর ইচ্ছে হ'ল, ওকে ডেকে দুষ্টামি করতে বারণ করে।

চাঁদ এখন মেঘের আড়ালে ঢাকা। সে দেখলে, ছেলেটা যেন সান্ত্রীর উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য তৈরী। এমন সময় চাঁদ আবার আড়াল থেকে বেরিয়ে

এল। ছেলেটা আবার গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল। প্রতিবার পায়চারি করতে-করতে সান্ত্রী ডেরা অবধি আসছে, আবার উলটো দিকে ফিরে যাচ্ছে। হঠাৎ মেঘ আবার ছায়া ফেলল। জাঁলিন এবার লাফিয়ে পড়ল সান্ত্রীর কাঁধের উপর বুনো বেড়ালের মতো এক বিরাট লাফে। তাকে যেন নিজের থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরলে, তারপরে তার বড় ছুরির ফলাখানা বসিয়ে দিলে তার গলায়। ঘোড়ার পশমের শক্ত কলার বাধা দিলে, সে দু'হাত দিয়ে বাঁট চেপে ধরল, নিজের সমস্ত দেহের ভার প্রয়োগ করে ঝুলে পড়ল। বহুবার খামার বাড়ির পিছনে মুরগী পেয়ে সে জবাই করেছে। হাত তার সাফ। এও যেন তেমনি। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হ'ল। শুধু একটা অস্ফুট চীৎকার উঠল অন্ধকারে। রাইফেলটা শব্দ করে পড়ে গেল মাটিতে। আবার চাঁদ তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এতিয়েং স্তব্ধ হয়ে গেল ভয়ে। গলায় চীৎকার বেধে গেছে। উপরে পিটের চূড়া এখন শূন্য, সঞ্চরমান মেঘস্তরের পটভূমিতে আর ছায়া দেখা যায় না। সে ছুটে এল। জাঁলিন তখন লাশের কাছে চার হাত পায়ে গুঁড়ি মেরে এসে গেছে। চিত হয়ে পড়ে আছে লাশটা, হাত দুটো ছড়ানো। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় লোকটার লাল পাজামা, ধূসর জোব্বাটা দেখা যাচ্ছে। সাদা তুষারে যেন বড়ই বেমানান। এক ফোঁটা রক্ত ঝরেনি, ছোরাখানা এখনো গলায় আমূল বসানো।

অদম্য ক্রোধে ফেটে পড়ল এতিয়েং, লাশের পাশে ছেলেটাকে ঘুষি মেরে ফেললে।

কেন এমন করলি ?

জাঁলিন উঠে পড়ল। হাতে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলেছে, শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে বেড়ালের মত। বড় বড় কান তার, সবুজ চোখ জ্বলছে আর উঁচু চোয়াল নড়ে নড়ে উঠছে। তার দুষ্কৃতির উত্তেজনায়ই এমনি হয়েছে।

দোহাই ঈশ্বরের, বল্ তো, এমন কাজ কেন করলি ?

কি জানি! মন চাইল, করে ফেললাম।

এই তার জবাব, কত পেড়াপীড়ির পরও এই তার জবাব। তিন দিন ধরে নাকি তার এই ইচ্ছে চেপে বসে। কত জ্বালিয়েছে তাকে, ভেবে ভেবে মাথা ধরেছে। এই যে সিপাহী-বেটারা খনির মজুদের নিজেদের ঘরে চড়াও হয়ে তম্বি চালাচ্ছে—ভয়-ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে—এদের উপর আবার অতো মায়া দয়া কিসের? বনের জমায়েতের জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর পিটে পিটে মৃত্যু আর ধ্বংসের জিগিরের ভিতরে পাঁচ-ছটা কথা তার মনে আছে। যেসব পাজী ছেলেরা পথে বিপ্লব-বিপ্লব খেলা করে বেড়ায়, তাদের মতোই ঐ কথা ক'টা সে আউড়ে যায়। ঐ ক'টা কথাই জানে, কেউ তাকে একাজ করতে বলেনি, সে নিজেই ভেবে ভেবে তবে করেছে। কোন খেত থেকে পেঁয়াজ চুরির কথা যেমন মগজে হঠাৎ খেলে যায়—এও যেন তাই।

শিশু মগজে পাপের এই রহস্যময় উদ্গমে এতিয়েং চমকে উঠল। সে যেন দায়িত্বজ্ঞানহীন এক জন্তু—তাই তাকে লাথি মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিলে। তার ভয়, হয়তো সান্ত্রীর অস্ফুট চীৎকার লা ভোরোর রক্ষী-ঘাঁটিতে শুনতে পেয়েছে। তাই চাঁদ যখনি মেঘের আড়াল থেকে সরে আসছে, সে পিটের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু স্পন্দন নেই। সে এবার নুয়ে পড়ল, হাত বরফের মত

ঠাণ্ডা হয়ে আসছে সান্ত্রীর। সে বুকে কান পেতে শুনল, ওভারকোটের নীচে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া এখন বন্ধ। শুধু হাড়ের বাঁটওলা ছুরিখানাই দেখা যায়। তার উপরে সহজ সরল 'ভালবাসা' কথাটি কালো অক্ষরে খোদাই করা।

ছুরি থেকে এবার চোখ ফিরে গেল মুখে। হঠাৎ এই তরুণ সিপাহীকে সে চিনতে পারল। এ সেই জুল্। সেই রঙরুট—যার সঙ্গে সেদিন সকাল-বেলা তার আলাপ হয়। সুন্দর কোমল মুখখানি, ব্রণের দাগে দাগী—দেখে গভীর দুঃখ উথলে উঠল। নীল চোখ তার বিস্ফারিত, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ও তো তাকে এমনি করেই তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল। দিগন্তের পরপারে তার নিজের জন্মভূমির দিকে সে চেয়েছিল। সেই সূর্য-করোজ্জ্বল দৃশ্য—সেই প্লোগফ কোথায়? ঐখানে—ঐখানে! এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে দুরন্ত সমুদ্র গর্জমান। ঝোড়ো-হাওয়া হয়তো বয়ে চলেছে জলাভূমির উপর দিয়ে শন্‌শন্ বেগে। হয়তো দাঁড়িয়ে আছে দুটি স্ত্রীলোক সেখানে—মা আর বোন; টুপি চেপে ধরে আছে—তাকিয়ে আছে। এই যে মাইলের পর মাইলের ব্যবধান ওদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে—সেই ব্যবধান পেরিয়ে ওরা বুঝি দেখবে এই খুদে মানুষটিকে—জানবে তার কি হাল। এমনি করে রোজই বসে থাকবে ওর আশায়। এই যে গরীব-গুরবোরা ধনীর জন্য একে অপরকে খুন করে—এর চেয়ে ভয়াবহ আর কি হতে পারে!

কিন্তু লাশটা সরানো দরকার। এতিয়েঁ প্রথমে ওটা খালেই ফেলে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু খোঁজ মিলবেই এই ভয়ে ফেলেনি। যত সময় চলে যাচ্ছে, বাড়ছে তার উদ্‌বেগ। একটা যাহোক কিছু করতে হবে। হঠাৎ যেন বুদ্ধি গজিয়ে উঠল। যদি লাশটা রিকুইলারে বয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেখানে চির-দিনের জন্য পুঁতে ফেলা চলবে।

জাঁলিনকে ডেকে বললে, এই, এদিকে আয়!

ছেলেটার মনে সন্দেহ।

না, তুমি আমাকে মারবে। মোর কাম আছে। চলি।

সত্যই তার বেবের্ত আর লিদির সঙ্গে দেখা করার কথা। লা ভোরোর রোলা যেখানে গাদা-করা আছে, সেখানে একটা ঘুপসি দেখে ঠিক করা হয়েছে জায়গা। এক বিরাট দুঃসাহসিক অভিযানের ছক তৈরী হয়েছে—রাতে ওরা কেউ বাড়ী ফিরবে না। বেলজিয়ামের কুলিরা যখনি পিটে নামতে আসবে, তখন ঢিল মেরে তাদের হাড় ভেঙে দেবে।

এতিয়েঁ আবার বললে, শোন, এদিকে আয়। নয়তো আমি সান্ত্রীদের ডাকব, তোর মাথাটা উড়িয়ে দেবে।

জাঁলিন এগিয়ে এল। এতিয়েঁ রুমালখানা ভাঁজ করে নিয়ে সান্ত্রীটির গলায় শক্ত করে জড়িয়ে দিলে। ছোরাখানা খুলে নিলেনা, আর তাতে রক্তও ঝরল না। তুষার গলছে। রক্তের দাগ নেই মাটিতে—পায়ের ছাপও না—ধস্তাধস্তির চিহ্ন পর্যন্ত না।

তুই পা-দুখানা ধর!

জাঁলিন পা-দুখানা ধরল। এতিয়েঁ সান্ত্রীর পিঠে রাইফেলটা শক্ত করে বেঁধে দিয়ে ওর কাঁধ ধরে তুলে ফেললে। এবার পিটের পাড় ধরে ওরা নামতে লাগল ধীরে ধীরে। ভাগ্য ভাল, চাঁদ আবার মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

কিন্তু খালের ধার দিয়ে চলতে-চলতে আবার উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল আলো। রক্ষীরা যে দেখতে পেলে না সে বুঝি জাদুরই খেলা। আস্তে আস্তে ওরা চলেছে; লাশটা দুলছে। এতে এগুতে অসুবিধে হচ্ছে। একশো গজ অন্তরই নামাতে হচ্ছে মাটিতে। রিকুইলারের গলির কোণে এসে ওরা একটা শব্দ শুনতে পেলে। ভয়ে যেন জমে গেল। টহলদারী ফৌজ রোঁদে বেরিয়েছে। দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার যাহোক সময় পেয়েছিল বলেই রক্ষা পেল। আরো কিছুদূর গিয়ে আবার একটা লোকের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে গেল। লোকটা মাতাল, ওদের গাল দিতে দিতে চলে গেল। অবশেষে পুরানো পিটে এসে পেঁছিল। ঘামে নেয়ে উঠেছে, ক্লান্তিতে দাঁতে দাঁত লেগে গেছে—উঠছে শব্দ।

এতিয়েং আগেই ভেবে রেখেছিল, সান্ত্রীর লাশটা স্যাফটে করে নামিয়ে দেওয়া সহজ হবে না। সত্যই সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রথমে জাঁলিন উপরে দাঁড়িয়ে লাশটাকে গড়িয়ে দিলে। ঝোপঝাড়ে ঝুলে ঝুলে এতিয়েং লাশের সঙ্গে সঙ্গে চলল। প্রথম দুখানা মইয়ের ধাপ ভাঙা। সে সেই দুখানা মই পার করে দিলে।

তারপরে প্রতিটি মইয়ে ওরা এমনি করেই নিয়ে চলল। এতিয়েং প্রথম নেমে গেল, তারপরে লাশটা নামিয়ে দিতেই দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলে। এমনি করে তিরিশখানা মই নেমে এল এতিয়েং—একেবারে দুশো গজ নীচে—বার বার মনে হচ্ছে এই বুঝি লাশ এসে ঘাড়ের উপর পড়ল। বন্দুকে শিরদাঁড়া ছড়ে যাচ্ছে, তবু মোমের টুকরোটুকুর জন্যে ছেলেটাকে পাঠালে না। কৃপণের ধনের মতো ঐটুকু সে পুঁজি করে রেখেছে। লাভ কি আলো এনে? এই সংকীর্ণ স্যাফটের ভিতরে আলো তো শুধু ওদের বিব্রত করেই তুলবে। এবার পিটের মুখে এসে হাজির হ'ল। হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। সে এবার ছেলেটাকে পাঠালে মোমটুকুর জন্যে। নিজে লাশের পাশে অন্ধকারে বসে রইল। বুকে তার দ্রুতস্পন্দন।

জাঁলিন মোমবাতি নিয়ে ফিরে আসতেই এতিয়েং তার কাছে পরামর্শ চাইলে। ছেলেটাই এই পুরানো পিট আবিষ্কার করেছে, যে-সব ফাটল দিয়ে মানুষ গলতে পারে না সেগুলি অবধি ওর জানা। ওরা আবার রওনা হ'ল। লাশটা টানতে-টানতে নিয়ে গেল দুই কিলোমিটার অবধি—ধসে-পড়া কাঁথির গোলক-ধাঁধা পেরিয়ে চলল। এবার ছাদ নীচু হয়ে এল। ওরা চেয়ে দেখলে, একটা বালির ঢিবির পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। কতগুলো আধ-ভাঙা কাঠ-কুটরোর ঠেক্‌নো ভাঙাচোরা ছাদের গায়ে লাগানো। এ একটা নীচু সিন্দুক যেন। ওরা এরই ভিতরে সান্ত্রীটাকে শুইয়ে দিলে। শবাধারে যেন শব শুইয়ে দিলে। বন্দুকটা পাশে রাখলে। তারপরে পায়ের গোড়ালির প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙতে লাগল কাঠ। নিজেদের চাপা পড়বার ভয়ও আছে। এতিয়েং আবার দেখতে ফিরে এল। এখনো ছাদ ধসে ধসে পড়ছে, তার বিরাট চাপে দেহটাকে পিষে দিচ্ছে, দেখতে দেখতে আর কিছুই বাকি রইল না; এখন শুধু বিরাট মাটির স্তূপ আর স্তূপ।

জাঁলিন তার ডেরায় ফিরে এক কোণে খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। এই তার দস্যুর গুহা। সে ক্লান্তিতে অভিভূত। অস্ফুটস্বরে বললে,

দূর ছাই, বাচ্চা দুটো বসে থাক! এক ঘণ্টা না ঘুমিয়ে পারব না।

এতিয়েং মোমখানা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে। আর একটু মাত্র বাকি আছে। সেও ক্লান্ত, কিন্তু ঘুম পায়নি। মগজে দুঃসহ দুঃস্বপ্নের মতো ভাবনার হাতুড়ি পিটছে। শেষ পর্যন্ত একটা ভাবনা রয়ে গেল, তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে যেন প্রশ্নে প্রশ্নে হয়রান করে তুলেছেঃ—ভোজলীর তলায় পেয়েও সাভালকে সে ছেড়ে দিল কেন? আর ছেলেটাই বা সান্ত্রীটাকে খুন করলে কেন? ওর নামও তো সে জানে না। ওর বিপ্লবী বিশ্বাস যেন টলমল করে উঠল, নাড়া খেল—হত্যা করবার সাহস—অধিকার যেন লুপ্ত। তাহলে সে কি ভীরু? খড়ের গাদায় ছেলেটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাতালের নাক ডাকানি যেন। যেন হত্যার নেশায় মাতাল হয়ে ঘুমোচ্ছে—এমনি করে নেশা কাটাচ্ছে। এতিয়েং বিরক্ত; ছেলেটা এখানে আছে, তার মনের কথা আঁচ করতেও পারে। হঠাৎ শিউরিয়ে উঠল। ভয়ে যেন ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা মৃদু খসখস শব্দ, মাটি থেকে যেন উঠে এল এক দীর্ঘশ্বাস। ঐ যে তরুণ সান্ত্রীটি ধসের ভিতরে রাইফেল পাশে নিয়ে শুয়ে আছে—সেই দৃশ্য মনে হতেই শিরদাঁড়া বেয়ে শিহরণ নেমে এল, চুল খাড়া হয়ে উঠল। এ মূর্খতা—সে তা জানে। কিন্তু সারা পিট যেন এখন বিভিন্ন স্বরে স্বরময়। আবার মোমখানা জ্বালাতে হ'ল। বিবর্ণ আলোয় শূন্য কাঁথি চোখের সামনে উঠল ভেসে—এতিয়েং আশ্বস্ত, প্রকৃতিস্থ হ'ল।

এক ঘণ্টা ধরে চলল ভাবনা। পলতেটার দিকে তাকিয়ে যেন নিজের সঙ্গেই লড়াই করছে। দপ্‌দপ্‌ করে উঠল পলতে, চড়চড় শব্দ—পলতেটা গলিত চর্বির ভিতরে পড়ে গেল। আবার সব অন্ধকার। আবার শিহরণ উঠছে সারা দেহে। ইচ্ছে হ'ল জাঁলিনের জোর নাকডাকানি চড় মেরে থামিয়ে দেয়। ছেলেটার কাছে থাকাও যেন অসহ্য ঠেকছে, তাই সে ছুটে চলে এল। বিশুদ্ধ হাওয়ার জন্যে এক আকুল কামনা জেগে উঠেছে। কাঁথির পর কাঁথি পার হয়ে স্যাফটে চড়ে উপরে উঠে এল। যেন এক অশরীরী ছায়া তার পেছনে ধাওয়া করেছে।

এবার উপরে উঠে এল। চারদিকে রিকুইলারের ধ্বংসস্তূপ। স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস পড়ছে। যখন খুন করবার সাহস নেই, তখন মরতেই হবে। মৃত্যু-কামনায় ছোঁয়া লেগেছে তার, সেই কামনাই আবার ফিরে-ফিরে এল। মগজে চেপে বসল। এ-যেন শেষ আশা।

সাহসীর মত মরতে হবে—মরতে হবে বিপ্লবের জন্য—আর সেইখানেই তো সব শেষ হয়ে যাবে—নিজের হিসেব-নিকেশ সাঙ্গ—ভাল মন্দের ইতি—আর তো তারপরে ভাবতে হবে না। যদি তার সাথীরা বেলজিয়ামের কুলিদের আক্রমণ করে, সে-তো থাকবে পয়লা সারে—হয়তো বরাতক্রমে একটা সাংঘাতিক আঘাতও জুটতে পারে। আবার দৃঢ় পদক্ষেপে ভোরো পরিক্রমা শুরু করবে বলেই ফিরে এল। দুটো বাজল। সর্দারের কামরা থেকে জোরালো স্বর শোনা যাচ্ছে। এখানেই সান্ত্রীরা থাকে। সান্ত্রী অদৃশ্য হতে ওরা ভয়ে অস্থির। সর্দারকে জাগিয়ে দিতে লোক পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে তন্ন-তন্ন করে তদন্ত করে তারা সিদ্ধান্ত করেছে, সান্ত্রীটি পলাতক। অন্ধকারে কান পেতে শুনছিল এতিয়েং। এতিয়েং'র মনে হ'ল, তরুণ সৈনিকটি বলেছিল, তাদের

সর্দার গণতন্ত্রীদলের মানুষ। ধর—তাকে যদি জনগণের পক্ষে যোগদানে মত করানো যায়? তখন সৈন্যদল হাওয়ায় রাইফেলের কুঁদো তুলে ধরবে, আর সেই হবে বুর্জোয়াদের হত্যার সংকেত। এই নতুন স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে গেল—আর মৃত্যুর কথা মনে রইল না। কাদার ভিতরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ঝিরঝিরিয়ে গলছে তুষার, কাঁধে তার পড়ছে। তখনো তার মনে দুরন্ত আশা—এখনো জয়ের সম্ভাবনা আছে।

বেলজিয়ামের কুলিগ্যাঙের অপেক্ষায় সে পাঁচটা অবধি বসে রইল। তারপরে বুঝতে পারলে, কোম্পানি চাতুরির আশ্রয় নিয়েছে। তাদের পিটেই ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নামা শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। দুশো-চল্লিশ নম্বর পাড়ায় যে দু-একজনকে পাহারা রাখা হয়েছিল, তারা তাদের সাথীদের হুঁশিয়ার করে দেবে কিনা ভেবে পাচ্ছে না। সে কোম্পানির কৌশলের কথা তাদের বুঝিয়ে বললে, তারাও অমনি ছুটে চলে গেল। একা সে পিটের পাড়ের আড়ালে সজাগ পাহারায় রইল। এরই মধ্যে দুটো বেজে গেল। ফিকে রঙের আকাশ এখন রক্তিম ঊষার আলোয় আলো। পাদরী রাঁভিয়ে আসছেন, জোব্বাটা তোলা, সরু সরু পা দেখা যাচ্ছে। পিটের ওপাশে গীর্জায় ফি-রোববারে প্রার্থনা করতে যান।

তিনি এতিয়েঁর আপাদমস্তক জ্বলজ্বলে চোখ-দুটো বুলিয়ে নিয়ে জোরে বলে উঠলেন, বন্ধু, সুপ্রভাত।

এতিয়েঁ নিরুত্তর। দূরে কে একটা স্ত্রীলোক চলে যাচ্ছে। সে উদ্‌বিগ্ন হয়ে ছুটে গেল। ক্যাথেরিন বলেই মনে হ'ল মেয়েটিকে।

দুপুর রাত থেকেই কাদা ভেঙে চলেছে সে। সাভাল কামরায় ঢুকে তাকে বিছানায় দেখে ঘুষি মেরে ফেলে দেয়। সে চেঁচিয়ে উঠে বলে, যদি সে দরজা দিয়ে নিজে না বেরিয়ে যায়, তাকে সে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

পোষাক পরা হয়নি, চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে নেমে এসেছিল। তখন তার দেহ লাথি খেয়ে-খেয়ে থেঁতলানো, তবু নেমে এল। শেষে একেবারেই তাকে বাড়ির বার করে দিলে সাভাল। এ এক নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ—মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। এতে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। একখানা পাথরের উপর বসে বাড়ি-খানার দিকে চেয়ে রইল। আশা, বুঝি ভিতরে ডেকে নেবে। সাভাল নিশ্চয়ই তার দিকে তাকিয়ে আছে—তাকে কাঁপতে দেখে নিশ্চয়ই ভিতরে আসতে বলবে। বলবে না—ও-যে পরিত্যক্ত জীব—কেউ তো ওকে ডেকে নেবার নেই!

দু'ঘণ্টা পরে সে মনস্থির করলে। তখন সে ঠাণ্ডায় জমে গেছে, পথে ছুঁড়ে-ফেলা কুকুরের মতোই সে অচল। মঁতসু ছেড়ে সে চলল, আবার ফিরেও এল। কিন্তু পথ থেকে ডাকবার সাহস নেই। কড়া নাড়বারও না। অবশেষে সিধে সড়ক ধরে চলতে লাগল। ধাওড়ায় ফিরে যাবে বাপ-মার কাছে। কিন্তু সেখানে পেঁছেই, হঠাৎ এমন লজ্জা পেলে যে বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটে পালাল। কি জানি কে দেখে ফেলে এই তার ভয়। কিন্তু তখন বন্ধ খড়খড়ি শার্সির আড়ালে সবাই ঘুমে বিভোর। তারপর থেকে শুধু ঘুরে মরছে। সামান্য শব্দ শুনে আঁতকে উঠছে, আবার ভয়ও আছে হয়তো কেউ এসে তুলে নিয়ে মার্সিয়েনের বেশ্যালয়ে চালান দেবে। ক'মাস ধরে তো এই দুঃখই

ওকে ক্রমাগত হানা দিয়েছে। দু-দুবার লা-ভোরোতে এসে পড়ল, রক্ষীদের জোরালো চীৎকার শুনে রুদ্ধশ্বাসে পালিয়েও এল। বারে বারে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, কেউ তার অনুসরণ করছে কিনা। রিকুইলারের গলি সবসময়েই মাতালে ভরতি, কিন্তু তবুও সে ফিরে এল সেখানে। কয়েক ঘণ্টা আগে যাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে—তারই সঙ্গে আবার দেখা হবে—এই তার ক্ষীণ আশা।

সাভাল সকালে কাজে নামবে একথাও তার মনে আছে। ক্যাথেরিন তাই আবার ঘুরে-ফিরে পিটেই এল। কিন্তু সে জানে, তাকে কিছু বলা বৃথা। ওদের ভিতরে সব কিছু চুকেবুকে গেছে। জাঁ-বার্তে সমস্ত কাজ বন্ধ। সাভাল তো দিব্যি পেড়ে বলেছে, সে যদি লা ভোরোতে কাজে যায়, তার গলা টিপে মারবে। তার ভয়, হয়তো ক্যাথেরিন তাকে সেখানে ফ্যাসাদে ফেলবে। তাহলে কি করবে সে? আর কোথায় যাবে, উপোস করে মরবে—নয়তো প্রতিটি পথিকের নিষ্ঠুরতার শীকার হবে? নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল, কাদা-জলের গর্তে বার বার পিছলে পড়ল। পায়ে ব্যথা, কাদা কোমর অবধি। তুষার গলে গলে পথ এখন কাদার নদী। সে সাঁতরে চলেছে তো চলেছেই—একখানা পাথর দেখে একটু জিরিয়ে নেবারও তার সাহস নেই।

দিনের আলো ফুটে উঠল। ক্যাথেরিন পিঠখানা দেখেই সাভালকে চিনতে পারলে। সে সাবধানে পিটের পাড় ঘুরে চলেছে। কাঠ-কুঠরোর আড়াল থেকে বেবের্ত আর লিদিও নাক বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। এইখানেই ওরা রাত কাটিয়েছে। বাড়ি ফেরেনি। জাঁলিনের হুকুম ছিল তার জন্যে অপেক্ষা করার। আর সে কি না খুনের নেশা কাটাবার জন্যে রিকুইলারে ঘুমে বিভোর! তাই দুটি ছেলেমেয়ে এ-ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল। এমনি করেই ঠাণ্ডায় তারা চাঙ্গা হয়েছে। হাওয়া বাদাম আর ওককাঠের তক্তার ভিতর দিয়ে বয়ে এসেছে, আর ওরা খেয়েছে গড়াগড়ি। এযেন কাঠুরের পরিত্যক্ত কুঁড়ের কাঠ-কুটরোর গাদায় রাত কাটানো আর কি! খুদে বৌয়ের মত তাকে যে দুর্ভোগ সইতে হয় লিদি তা মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় না। সর্দারের কাছ থেকে ঘুষি খেয়ে বেবের্তের গাল ফুলে ওঠে, অভিযোগ জানাবার তারও মুরোদ নেই। কিন্তু এবার সর্দার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে—তার ক্ষ্যাপামিতে প্রতিপদে ওদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে, কিন্তু লুটের ভাগ কিছুই দিচ্ছে না, তাই তারা বিদ্রোহ করেছে। পরস্পরকে চুমু খেয়ে জানিয়েছে বিদ্রোহ—যদিও সর্দারের নিষেধ, তবু খেয়েছে। অতর্কিতে ঘুষি পড়বার ঝুঁকিও ছিল। সে তো বলে গিছল শীগ্‌গিরই ফিরবে। তবু নিষ্পাপ দুই শিশু পরস্পরকে করেছে চুম্বন—তাদের দীর্ঘদিনের নিষ্ফল সোহাগ ঢেলে দিয়েছে সেই চুম্বনে। তাদের সুকোমল, আত্মনিবেদিত হৃদয় মিলিত হয়েছে। এমনি করেই তারা সারা রাত ধরে চাঙ্গা হয়ে রয়েছে। এই গর্তে সারা রাত কাটিয়ে তারা সুখী—এমন সুখ বুঝি জীবনে পায়নি। এমন কি সন্ত বার্বের পর্বের পরেও না—তখন তো সবাই মদ খায় আর পেট পুরে খেয়ে খুশী হয়, সুখী হয়।

হঠাৎ বাঁশীর শব্দে ক্যাথেরিন চমকে উঠল। সে উপরে তাকিয়ে দেখলে, রক্ষীরা বন্দুক বাগিয়ে ধরেছে। এতিয়েঁ ছুটে এল। বেবের্ত আর লিদি গুপ্ত ডেরা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। দিনের আলোয় সুস্পষ্ট হয়ে

উঠছে। দলে দলে পুরুষ আর নারী ধাওড়া থেকে ছুটে আসছে। ক্রোধে তারা সজোরে হাত নাড়ছে।

পাঁচ

লা ভোরোয় ঢোকার সবগুলি পথ বন্ধ। শুধু একটি দরজা খোলা। সেখানে ষাটজন সিপাহী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মোতায়েন। পিটের উপরে যাবার এই-ই পথ। একগাদা সরু সরু সিঁড়ি ভেঙে উপরে যেতে হয়—তারপরেই বাতিঘর আর সর্দারের কামরা।

সিপাহীদের সর্দার দু'সারে তাদের দেয়ালের পাশে পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—যাতে পিছন থেকে তারা আক্রান্ত না হয়।

প্রথমে ধাওড়ার মজুরেরা দূরে সরেই রইল। পঁয়ত্রিশজনের বেশী হবে না। নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্কে তারা রত।

মেয়ু-বৌ এসেছে সবার আগে। একেবারে এলোচুলে এসেছে। তাড়াতাড়ি একখানা রুমাল বেঁধে নিয়েছে মাথায়। এস্তেল তার কোলে ঘুমিয়ে আছে। সে ভীষণ স্বরে বার বার বলছে,

কাউখ্‌খে ঢুকতি দিয়ো না, কাউখ্‌খে বেরুতি দিয়ো না। সবাইকে ভিতরে পুরে ঘেরাও করে রাখ!

মেয়ুও তার বৌ-এর কথায় সায় দিচ্ছে। এদিকে বুড়ো মোকে রিকুইলার থেকে এসে গেল। ওরা ওকে বাধা দিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে পেড়াপীড়ি করছে। সে বললে, তার ঘোড়াদুটো আগের মতোই দানাপানি খাচ্ছে, তারা বিপ্লবকে থোড়াই কেয়ার করে। তা ছাড়া একটা ঘোড়া মারা গেছে, তাকে এখন গিয়ে সেটা তুলতে হবে। এতিয়েঁ কোনরকমে বুড়ো সহীসকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলে। সিপাহীরা তাকে পিটে ঢুকতে দিলে। পনেরো মিনিট পরেই ধর্মঘটীদের দল বাড়তে লাগল। তাদের হুমকিও বাড়ছে। একতলার একটা মস্ত দরজা খুলে গেল। কয়েকটি লোক মরা ঘোড়ার লাশটাকে টেনে বার করছে। লাশটা এখনো দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধা। তারা ওটাকে তুষার-গলা ঘোলাটে জলের গর্তে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সবাই এমন অবাক যে তারা লোক ক'জনকে বাধাও দিলে না। দরজা আগলেও দাঁড়ালে না। সবাই চিনেছে ঘোড়াটাকে। মাথাটা শক্ত হয়ে গেছে, একপাশে ঝুলে পড়েছে। ফিসফিসানি উঠল।

এম্পেৎ না? হাঁ, এম্পেৎই তো।

এম্পেৎই বটে। সে মাটির তলার জীবনে অভ্যস্ত হতে একেবারে পারেনি। গুমরে মরেছে, কাজ করতে চায়নি। দিনের আলো সে হারিয়েছে, তারই কামনা তাকে দিয়েছে ব্যথা। পিটের প্রধান বাতাইল বন্ধুভাবে দু-একবার নিজের গা দিয়ে তার গা ঘষে দিয়েছে, তার গলায় দিয়েছে সুড়সুড়ি—দশ বছর সে আছে মাটির নীচে—তাই তার আত্মসমর্পণের কিছুটা ভাগ ওকে দিয়েছে। কিন্তু আদর পেয়ে আরো বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে এম্পেৎ। যখনি তার অন্ধকারে বুড়িয়ে-যাওয়া বন্ধু তার কানে কানে গোপন কথা বলতে গেছে, তার গা উঠেছে

শিউরে—চামড়া উঠেছে কেঁপে কেঁপে। দেখা হতেই তারা নাক দিয়ে শব্দ করে উঠেছে—মনে হয়েছে ওরা যেন শোক করছে। বুড়ো ঘোড়া কেঁদেছে তার আলোর কথা আর মনে পড়ে না বলে, আর তরতাজা অল্প বয়সী ঘোড়া কেঁদেছে, সে তাকে ভুলতে পারে না তাই।

আস্তাবলে ওরা পাশাপাশি রয়েছে, একই আস্তানায় মাথা নুইয়ে ঢুকেছে, উভয়ের নিঃশ্বাস এসে উভয়ের লেগেছে নাসারন্ধ্রে, নিজেদের অবিরাম দিবালোকের স্বপ্নের অদল-বদল করেছে—কল্পনায় দেখেছে সবুজ ঘাস, সাদা সড়ক, অনন্ত আলোর সোনালী মায়া। তারপর এম্পেৎ যখন ঘামে জবজবে হয়ে নিজের খড়ের গাদায় মুমূর্ষু হয়ে লুটিয়ে পড়েছে, বাতাইলি তার কাছে গিয়ে গা শুঁকেছে হতাশ হয়ে। এ তো শোঁকা নয়, বুঝি ফোঁপানি—কান্না। সে অনুভব করেছে, বন্ধ হাওয়ায় শিটিয়ে আছে, খনি তার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে তার শেষ আনন্দটুকু। উপর থেকে নেমে এসেছিল বন্ধু, গায়ে তার খোসবাই, তার যৌবনের উন্মুক্ত হাওয়ায় মাতামাতির কথা সে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। তাই সে যখন দেখলে, সেই বন্ধু আর নড়ছে-চড়ছে না, সে লাগাম ছিঁড়ে ফেলে ভয়ে ডেকে উঠল।

মোকে এক সপ্তাহ আগেই বড় সর্দারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। কিন্তু এসময় একটা রুগ্ন ঘোড়ার কথা নিয়ে কে মাথা ঘামায়। কিন্তু এখন তো লাশটা সরানো দরকার। গত কাল মোকে আর দুটি লোক এক ঘণ্টা ধরে এম্পেৎকে দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধেছে। বাতাইলকে জুতে দেওয়া হয়েছে যাতে সে স্যাফটে-এ তাকে টেনে তুলে দেয়। আস্তে আস্তে ঘোড়াটা তার মৃত বন্ধুকে সরু কাঁথির ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিচ্ছে—লাশের চামড়া ছড়ে যাবার ভয়ও তার আছে। লাশটা যাবে ভাগাড়ে, মাংস ছড়ে যাচ্ছে দেখে তবু তার দুঃখ, সে বারবার মাথা নাড়ছে। পিটের মুখে এসে ওরা যখন তার লাগাম খুলে দিলে, সে বিষণ্ণ চোখ মেলে চেয়ে রইল। ওঠাবার তোড়জোড় বুঝি দেখছে। দেহটা ঠেলে তুলছে আড়াআড়ি দুটি শিকের উপর, দড়াদড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে কেজের নীচে। এবার কুলিরা ঘণ্টি বাজিয়ে দিলে—সে মাথা তুলে দেখলে তার বন্ধু চলে যাচ্ছে। প্রথমে আস্তে আস্তে চলল; তারপরে অন্ধকারে যেন ছুটে মিলিয়ে গেল। চিরদিনের জন্য অন্ধকূপের উপরে সে চলে গেল। গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাতাইল, জন্তুর আবছা স্মৃতির হয়তো রোমন্থন চলছে—মাটির উপরের কোন কথা হয়তো মনে পড়ছে। কিন্তু সব শেষ; আর তো সে তার সাথীকে দেখতে পাবে না, সেও অমনি পুঁটলি-বাঁধা হয়ে একদিন উপরে উঠে যাবে। পা কাঁপছে তার, দূর দেশ থেকে আসছে বিশুদ্ধ হাওয়া, গলা বুজে এল। যেন মাতাল হয়েছে সে, টলতে টলতে ফিরে এল আস্তাবলে।

উপরে ইয়ার্ডে কুলিরা এম্পেতের দেহটাকে ঘিরে বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি স্ত্রীলোক আস্তে আস্তে বললে,

যাহোক, মানুষ শুধু ইচ্ছে করেই ওখানে যায়, জানোয়ারদের তো সে বালাই নেই।

নতুন ধাওড়া থেকে আবার জনতা ধেয়ে এল, এবার নেতা লেভাক তার পিছনে লেভাক-বৌ আর ব্যুতেলুপ। লেভাক চেঁচিয়ে উঠল।

বেলজিয়াম মজদুরলোগকো মার ডাল! এখানে দালালি চলবে না। খুন, খুন!

সবাই ছুটে এগিয়ে এল, এতিয়েঁ তাদের থামিয়ে দিলে। সিপাহীদের সর্দারের কাছে সে এগিয়ে গেল। ঢ্যাঙা, রোগা যুবক, বয়েস আঠাশের বেশী হবে না। ক্ষেপে গেছে, তবু দৃঢ় তার ইচ্ছাশক্তি। সে গিয়ে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল, তাকে নিজের দলে টানতে চেষ্টা করছে। তার কথার কি ফল হয় তাই দেখছে। এই অনর্থক হত্যাকাণ্ডে লাভ কি? কুলিদের তো ন্যায্য দাবি। ওরা ভাই, একই সঙ্গে ওরা মেহনৎ করবে। এতিয়েঁ যখন লোকরাষ্ট্রের কথা তুললে, সিপাহীদের সর্দার অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু তবু ফৌজী কেতা বজায় রইল। হঠাৎ বলে উঠল,

সরে দাঁড়াও। আমার কর্তব্য করতে বাধ্য কোরো না।

তিন-তিনবার এতিয়েঁ চেষ্টা করল, কিন্তু তার পিছনের সাথীরা এখন চঞ্চল। খবর রটে গেছে মঁসিয়ে হানাবু পিটে এসেছেন। তাই কে-একজন বললে, ওকে ঘাড় ধরে নামিয়ে আনা হোক; দেখি ও নিজের কয়লাটুকুও খুঁড়ে বার করতে পারে কিনা। বাজে গুজব। শুধু নিগ্রেল আর দাঁসার সেখানে আছে। ওরা দুজনে মুহূর্তের জন্য উপরের জানালায় এসে দাঁড়াল। সর্দার পেছনে, পিয়েরোঁ-বৌয়ের সঙ্গে সেই কেলেঙ্কারির পর থেকে সে কেমন মিইয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ার তীক্ষ্ণ চোখ মেলে দেখছে জনতাকে, মানুষ আর সব-কিছুকেই সে যেমন অবজ্ঞার চোখে দেখে, তেমনি অবজ্ঞাভরেই হাসছে। টিটকারি উঠল। তারা দুজনেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন শুধু দেখা যাচ্ছে সেখানে সুভেরিনের বিবর্ণ মুখখানি। তার এখন কাজের পালা। সারা ধর্মঘটের মধ্যে একদিনের জন্যও নিজের ইঞ্জিনটি ছেড়ে নড়েনি। এখন সে আর কথা বলে না—কোন এক বিষয় নিয়েই ভাবে—তার ম্লান চোখে বুঝি সেই ভাবনা ইস্পাতের ঝিলিক মেরে যায়।

সরে দাঁড়াও! সিপাহীদের সর্দার আবার চীৎকার করে উঠল। আমি কিছু শুনতে চাই না। আমার উপরে হুকুম এই পিট রক্ষা করতে হবে, আর আমি তা রক্ষা করবই। আমার সিপাহীদের ঠেলো না, কি করে তোমাদের তাড়িয়ে দিতে হয় তা আমি জানি।

মজুরের ভিড় বাড়ছে, উদ্বেল হয়ে উঠছে। সিপাহীদলের ক্যাপটেনের স্বর তাই দৃঢ় হলেও ক্রমেই উদ্বেগ বাড়তে লাগল। বিবর্ণ হতে বিবর্ণতর হয়ে এল তার মুখ। দুপুরের আগে বদলির আশা নেই। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। একজন মাল-কাটাকে সে পিট থেকে পাঠিয়েছে বাড়তি ফৌজ আনতে।

চীৎকারের ঝড়ে জবাব এল।

বিদেশীলোগ মুর্দাবাদ। বেলজিয়ামকা দালাললোগ মুর্দাবাদ! মোদের পিটের মালিক তো মোরাই হতে চাই।

এতিয়েঁ হতাশ হয়ে সরে গেল। তাহলে উপসংহার এল ঘনিয়ে—এখন আর লড়া আর মরা ছাড়া উপায় নেই। আর সাথীদের সে বাধা দেবার চেষ্টা করলে না। খুদে পল্টনের উপর চড়াও হ'ল জনতা। সংখ্যায় তারা প্রায় চারশো—কাছাকাছির ধাওড়াগুলো থেকেও ছুটে আসছে। সবারই মুখে এক

জিগির। মেয়্‌ আর লেভাক সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে ভীষণ স্বরে বললে,

তোমরা চলে যাও। তোমাদের সাথে তো মোদের ঝগড়া নেই। চলে যাও।

মেয়্‌-বৌ বললে, তোমাদের দিয়ে মোদের কি কাম! মোদের কাজ মোরা করব।

পেছন থেকে লেভাক-বৌ চীৎকার করে উঠল আরো জোরে—

মোরা কি তোমাদের গিলে খেয়ে তবে পথ করে যাব? ভাগ্‌—ভাগ্‌ এখান থেকে।

লিদির খ্যানখেনে স্বরও শোনা গেল। ঠেসাঠেসি ভিড়ের ভিতর থেকে ভেসে এল স্বর—সে আর বেবের্তে ভিড়ে বুঝি এমনি করেই চাপ্গা হয়ে নিচ্ছে।

ওরে মোদের ভীতুয়া হারামীদের দ্যাখ্‌ না!

ক্যাথেরিন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে। দেখছিল আর শুনছিল। এই হিংসার উন্মত্ততায় সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। তার নিয়তি তাকে বারবার বুঝি এনে এই উন্মত্ততার মধ্যেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। ভোগান্তি কি তার কম হয়েছে? কি দোষ সে করেছে, যাতে তার পোড়া বরাত তাকে এক মুহূর্তও বিরাম দেবে না? কাল সে ধর্মঘটের উন্মাদনা কি জানতও না, সে শুধু ভাবত প্রাপ্য কিল-ঘুষি তো খেতেই হয়—তার উপরে সাধ করে আবার এ হাঙ্গামা পোয়াতে যাওয়া কেন? এতো নিষ্ফল ব্যাপার। এখন তো তার বুক বিদ্বেষে ফুলে ফুলে উঠছে। যখন দুজনে একা থাকত তখন প্রায়ই তো বলতো নানা কথা। সেগুলি মনে পড়ল। এখন পল্টনের কাছে সে কি বলছে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল। তাদের সে সাথী বলে ডাকছে, সাথীর মতোই ব্যবহার করছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে তারাও অগণিত জনতার স্বগোত্র—তাদের তো ঐ জনতার পক্ষেই যাওয়া উচিত—যারা ওদের দুর্দশার সুযোগ নেয় তাদেরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত।

জনতার ভিতরে সাড়া পড়ে গেল। এক বুড়ী এল ছুটে। বুড়ী বুল, ভীষণ রোগা তার শরীর, গলা আর হাত যেন হাওয়ায় উচিঁয়ে আছে। এত জোরে আসছে যে তার পাকা চুলগুলো চোখের উপর এসে পড়ছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বললে বুড়ী, হেই ভগমান, ঐ দুশমন পিয়েরোটা তয়-খানায় পুরে রেখেছেল গো!

অপেক্ষা না করে সে সিপাহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর কয়লা-কালো মুখ থেকে উগ্‌রে দিচ্ছে গালাগাল।

ওরে নচ্ছারের দল। ওরে নোংরা আস্তাকুঁড়। মনিবের পা চাটতে তো তৈরী, শুধু মোদের মতো গরীব-গুরবো দেখলেই তোদের যত জারিজুরি!

আর সবাইও তার সঙ্গে ভিড়ে গেল। অপমানের উদ্গার উঠল, ছুটল। এখনো কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলছে, সাবাস ভাই সেপাই! তোমাদের সর্দারটাকে স্যাফট্‌ গলিয়ে ফেলে দাও না! শীগ্‌গিরই অন্য জিগির থেমে গেল। শুধু এক চীৎকার উঠছে—গোল্লায় যাক ঐ লাল পাজামার দল! সিপাহীরা ভ্রাতৃত্বের আবেদন শুনেছে বোবা হয়ে, তাদের মন জয় করে নেবার সৌহৃদ্যে তারা ছিল অচল অটল, গালাগালের শিলাবর্ষণেও তারা তেমনিই আছে। তাদের পিছনে সর্দার টেনে বার করেছে তার তলোয়ার। জনতা তাদের উপর ক্রমেই চেপে

পড়ছে—তাদের বুঝি বা দেয়ালের সঙ্গে পিষেই ফেলবে। সে এবার বন্দুকে সঙ্গীন চড়াতে হুকুম দিলে। সিপাহীরা হুকুম তামিল করলে। ধর্মঘটীদের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত হ'ল দু'সারি ইস্পাতের ছুঁচলো ফলা।

বুড়ী বুল পেছু হটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বেজম্মার দল! ওরে—

আবার চেপে পড়েছে জনতা। উত্তেজনায় তারা অধীর, মৃত্যুর কথা তাদের মনে নেই। মেয়েরাও সামনে এগিয়ে এসেছে। মেয়ু-বৌ আর লেভাক-বৌ চেঁচাচ্ছে,

মার্—মোদের মার্! তবু তো মোদের হকের দাবি ছাড়বনি!

লেভাক দু'টুকরো হবার ভয় তুচ্ছ করে তিন-তিনটে সঙ্গীন ধরে ফেলল। সে টানছে, রাইফেল থেকে ছিনিয়ে আনতে চাইছে গাঁথা সঙ্গীন। দশগুণ তার জোর বেড়ে গেছে। রাগে সে দোমড়াচ্ছে সঙ্গীনগুলি।

ব্যতেলুপ সাথীর অনুসরণ করে বিপন্ন। সে একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে।

মেয়ু বললে, যদি তোরা ভালমানষের পুত হোস, আয়—একবার চোখ চেয়ে দ্যাখ।

সে কোট খুলে সার্টটা তুলে ফেললে। খোলা বুক দেখাচ্ছে, লোমশ বুক, কয়লার উল্কি আঁকা যেন। সঙ্গীনের সারের উপর বুক পেতে ঝুঁকে পড়েছে। সিপাহীরা পিছু হটতে বাধ্য হ'ল। সে যেন সাহসে আর স্পর্ধায় ভয়ংকর। একজন বুকে খোঁচা দিতেই সে ক্ষেপে গেল। গভীর হোক তার ক্ষত, পাঁজর ভেঙে যাক—সে তো তাই চায়।

ওরে ভীতুয়ার দল, তোদের তো সে মুরোদ হবে না! মোদের পিছনে আছে দশহাজার মানুষ। হ্যাঁ, তোরা খুন করতে পারিস—আরো দশ হাজার মানুষকে খুন করতে পারলে তবে তো তোদের পথ সাফ হবে।

সিপাহীদের অবস্থা সংকটাপন্ন। তাদের উপরে কড়া হুকুম—অবস্থা একেবারে চরমে না উঠলে যেন হাতিয়ার ব্যবহার না করে। কিন্তু এই পাগলদের কি করে ওরা রুখবে—ওরা তো নিজেরাই সঙ্গীন বুকে বেঁধাবে? তাছাড়া তিলধারণের ঠাঁই নেই—তারা এখন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর পিছু হটা চলে না। মুষ্টিমেয় মানুষ মজুরদের এই উত্তাল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সর্দারের সংক্ষিপ্ত হুকুম শান্তভাবেই তামিল করছে। সর্দার অস্থির, ঠোঁটে ঠোঁট দৃঢ় সংবদ্ধ। শুধু এক তার ভয়—এই গালাগাল শুনে তার পল্টনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। এরই মধ্যে এক ঢ্যাঙা অল্প বয়েসী সার্জেন্ট—সবে তার গোঁফের রেখা উঠেছে—সে তো কেমন যেন চোখ ঘোরাচ্ছে। তার পাশেই—বহু অভিযানে পাকাপোক্ত এক ঝানু সিপাহী তার সঙ্গীনখানা একগাদা খড়ের মতো দুমড়ে যেতে দেখে কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছে। আর একজন—হয়তো রঙরুটই হবে—এখনো খামারবাড়ির গন্ধ যায়নি গা থেকে—পাজী আর দুশমন গাল শুনে তার তো মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে! তবুও গালাগাল থামছে না ঘুষি দোলাচ্ছে জনতা আর গাল দিচ্ছে। গালাগাল আর শাসানি-ধমকানি যেন ঝোড়া-ভরতি হয়ে ওদের মুখের উপর গিয়ে পড়ছে। এমনি বোবা হয়ে সামরিক শৃঙ্খলতার নীরব গর্বে তারা দাঁড়িয়ে আছে গোমড়া মুখে—হুকুম আছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

সর্দার রিশোম পল্টনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার সাদা মাথা ভাবাবেগে নোয়ানো। সে এসেই জোরে বলে উঠল,

দোহাই-ঈশ্বরের দোহাই! এ তো বোকার মতো কাজ হয়েছে। এ তো চলতে পারে না।

সে মজুর আর সঙ্গীনের সারের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

সাঙাৎরা শোন, তোমরা তো জান, আমি এক পুরানো মজদুর, বুড়া মজদুর। চিরদিনই আমি তোমাদের দলে। বহুৎ আচ্ছা। ও'রা যদি তোমাদের সঙ্গে ভাল ব্যাভার না করেন, আমি মালিকদের দুটো হক্ কথা শুনিয়ে দেব। কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই ভালমানুষদের গাল দিয়ে কি হবে—আর এতে তোমাদেরই যে পেট চিরে যাবে।

ওরা শুনছে, দ্বিধা এসেছে মনে। উপরে আবার দুর্ভাগ্যক্রমে নিগ্রেলের বেঁটেখাটো চেহারা দেখা দিল। তার মনে ভয়; নিজে সাহস করে এগিয়ে না এসে সর্দারকে পাঠিয়েছে—অভিযোগ তারই প্রাপ্য। তাই সে কি যেন বলতে গেল। কিন্তু ভীষণ গোলমালে তার স্বর ডুবে গেল। হতাশ হয়ে ঘাড় নেড়ে জানালা থেকে সে মিলিয়ে গেল। রিশোম এবার নিজের নামে ওদের কাকুতি-মিনতি জানাতে গিয়ে নিষ্ফল হ'ল। সে এত বললে, সাথীরা মিলে-মিশে একটা বিহিত করবে—কিন্তু সাথীরা তাকে বাধা দিলে। তার প্রতি ওদের সন্দেহ, কিন্তু রিশোম নাছোড়বান্দা—সে তবু সাথীদের সঙ্গে রয়েই গেল।

যা হয় হোক, তোদের মাথার সাথে সাথে মোর মাথাও গুঁড়িয়ে যাক। তোরা এত বোকা, তোদের ছেড়ে তো যাব না!

এতিয়ের কাছে এবার সে সাহায্য চাইলে। ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে সব কথা। কিন্তু সেও অক্ষম, তেমনি ভাবই দেখালে। বড় দেরি হয়ে গেছে। এখন পাঁচশোর উপরে জনতা। বেলজিয়ামের কুলিদের তাড়িয়ে দিতে যে ক্ষ্যাপা মানুষের দল এসেছিল, তাদের সঙ্গে এবার জুটেছে কৌতূহলী মানুষ। কেউবা এসেছে লড়াই নিয়ে রঙ্গ করতে, কেউবা রঙ্গ উপভোগ করতে। একটা দলে জাচারি আর ফিলোমেনকে দেখা গেল—তারা যেন স্থির হয়ে অভিনয় দেখছে। সঙ্গে আচিলি আর দেসারিকেও নিয়ে এসেছে। আর-এক ধারা বয়ে এল রিকুইলার থেকে—এসে পেঁছিল। এর মধ্যে আছে মোকে-ছোঁড়া আর মোকে-ছুঁড়ী। মোকে-ছোঁড়া ছুটে এসে দোস্ত জাচারির পিঠ চাপড়ে দিলে। আর মোকে-ছুঁড়ী—ক্ষেপে উঠে একেবারে পয়লা সারের বিক্ষুব্ধ জনতার ভিতরে মিশে গেল। সিপাহীর সর্দার ঘন ঘন তাকাচ্ছে মঁতসু সড়কের দিকে। বাড়তি ফৌজের জন্য অনুরোধ সে জানিয়েছে, কিন্তু এখনো তারা এসে পেঁছয়নি। ষাটজন সিপাহী জনতাকে আর বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারবে না। হঠাৎ তার মনে হ'ল, কৃত্রিম উপায়ে জনতার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। সে তাই রাইফেলে গুলী ভরতি করার হুকুম দিলে। সিপাহীরা হুকুম তামিল করলে; কিন্তু এতে বিক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে উঠল জনতা, উত্তেজনায় ভরপুর।

দ্যাখ্; দ্যাখ্—ওরা চাঁদমারি করতিছে! বুড়ী-বুল, লেভাক-বৌ আর সবাই ঠাট্টা করতে লাগল।

মেয়ু-বৌ এস্তেলকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছে (এরই মধ্যে তার ঘুম ভেঙে গেছে, সে কাঁদছে), সে এত কাছে সরে এল যে, সার্জেন্ট তাকে শুধালো, ঐ বাচ্চাটাকে কাঁখে নিয়ে সে এসব কি করতে যাচ্ছে।

জবাব এল, তোর কাম তুই কর! যদি তাকত থাকে তো চালা না গুলী।

পুরুষরা মাথা নাড়ছে। ওদের উপর গুলী চালানো হবে, ওরা বিশ্বাসই করে না।

লেভাক বললে, ওদের কাছে তো শুধু ছর্‌রা আছে।

মেয়ু চেঁচিয়ে উঠলে, আমরা কি কসাক নাকি! ফরাসী দেশের মানুষের উপর অতো গুলী চালাতে হয় না!

অনেকে বললে—ক্রাইমিয়ায় লড়াই করে এসে গুলীর ভয় আর করে না। রাইফেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা।

সেই মুহূর্তে যদি গুলী চালানো শুরু হোত, তাহলে জনতা একেবারে ছিন্নভিন্ন, দলিত-পিষ্ট হয়ে যেত।

পয়লা সারে মোকে-ছুঁড়ী রাগে ফুঁসছে। মুখে তার রা সরছে না। তার ভাবনা—সিপাহীরা বুঝি মেয়েদের পেট চিরে দেবে। যত অশ্লীল গালাগাল সব সে ওদের উপর উজাড় করে দিলে। আর তো কিছু মনে আসছে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, চরম অপমান সে করবে এই পল্টনকে—ছুঁড়ে মারবে তার চরম হাতিয়ার। সে তার পেছনটা দেখিয়ে দেবে। দু'হাত দিয়ে ঘাগরা তুলে তার বিরাট সুগোল নিতম্ব দেখিয়ে দিলে—যত দূর সম্ভব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুললে।

এই নে, দ্যাখ—তোদের জন্যি রাখলাম—ওরে হারামীরা, তোদের মুখের চেয়ে ঢের ভাল।

সে ডিগবাজী খাচ্ছে, লাফাচ্ছে—সবাই দেখতে পাচ্ছে তার বিরাট পাছা। প্রতিবারে দুলিয়ে বলছে,

এই লে তোদের সর্দারের জন্য—এই লে তোদের সার্জেন্টের জন্য। আর এই লে তোদের সেপাইদের জন্য!

হাসির ঝড় উঠল। বেবের্ত, লিদি তো হেসে হেসে অস্থির। এমন কি এতিয়েঁও এই অপমান প্রদর্শনে তারিফই করলে—যদিও মনে তার তখন আশংকা। এবার সবাই টিটকারি দিতে লাগল, রঙ্গপ্রিয় আর উন্মাদের দল এক হয়ে মিশে গেল—সবাই যেন নোঙরামির ধারায় স্নান করে উঠেছে। শুধু ক্যাথেরিন পুরানো পচা কাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। বুকে জাগছে ঘৃণা, বুক তার ফেটে যাচ্ছে।

ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। সিপাহীর সর্দার ভাবলে, ক'জন লোককে গ্রেফতার করে সিপাহীদের উত্তেজনা কিছুটা কমাতে পারবে। মোকে-ছুঁড়ী অমনি লাফিয়ে ক'জনের ঠ্যাং গলিয়ে পালিয়ে গেল। লেভাক সমেত তিনজন মজুরকে বিক্ষুব্ধ জনতার ভিতর থেকে গ্রেফতার করে সর্দারের কামরায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। নিগ্রেল আর দাঁসার উপর থেকে ডেকে সিপাহীর সর্দারকে ভিতরে আসতে বললে। তারা পরামর্শ দিলে সেও তাদের মত চার দিকে গড় দিয়ে বসে থাকুক। কিন্তু সর্দার নারাজ। তার ধারণা—এই দালান আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এর দরজায় দরজায় নেই তালা।

প্রতিরোধই যদি না করা যায়, তাহলে শুধু শুধু নিরস্ত্র হওয়ার অপমান সে সইবে কেন? এরই মধ্যে তার খুদে পল্টন অস্থির হয়ে উঠেছে। এই কাঠের গোড়তোলা জুতো-পরা হতভাগ্যদের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া তো অসম্ভব। ষাট-জন সিপাহী দেয়ালে ঠেস দিয়ে গুলী পুরে দাঁড়িয়ে আছে জনতার মুখো-মুখী।

প্রথম ধর্মঘটীরা সরে গিয়েছিল নিঃশব্দে। পল্টনের শক্তির তাৎপর্য বুঝে তারা তখন হতবাক। এবার উঠল চীৎকার—বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়ে চীৎকার। বিভিন্ন স্বরে চীৎকার উঠল—ওদের ওরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেলেছে। সংঘবদ্ধ নয় জনতা, তবু তারা তখুনি ইঁটের পাঁজার দিকে ধেয়ে গেল। প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠেছে। এখানকার মাটিতে ইঁট তৈরী হয়—এখানেই পাঁজা করে পোড়ানো হয়। ছেলেমেয়েরা ছুটে ছুটে এক-একখানা করে নিয়ে আসছে ইঁট, মেয়েরা কোঁচড় ভরতি করে নিচ্ছে। প্রতি মেয়ের পায়ের কাছে জমা হয়ে আছে গুলীগোলা। এবার ইঁট ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল।

বুড়ী বুলই প্রথম লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজের হাড়সার হাঁটুর উপরে রেখে ইট ভেঙে নিয়ে দুহাতে দুখানা ছুঁড়ে মারলে। লেভাক বৌ তো মোটাসোটা নরম মানুষটি—তাই ইট ছুঁড়তে তাকে কাছে এগিয়ে যেতে হ'ল। ব্যুতেলুপের কাকুতি-মিনুতি সে মানলে না। এমন জোরে সে ছুঁড়লে, মনে হয় কাঁধের হাড়ই বুঝি নড়ে যাবে। ব্যুতেলুপ তাকে টেনে রাখতে যায়, বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। তার স্বামীকে তো এরই মধ্যে ওরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। মেয়েরা সবাই উত্তেজিত। মোকে-ছুঁড়ি নাদুস-নুদস ঊরু দুখানির উপরে ইট ভাঙতে চেষ্টা করে করে হাঁপিয়ে উঠেছে, ঊরু দিয়ে রক্ত ঝরছে। সে আর ভাঙার চেষ্টা না করে থান ইটই ছুঁড়ে সারতে লাগল। এমন কি ছেলেমেয়েরাও লড়ায়ে ভিড়ে গেছে। বেবের্ত লিদিকে শেখাচ্ছে কনুয়ের নীচ দিয়ে ইট ছোঁড়ার কসরৎ। এ যেন এক প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি, টুপ টাপ্ শব্দে পড়ছে। ভোঁতা শব্দ। এবার ক্যাথেরিন এসে দেখা দিলে এই উত্তে-জনাময় পরিবেশে। হাত দোলাচ্ছে শূন্যে, নাওজোয়ানী মেয়ে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারছে ইট। সবাইকে সে খুন করবে, এই তার সাধ—কিন্তু কেন করবে তা জানে না। এই যে দারিদ্র্যময় জীবন—একি শীঘ্রই শেষ হবে না? সে তো অনেক সয়েছে। মার খেয়েছে, তার মরদ তাকে ত্যাগ করেছে। কাদা ভরা পথে টহল দিয়ে বেড়িয়েছে পথের কুকুরের মতো। নিজের বাপের কাছে গিয়ে একটু খাবার কি এক ফোঁটা সুরুয়া চাইতে পারেনি। বাপও তো ওরই মতো উপোস করে মরছে। কোথাও ভালাই নেই; বরং দিন দিন খারাপ হয়েই উঠছে দশা, এতো সে জন্ম থেকেই দেখে আসছে। তাই ইট ভাঙছে, ছুঁড়ছে এলোপাথাড়ি। মনে শুধু তার এক কামনা—যাক—সব চুরমার হয়ে যাক। রাগে সে জ্বলে উঠেছে—কার চোয়াল ভাঙল কি থাকল তাতে তার পরোয়া নেই।

এতিয়েঁ এখনো সিপাহীদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার খুলি প্রায় ভেঙে গেছে। কান ফুলে উঠেছে। ফিরে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। ক্যাথেরিন উত্তেজিত হয়ে ছুঁড়ছে ইট। নিজের জীবন বিপন্ন করে

সে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওর উপর নজর রাখলে। ওরই মতো অনেকেই লড়াই দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। ওরা হাত তুলে খুটোর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মোকে-ছোকরা ঢিল ছোঁড়া নিয়ে মন্তব্য করছে। এ যেন বল ছোঁড়ার খেলা। সাবাস! হাঁকড়েছে বটে! যা—ফস্‌কে গেল! বরাতটাই খারাপ—এমনি ধরনের উক্তি করছে। তার ভারি আমোদ। জাচারিকে ঠেলা মেরে কি বলতে গেল। সে তখন ফিলোমেনের সঙ্গে ঝগড়ায় ব্যস্ত। আর্চিলি আর দেসারিকে সে থাবড়া কষিয়ে দিয়েছে। তাদের কাঁধে নিয়ে ভাল করে দেখাতে সে নারাজ। পিছনে সড়কে দর্শকের সারবন্দী ভিড়। টিলার ঢালে যেখান থেকে ধওড়ার হুদ্দা শুরু হয়েছে? সেখানে এসে জুটেছে বুড়ো বনেমোর —লাঠিতে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। মরচে রাঙা আকাশের পট-ভূমিতে তার নিশ্চল মূর্তির আদরাটি দেখা যায়।

ঢিল ছোঁড়া শুরু হতেই রিশোম এসে জনতা আর সিপাহীদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। এক দলকে সে অনুরোধ করছে, বোঝাচ্ছে আর-একদলকে। নিজের বিপদের ভয় তার নেই। কিন্তু মন তার ভাঙা, তাই গাল বেয়ে ঝরছে ধারা। গোলমালে ডুবে যাচ্ছে তার কথা—শুধু ধূসর গোঁফজোড়া ভিড়ের ভিতরে নড়তে দেখা যাচ্ছে।

ইট বৃষ্টি আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠল। পুরুষরা এবার মেয়েদের পন্থা ধরল।

মেয়ু-বৌ হঠাৎ চেয়ে দেখলে, পিছনে চুপ করে শূন্যহাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ু।

সে খেঁকিয়ে উঠল, কি হয়েছে গা তোমার? তুমি ভীতুয়া নাকি? তোমার সাঙাৎদের নিয়ে জেলখানায় পুরুক—তাই বুঝি চাও মরদ? মোর কাঁখে যদি এই বাচ্চাটা না থাকত—এক হাত দেখিয়ে দিতাম।

এস্তেল গলা জড়িয়ে ধরে আছে মার, চেঁচাচ্ছে, মেয়ু-বৌ তাই বুল-বুড়ী আর অন্য সবার সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারে নি। তার মরদ বুঝি তার কথা শুনতেই পেলে না। সে তাই কয়েক টুকরো ইট ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে মারলে।

দোহাই ভগমানের! ঐ ঢিল ক'টা তুলে নেবে নি? চাঙ্গা করতি কি মুখে থুথু দেব না কি?

মেয়ু রাগে জ্বলে উঠে কয়েকখানা ইট ভেঙে নিয়ে ছুঁড়ে মারলে। মেয়ু-বৌ জিভ নেড়ে চলেছে—মারছে কথার চাবুক। তার পিছনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর জিগির তুলছে। শিশু সন্তানকে তার বুকে চেপে ধরেছে কঠোর নিষ্পেষণে, তার জীবনীশক্তি বুঝি এমনি করেই ও নিঃশেষ করে দেবে। আর মেয়ু এগিয়ে চলেছে উত্তেজিত হয়ে—এবার সে রাইফেলের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

ইটবৃষ্টিতে এই খুদে পল্টন আড়ালে পড়ে গেছে। ওদের ভাগ্য ভাল যে ওরা অনেক উচুঁতে আছে, দেয়াল ঢিলে ঢিলে এখন ঝাঁজরা। কি করা যায়? পল্টনের সর্দার মুহূর্তের জন্য ভাবলে, বাড়ির ভিতরে হটে যাবে। কিন্তু জনতাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হবে—এই ভেবে তার বিবর্ণ মুখখানি লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তারও উপায় নেই। একটু নড়লে-চড়লেই ওদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে জনতা। একখানা ইট এসে তার টুপীর

চূড়াটা ভেঙে দিয়ে চলে গেল। কপাল বেয়ে ঝরছে রক্ত। কয়েকজন আহতও হয়েছে। সে বুঝতে পারলে, তার পল্টন এবার ধৈর্যের চরম সীমায় এসে গেছে। এখন প্রবৃত্তিগত আত্মরক্ষার ধাপে তারা—আর তো উপর ওয়ালার হুকুম মানবে না। আর হুকুমের রাশ মানছে না। সার্জেন্টটি হঠাৎ—'হা ঈশ্বর' বলে চেঁচিয়ে উঠল। বাঁ কাঁধটা আর একটু হলেই গিয়েছিল আর কি। তার চামড়া ছড়ে গেল একটা মস্ত ঢিলে, পাটের উপর ধোপার কাপড় আছড়াবার মতো শব্দ। রঙরুট সিপাইটির দু-দুবার ইটে ছড়ে গেছে দেহ, বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে গেছে, হাঁটুও ব্যথা। আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়? একখানা ইঁট তকমা-আঁটা প্রাচীন সিপাহীটির তলপেটে এসে ঠিকরে পড়ল। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ, সে সরু সরু হাতদুখানা দিয়ে রাইফেল বাগিয়ে ধরল। তিন তিনবার সর্দার গুলী ছোঁড়ার হুকুম দিতে গেল। উদ্বেগে গলা তার বোজা; এক অনন্ত সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে মনে, ওলট-পালট হয়ে গেছে ভাবনা—কর্তব্যের চেতনা, মানুষ আর সিপাহী হিসেবে যত বিশ্বাস সব এখন লুপ্ত। ইটবৃষ্টি প্রচণ্ডতর হয়ে উঠছে, সে মুখ খুললে, বুঝি চীৎকার করে উঠবে;—গুলী চালাও! এরই মধ্যে রাইফেলগুলো আপনা-আপনি ছুটে গেল। প্রথমে তিনবার, তার পরে পাঁচবার—তার পরে বারবার। বহুক্ষণ পরে আবার নীরবতায় বেজে উঠল একটিমাত্র শব্দ, মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেছে জনতা আর পল্টন, সত্য সত্যই পল্টন ছুঁড়েছে গুলী।

জনতা নিশ্চল। বুঝি তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। এবার উঠল তীক্ষ্ন চীৎকার। বিউগলে বিরতির ভেঁপু বেজে উঠল। তারপরে এক উন্মত্ত ভীতি পেয়ে বসল। মেশিনগানের মুখোমুখী পোষমানা জন্তুদের এমনিই হয়। ওরা কাদার ভিতর দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে পালাল। প্রথম তিনবার গুলী চলার পরই বেবের্ত আর লিদি একজনের উপর আর-একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মেয়েটির মুখে লেগেছে গুলী, আর ছেলেটির বাঁ কাঁধ ফুটো হয়ে গেছে। মেয়েটা মারা গেছে তখনি। নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটা নড়ছে, মৃত্যুর আকুলি-বিকুলি শুরু হয়ে গেছে। সে তাকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। তাকে নিতে চায় আবার তেমনি করে বুকে তুলে, যেমন করে সেই অন্ধকার ডেরায় তুলে নিয়েছিল কাল রাতে। এই মুহূর্তে জাঁলিন এসে দেখা দিল। এখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে রিকুইলারের ডেরা থেকে সে লাফাতে-লাফাতে ছুটে আসছে। সময় মতো এসে গেছে সে। দেখলে বেবের্ত তার খুদে বৌকে জড়িয়ে ধরে মরছে।

পাঁচগুলীর পালায় বুড়ী ব্রুল আর ছোট সর্দার রিশোম লুকিয়ে পড়ল। সর্দারের পিঠে লেগেছে গুলী, সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে, সাথীদের এখনো অনুরোধ করছে। এবার এলিয়ে পড়ল একপাশে—গোঙাচ্ছে। চোখ তার সজল। আর বুড়ীর তো বুকখানায় বিঁধেছে গুলী। সে লুটিয়ে পড়েছে, আর সাড়াশব্দ নেই। এক আঁটি শুকনো কাঠের মতোই চুরমার হয়ে গেছে। শুধু সমস্ত জীবনীশক্তি জড়ো করে শেষ গালাগাল সে ছুঁড়ে মেরেছে।

তারপরের অগ্নি উদ্‌গারের পালায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সারা মাঠ। এরা কৌতূহলী জনতা—যারা রঙ্গ দেখতে এসেছিল—দুশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। মোকে-ছোকরার মুখে ঢুকে গেছে গুলী, জাচারি আর

ফিলোমেনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে আছে। মাথার খুলি তার ভাঙা। জাচারি আর ফিলোমেনের বাচ্চাকটি তারই রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। মোকে-ছুঁড়ির পেটে বিঁধেছে ডবল গুলী। সে সিপাহীদের রাইফেল বাগিয়ে ধরতে দেখেছিল। মনটি তার ভাল। তাই সে প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্যাথেরিনকে আড়াল করে, তাকে চেঁচিয়ে দিয়েছিল সতর্ক করে। সে একবার জোরে চীৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। এতিয়েঁ ছুটে এল তাকে তুলে নিয়ে যেতে, কিন্তু সে হাত নেড়ে বারণ করলে। কোন তো লাভ নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। হেঁচকি উঠছে, তবু হাসছে ওদের দুজনের দিকে চেয়ে। সে বিদায় নিচ্ছে, তবু ওদের দুজনকে জোড়ে দেখে সে খুশী—সুখী।

সব বুঝি শেষ। গুলীও নিঃশেষিত। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী দূরে ধাওড়ার সামনে গিয়ে পড়ল। তারপর উঠল একক গুলীর শব্দ।

মেয়ুর বুকে এসে বিঁধল গুলী, সে ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কালো জলভরা গর্তে। মেয়ু-বৌ হতবুদ্ধি হয়ে ঝুঁকে পড়েছে।

অ-বুড়ো—বুড়ো—ওঠ! ও কিছু নয়, কিছু নয়! তাই না গো?

এস্তেলকে আঁকড়ে ধরে হাত তার জোড়া, সে তাকে এক কাঁখে নিয়ে তার মরদের মাথাটা তুলে ধরতে গেল।

বুড়ো—কথা কওনা? কোথা লাগল?

মেয়ুর শূন্য দৃষ্টি, মুখে রক্তের ফেনা উঠছে। মেয়ু-বৌ বুঝতে পারলে। সে মরে গেছে। কাদায় বসে পড়ল বৌ, কাঁখে এখনো বাচ্চাটা বোঝার মতো ধরা। তার বুড়ো মরদের দিকে তাকিয়ে আছে। হতচেতন সে।

পিট এবার পরিষ্কার। সিপাহীদের সর্দার বিভ্রান্ত হয়ে টুপীটা খুলে ফেলে এবার মাথায় বসিয়ে দিলে। টুপীটা ঢিল লেগে দুমড়ে গেছে। জীবনের এই চরম সংকটেও তার জঙ্গী কেতা এখনো বজায় আছে। সিপাহীরা আবার নিঃশব্দে পুরছে গুলী। রিসিভিং-রুমের জানালায় নিগ্রেল আর দাঁসারের ভয়ার্ত মুখ। সুভেরিন তাদের পিছনে। তার কপালে এক দীর্ঘ বলি-রেখা—তার সেই ভয়াবহ সমস্যার সমাধান বুঝি এমনি করেই কপালের ভাঁজে লেখা হয়ে গেল। দিগন্তের ওপারে, প্রান্তরের প্রান্তে এখনো অচল অটল দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো বনেমোর। এক হাতে লাঠি ভর দিয়ে আছে, আর এক হাত চোখের ওপর ঢাকা। তার আপন লোকদের হত্যাকাণ্ড সে বুঝি ভাল করেই দেখতে চায়। আহতদের গোঙানি উঠছে, আর নিহতরা গেছে দুমড়ে বেঁকে, তারাও শিটিয়ে উঠছে ঠাণ্ডায়। তুষার গলছে, কাদা হয়ে উঠছে তরল। এখানে ওখানে কালো কয়লার মাঝখানে ঘোলাজলের গর্ত সৃষ্টি হয়েছে,—গলন্ত তুষারের আস্তরণ ছিন্নভিন্ন—তারই নীচে দেখা দিচ্ছে খোঁদল। আর সেই খোঁদলের কাদা জলে নিহত আর আহতদের গা কাদায় কাদা হয়ে উঠছে।

এ এক জীর্ণশীর্ণ মানুষের শবদেহের স্তূপ—এরই মধ্যে পড়ে আছে এম্পেতের লাশটা। মৃত মাংসের এক বিরাট স্তূপ যেন। দেখে যেমন ভয় হয়, তেমনি দেখা দেয় করুণা।

এতিয়েঁ মরেনি। এখনো ক্যাথেরিনের পাশে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। ক্যাথেরিন তো ক্লান্তিতে দুঃখে মূর্ছা গেছে। এবার এক গম্ভীর স্বর শুনে

সে চমকে উঠল। পাদরী দাঁড়িয়ে প্রার্থনা সেরে ফিরছেন। এ তাঁরই স্বর। সেকালের ধর্মজ্ঞাণীদের মতই তিনি অনুপ্রেরণায় অধীর, তেমনি দুহাত তুলে ভগবানের ক্রোধ জাগিয়ে তুলছেন। জাগ্রত হোক ক্রোধ, বর্ষিত হোক হত্যাকারীদের উপর। বলছেন ন্যায়ের রাজ্যের কথা—স্বর্গের অনলে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লুপ্ত হবার ভবিষ্যৎ বাণী করছেন। শ্রমিকদের, সর্বহারাদের হত্যায় তাদের পাপ তো উঠেছে চরমে—সেই পাপেই তো তাদের শেষের দিন ঘনিয়ে আসছে।

সপ্তম খণ্ড

এক

মঁতসুতে গুলী চলল। তার প্রতিধ্বনি জোরালো হয়ে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল বহু বহু দূরে, এমন কি প্যারী গিয়েও পেঁছিল। চারদিন ধরে সবগুলো বিরোধী দলের কাগজ ক্রোধে গর্জন তুলল—প্রথম পাতা এই নৃশংস হত্যার বিবরণী দিয়ে ভরিয়ে দিলে। পঁচিশজন আহত, চোদ্দজন নিহত—তার মধ্যে তিনজন স্ত্রীলোক আর দুজন শিশু। আবার গ্রেফতার করাও হয়েছে। লেভাক তো তখন বীর-নায়ক। হাকিমের মুখের উপর সে যে উত্তর দিয়েছে, সে তো সেকালের বীর-নায়কদেরই যোগ্য। এই ক'টা গুলী সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থলে গিয়ে আঘাত করলে। তার সর্বশক্তিময় শান্তিতে চিড় ধরিয়ে দিলে। কিন্তু সাম্রাজ্য নিজের এই আঘাতের গুরুত্ব বুঝতে পারলে না। একটা আপসোসের ব্যাপার ঘটে গেছে মাত্র। দূর সাম্রাজ্যের এক দূর প্রান্তে, অখ্যাত, অজ্ঞাত এক কয়লা-খনি অঞ্চলে একটা সামান্য সংঘর্ষ হয়ে গেছে। জনমত যেখানে দানা বেঁধে ওঠে—সেই প্যারীর বুলেভার থেকে সে তো বহু বহুদূরে। মানুষ এ-কথা দুদিনেই ভুলে যাবে। কোম্পানির কাছে বেসরকারী হুকুম গেল, তারা যেন ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেয়। আর ধর্মঘটেরও শেষ চাই—যতই ধর্মঘট চল্‌বে, ততই সামাজিক সমস্যা তীব্র হয়ে উঠবে—বাড়বে বিপদ।

তাই বুধবার সকালে মঁতসুতে কোম্পানির তিনজন পরিচালকের আবির্ভাব হ'ল। খুদে শহর ভয়ে অভিভূত হয়ে ছিল, তাই হত্যাকাণ্ডের পর খোলাখুলি আনন্দ প্রদর্শনের সাহস পায় নি। আবার শহর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, মুক্তির আনন্দ পেল। আবহাওয়াও এখন চমৎকার। উজ্জ্বল সূর্য উঠেছে—ফেব্রুআরির প্রথম দিকের আর্দ্রতা মেশানো উষ্ণতায় লিলাকের ডগায় ডগায় অংকুর উদ্গম হয়েছে—সবুজের ছিটে ফোঁটা লেগেছে গাছে গাছে। আফিস-গুলির শার্সি-খড়খড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে। বড় বাড়িটা আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গুজব রটেছে, আশাপ্রদ গুজব—পরিচালকমণ্ডলী না কি এই বিপর্যয়ে অভিভূত—ধাওড়াগুলির বিপথগামী পাপীদের দিকে বাৎসল্যরসে

অভিষিক্ত হয়ে দু-বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন। আঘাত হানা হয়েছে—তারা যা আশা করেছিলেন—নিঃসন্দেহে তার চেয়ে প্রচণ্ড হয়েই পড়েছে আঘাত—এবার তাই তাঁরা আর্তত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করলেন—চমৎকার উপায় গ্রহণ করা হ'ল—যদিও তখন যথেষ্ট দেরিই হয়ে গেছে। বেলজিয়ামের মজুরদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, আর মজুরদের কাছে সেইটেই পরম অনুগ্রহ বলে বিজ্ঞাপিত হ'ল। তারপরে পিট থেকে পল্টন তুলে নেওয়া হ'ল। দলিত-পিষ্ট ধর্মঘটী, তাদের ভয় তো আর নেই। ভোরো থেকে যে সান্ত্রীটি উধাও হয়েছিল, তার সম্পর্কেও মালিকরা বোবা হয়ে রইলেন। সারা জেলায় তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চলল, কিন্তু না পাওয়া গেল বন্দুক, না তার লাশ। তাই সান্ত্রীটিকে ফেরারী বলেই ধরে নেওয়া হ'ল, কিন্তু তবু সবার মনেই রইল সে যে খুন হয়েছে—সেই সন্দেহ। এমনি করেই সব দিকে মালিকরা, যা ঘটে গেছে তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করলেন। আগামীর ভয়ে তাঁরা কম্পমান। উদ্দাম, বর্বর জনতাকে পুরানো দুনিয়ার ধসে-পড়া কাঠামোর ভিতরে উন্মাদের মত ছুটতে দিলে যে বিপদ আছে একথা তাঁরা টের পেলেন, খতিয়ে বুঝে নিলেন। তা ছাড়া, এই মিটমাটের জেরে বৈষয়িক ব্যাপারে বাধা পড়ল না। বরং এগিয়ে গেলেন কর্তৃপক্ষ। দেনেউলিকে দেখা গেল আফিসে ঘন ঘন যাতায়াত করতে। সেখানে মঁসিয়ে হানাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। ভান্দামের খনি কেনার কথাবার্তা চলতে লাগল। বিশ্বস্তসূত্রে জানাও গেল, দেনেউলি কোম্পানির দরেই রাজী হয়ে যাবেন।

পরিচালকমণ্ডলী দেয়ালে দেয়ালে ছেয়ে দিলেন হলদে বড় বড় ইস্তাহারে। তাতেই সারা তল্লাটে সাড়া পড়ে গেল। বড় বড় হরফে এই ক'টা ছত্র তাতে লেখা ঃ—

মঁতসুর মজুরগণ!

সৎ এবং বিশ্বস্ত মজুরগণের জীবিকা উপার্জনের পথ হইতে বঞ্চিত করিবার শোকাবহ পরিণাম কি তাহা তোমরা ইদানীং দেখিয়াছ। যাহাতে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয় তাহা আমরা চাহি না। অতএব আমরা সমস্ত পিটগুলি আগামী সোমবারে খুলিয়া দিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। যখন কাজ শুরু হইবে, আমরা অতি সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিব, কোন্ কোন্ বিভাগে কি কি উন্নতি দরকার। আমরা যথাসম্ভব উন্নতি করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।

সকালবেলা দশ হাজার খনির মজুর ইস্তাহারের পাশ দিয়ে চলে গেল। কারো মুখে রা নেই। কেউ বা মাথা ঝাঁকালে। আর সবাই চলে গেল ধীরে ধীরে। একটি মুখের একটি রেখারও অদল-বদল হ'ল না।

এ পর্যন্ত দুশোচাল্লিশ নম্বর ধাওড়া প্রচণ্ড প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল। সাথীদের রক্তে রঙীন হয়ে উঠেছিল পিট, সেই রক্তধারাই বুঝি জীবিতদের পথ রুদ্ধ করে দিলে। জন দশ-বারো মজুরও কাজে গেল না। পিয়েরোঁ আর ওরই মতো কয়েকজন শুধু ভিড়ে পড়ল কাজে, তাদের আসা-যাওয়া ওরা গোমড়া মুখে চেয়ে চেয়ে দেখলে। কিন্তু বাধা দিলে না, শাসানি-ধমকানিও উঠল না। গির্জার দেয়ালের ইস্তাহার 'লটকানো দেখে ওদের মনে ঘোর সন্দেহই হ'ল। কার্ড ফেরত নেবার একটা কথাও নেই—সত্যিই কি

কোম্পানি আবার কার্ড ফিরিয়ে নেবে? প্রতিশোধের ভয়ে ওরা এখনো গোঁয়ারের মতো বাধা দিতে লাগল। তা ছাড়া, ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিও আছে। যারা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট তাদের যাতে বরখাস্ত না করে তারই বিরুদ্ধে জানাতে হবে প্রতিবাদ। এই সব কারণেই ওরা আরো একগুঁয়ে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বড়ই ঘোরালো, খতিয়ে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। ঐ মালিক-ভদ্রলোকের দল স্পষ্টা-স্পষ্টি বললে তবে ওরা পিটে ফিরে যাবে, নচেৎ নয়। ছোট ছোট বাড়িগুলো তাই যেন নীরবতায় ডুবে রইল। বুভুক্ষাও যেন এখন আর কিছু নয়। কোন দাম নেই তাদের কাছে। বাড়িগুলোর উপর দিয়ে বয়ে গেছে মৃত্যুর প্রচণ্ড ঝড়—তারা মরবে এ তারা জানে।

একটা বাড়ি এই শোকে সব চেয়ে বেশী অভিভূত। তাই যেন বেশী চুপচাপ আর অন্ধকার। সে মেয়ুদের বাড়ি। সেই যে তার স্বামীর সঙ্গে কবর-খানায় গিয়েছিল, তার পর থেকে মেয়ু-বৌয়ের মুখে আর কথাটি নেই। গুলী গোলার ব্যাপারের পর এতিয়েঁ ক্যাথেরিনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। কাদায় মাখামাখি আধমরা মেয়ে। এতিয়েঁর সামনেই বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার আগে পোষাক-আষাক খুলে নিয়েছিল মেয়ু-বৌ। তার মনে হয়েছিল, বুঝি তলপেটেই ক্যাথেরিনের গুলী লেগেছে। শেমিজে চাপবাঁধা রক্তের দাগ দেখে তাই তো মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই বুঝতে পারল, এ ঋতুস্রাব। এই ভয়ংকর দিনের অসহ্য উত্তেজনায় এতদিনের অবরুদ্ধ ঋতুনিস্রাব মুক্ত হয়েছে, ঝরছে। এ আর এক দুর্ভাগ্য! চমৎকার! পুলিস খুন করবার জন্য বাচ্চা বিয়োতে পারবে! ক্যাথেরিনকে সে এ সম্বন্ধে কিছু বললে না, এতিয়েঁকেও না। এতিয়েঁ জাঁলিনের সঙ্গেই শুয়ে পড়ল। গ্রেফতারের ভয় আছে, তবু রিকুইলারের অন্ধকারে গিয়ে আশ্রয় নিতে তার সাহস হ'ল না। সেখানে আছে এক অজানা ভয়, তার থেকে জেলখানা ঢের ভাল। ডেরার কথা ভেবেও সে শিউরিয়ে উঠল। এই মৃত্যুর তাণ্ডবের পরে সেই অন্ধকারের ভীতি—সে তো অসহ্য। আর সেই তরুণ সান্ত্রীটি তো এখনো পাথরের নীচে ঘুমিয়ে আছে! তাকেও সে ভয় করে। তা ছাড়া, পরাজয়ের এই তিক্ততায় এখন তো কারাগার তার উপযুক্ত আশ্রয়—এখন তো সেই তার স্বপ্ন—কামনা। কিন্তু কেউ তো তাকে গ্রেফ্‌তার করতে এল না। ঘন্টার পর ঘন্টা চলে গেল, ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে কাটতে লাগল দুঃখের প্রহর—সে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়তে পারল না ঘুমে। শুধু মাঝে মাঝে ওদের দিকে তাকাতে লাগল মেয়ু-বৌ। তার দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ন। সে যেন ওদের দিকে তাকিয়ে আপন মনে শানিত হয়ে উঠছে। কেন—কেন ওরা এসে জুটেছে তার বাড়িতে?

আবার স্তূপের মতো ওরা পড়ে আছে। নাকডাকানি উঠছে। বুড়ো দাদু বনেমোর দুটি ছেলেমেয়ে যেখানে শুত, সেই বিছানা দখল করেছে। তারা এখন ক্যাথেরিনের সঙ্গেই শোয়। আলঝির আর তো তার কুঁজের খোঁচা দিয়ে বিরক্ত করে না। মা বিছানায় শুতে গিয়ে এখন সমস্ত বাড়ি-খানির শূন্যতা মনে মনে অনুভব করে। তার বিছানা তো মস্ত বড়, বিছানার শূন্যতা ভরাতে এস্তেলকে সে নিয়ে এসেছে নিজের বিছানায়; কিন্তু সে তো তার স্বামীর স্থান পূর্ণ করতে পারে না। তাই নিঃশব্দে ঘন্টার

পর ঘণ্টা কেঁদে কাটায় মেয়ু-বৌ। আবার আগেকার মতোই দিন কাটছে। এখনো ঘরে খাবার নেই, আগেকার মতো ঠায় মরবারও উপায় নেই। এখানে ওখানে খুদ কুঁড়ো যা পায় তাই দিয়েই হতভাগারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। ওদের দৈনন্দিন জীবনে কিছুই বদলায়নি। শুধু মা হারিয়েছে তার মানুষকে —তার স্বামীকে।

পাঁচ দিন কেটে গেল। এতিয়েং এই পাঁচদিন ধরে এই নীরব স্ত্রীলোকটিকে দেখে দেখে আরো মুষড়ে পড়েছে। সে সেদিন বিকেলে ঘর ছেড়ে বাইরে এল। তার পরে ধাওড়ার বাঁধানো পথে চলতে লাগল। নিষ্কর্মা হয়ে সে দিন কাটাচ্ছে। এ তো তার কাছে বিরক্তিকর। তাই সে হেঁটেই চলল, মাথা নীচু, হাত দুটো ঝুলছে দু-পাশে। আর মনে সেই একই ভাবনা তাকে অস্থির করে তুলেছে। আধঘণ্টা ধরে এমনি চলল, মনে অস্বস্তি আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। সাথীরা ওকে দেখতে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার যেটুকু জনপ্রিয়তা ছিল, সেইটুকুও এই গুলী চলায় উবে গেছে। এখন তো বেরুলেই চার দিক থেকে, বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি বর্ষিত হয়। চোখ চাইলেই দেখে পুরুষেরা যেন শাসাবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা জানালার পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়ায়, এক নিঃশব্দ অভিযোগ আর সংযত ক্রোধ ফুঁসে ওঠে ওদের চোখে। সে-চোখ বুভুক্ষা আর দুঃখে আরো আয়ত হয়ে দেখা দেয়। তার কেমন লজ্জা করে, সোজা হয়ে আর চলতে পারে না। পিছনে যেন এই মূক ভর্ৎসনা আরো প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। ভয় হয়, হয় তো সমস্ত ধাওড়া বেরিয়ে এসে চীৎকার করে জানাবে তাদের দুঃখদুর্দশা—আর তাকে তা শুনতে হবে। তাই সে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ঘরে ঢোকে।

কিন্তু মেয়ুদের বাড়ির দৃশ্য দেখে সে আরো বিভ্রান্ত হয়ে গেল। ঠাণ্ডা আগুনের কুণ্ডের পাশে চেয়ারে বসে আছে বুড়ো বনেমোর। কে যেন তাকে আঠা দিয়ে চেয়ারের সংগে জুড়ে দিয়েছে। সেই হত্যার দিন থেকেই এমনি বসে আছে। সে পড়েছিল মাটিতে, লাঠি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিছল। তাকে দুজন পড়শী দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসে। এখন যেন বজ্রাহত বনস্পতি সে। লেনোর আর আঁরি পেটের খিদে ভুলে থাকবার জন্য একটা সসপ্যান কেঁখে নিচ্ছে। শব্দ উঠছে। কাল বাঁধাকপি সেদ্ধ হয়েছিল ঐ সসপ্যানে। মেয়ু-বৌ এস্তেলকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ঘুষি পাকিয়ে ক্যাথেরিনকে সে বলে উঠল।

বল্—ভগমানের কিরে—আবার ও কথা বল্ তো দিকি!

ক্যাথেরিন লা ভোরোয় কাজে যাবে বলেছিল—তাই এই ব্যাপার। নিজের রোজকার রুজি রোজগার করতে পারছে না বলে জীবন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। মার বাড়িতে সে যেন নিষ্কর্মা জানোয়ারের মতো পড়ে আছে। সাভালের ভয় যদি না থাকতো, সে মঙ্গলবারেই ফিরে যেত। সে তাই স্খলিত স্বরে বললে,

কি করব বল না? ঠুঁটোটি হয়ে বসে থাকতি তো নারব। আর মোদের মুখের গেরাস তো চাই—না—না হলি চলবে?

মেয়ু-বৌ খেঁকিয়ে ওঠে বাধা দিলে,

শোন্! যে পয়লা গিয়ে খাদে নামবি, আমি তার টুঁটি টিপে মেরে

ফেলব নি! না, না, তা হবেনি! অতো সইতে পারবনি! বাপকে মেরে ফেলালে, এখন কাচ্চা বাচ্চাদের চুষে-শুষে নেবে! তার চেয়ে কাফনে করে মানুষটার মতো গোরে যাবি সেও ভি আচ্ছা!

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পরে প্রচণ্ড কথার স্রোত বয়ে গেল। অমন আসানের মুখে আগুন! ক্যাথি তো ভারি টাকা আনবে। তিরিশ সু'র তো এক আধলা বেশি নয়! আর ঐ খুদে শয়তান জাঁলিনটাকে যদি মালিকরা একটা চাকুরি দেয় তো বড় জোর তার সঙ্গে আর বিশটা সু ঘরে আসবে। কুল্যে পঞ্চাশ-টি সু—আর সাত-সাতটা পেট! বাচ্চা-কাচ্চাগুলো তো অকেজো, শুধু সুরুয়া গেলার যম! আর বুড়ো দাদু পড়ে গিয়ে মাথাটাই বিগড়ে গেছে। একেবারে ঠুঁটোটি হয়ে বসে আছে। নয় তো সাথীদের উপরে সিপাহীদের গুলী চালাতে দেখে বোধহয় ফিট হয়ে গিছল।

আহা বুড়ো, তোমাকে নিকেশ করে দিয়েছে—তাই না গো? তোমার হাত মজবুত থাকলি কি হবে, তুমি তো ফেতি হয়ে গেছ।

বনেমোর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, বুঝতে পারছে না। এমনি ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। ঘর পরিষ্কার রাখার জন্য ওরা একটা ছাই-ভরতি পাত্র দিয়েছে, তাতে মাঝে মাঝে গয়ার ফেলে। এতেই বোঝা যায়, ওর বোধশক্তি একেবারে লোপ পায়নি।

মেয়ু-বৌ বলতে লাগল, এখনো ওরা বুড়োর ভাতা ঠিক করে দেয় নি। ওদের যা ভাবগতিক, তাতে দেবে বলে মনেও হয় না। না, না, এই মানুষ-গুলো মোদের সব্বনাশ করেছে, এদের আর মোরা সইতে নারব!

কিন্তু ক্যাথেরিন সাহস করে বললে—ওরা তো ইস্তাহারে বলেছে—

ইস্তাহার চুলোয় যাক্! ও তো টোপ—মোদের ধরবে আর গিলবে! মোদের পেট চিরে দিয়েছে এখন এসেছে মায়াদয়া দেখাতি!

কিন্তু যাব কোথা মা? ওরা মোদের ধাওড়ায় থাকতি আর দেবে না।

মেয়ু-বৌ এক বিকট অঙ্গভঙ্গী করলে। কোথায় যাবে তারা? সে তো জানে না। ভাবেও না, ভাবলে তো পাগল হয়ে যেতে হবে। কোথাও যাবেই............কোথাও গিয়ে হাজির হবেই। সসপ্যান কেঁখে নেওয়ার শব্দ অসহ্য হয়ে উঠল। সে এবার লেনোর আর আঁরির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কানে ঘুষি মেরে বসল। এরই মধ্যে এস্তেল চার হাত পায়ে হামা দিয়ে টেবিল থেকে একেবারে নীচে পড়ে গেল। এতে আরো সোরগোল পড়ে গেল। মা একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে ঠান্ডা করলে—যদি পড়ে গিয়ে খুন হোত তো সে জুড়াত! আলঝিরের কথা তুললে মা। আহা, ওর বরাত যদি সবাই পেত, তবে তো সুরাহাই হোত! এবার দেয়ালে মুখ থুবড়ে ফুঁপিয়ে উঠল মা।

এতিয়েঁ দাঁড়িয়ে আছে। বাধা দেবার সাহস নেই। সে আর বাড়ির কেউ নয়। এখন ছেলেমেয়েরাও কি এক সন্দেহে তার কাছ থেকে সরে সরে যায়। কিন্তু মেয়ু-বৌয়ের কান্না গিয়ে তার আঁতে লাগল। সে বলে উঠল, সাহসে বুক বাঁধ বৌ, মোরা যা করে হোক, এবার এসব কাটিয়ে উঠব।

মেয়ু-বৌ বুঝি শুনতে পায়নি। সে তার দুঃখ ঢেলে দিচ্ছে কান্নায়। অশ্রান্ত কান্না ফুলে ফুলে উঠছে, ঝরে পড়ছেঃ—

কিরে রইল তোমার! এখনো বিশ্বাস কর? এই সব খুন জখমের আগে মোরা তবু একরকম করে চালিয়ে নিতাম। শুকনো রুটি খেতাম, কিন্তু মিলে-জুলে বেশ তো ছিলাম সব্বাই। হা ভগবান, একি করলে। কি করেছি যে মোদের এই বিপদ হ'ল। মোদের কেউ গোরে গেল, আর বাকি সব্বাই গোরে যাবার জন্যি হাঁসফাঁস করছে। ঘোড়ার মত জোয়ালে জোতা ছিলাম, মোদের পাওনা ছিল লাথি-ঘুষি—বড়লোক মালিকের টাকার থলে ভরিয়ে দিতাম। নিজেদের ভালমন্দ কিছুর আশাও ছিল না। আশা ছিল না, তাই বেঁচে বর্তে থেকেও সুখ পাইনি। হ্যাঁ, অমনধারা তো চলতি পারে না, একটু নিশ্বাস তো ছাড়তে হবে, একটু বাঁচা চাই! কিন্তু যদি জানতাম... ভালাই চেয়ে কি এমনি মোদের হ'ল—কে একথা বলবে গো—কে বলবে? দীর্ঘনিশ্বাসে ফুলে উঠল বুক, স্বর এক অসীম দুঃখে রুদ্ধ।

চালাক মানুষের অভাব নেই। ওরা বলে একটু সইলেই না কি এ সব ঠিক হয়ে যাবে......আর অমনি মোরা নেচে উঠি। যা হয় না, তারই জন্য মোরা কত সয়ে যাই। এই তো মোর কথা। হাঁদার মতো স্বপ্ন দেখতাম—সবার সাথে মিলেজুলে থাকব বলে কত মনে সাধ ছিল—ওকথা ভাবতে গিয়ে আকাশে উড়াল দিতাম। তারপরে তো একেবারে পগারে পড়লাম হাড়গোড় ভেঙে! না গো, না, একটা কথাও সাঁচ্চা নয়—মোদের ভাবনা-মাফিক কিছুই হয় না। অমন দুনিয়া কোথাও নেই। শুধু আছে দুঃখ—শুধু ভোগান্তি! যত ইচ্ছে দুঃখ পেতে পার—আর কিছু নয়—আর লাভের মধ্যে বকশিশ পাবে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী!

এতিয়েং কান পেতে শুনল কান্না। প্রতি ফোঁটা চোখের জল বুঝি অনুশোচনা হয়ে বাজল তার মনে। তার কোন কথায়ই মেয়ু-বৌ সান্ত্বনা পাবে না, মহান আদর্শচ্যুত সে, এখন সে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। মেয়ু-বৌ এবার ঘরের মাঝখানে এগিয়ে এসে ওর দিকে সোজা তাকালে। শেষ ক্রোধটুকু উগরে দিলে ওর উপরে।

তোমার মতলবটা কি? এমন খুন জখমি ব্যাপারে মোদের ভিড়িয়ে দিয়ে তুমি বুঝি পিটে নামতি মন করেছ সাঙাৎ? তোমার জায়গায় যদি মুই হতাম, তাহলি লজ্জায় দুখে কবে মরে যেতাম! মোর সাথীদের এমন হাল করে এমন জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতি পারতাম না গো!

উত্তর দিতে গেল এতিয়েং, আবার কি ভেবে হতাশ হয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। এই দুঃখের সময় কৈফিয়ত দিয়ে লাভ কি? ও তো বুঝতে পারবে না। কিন্তু এখানে যে থাকা যায় না। অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই সে বেরিয়ে এল। আবার শুরু হ'ল অস্থির পরিক্রমা।

কিন্তু বাইরে যেন সারা ধাওড়া ওরই জন্য ওত্ পেতে বসে আছে। পুরুষরা দোর গোড়ায়, আর মেয়েরা আছে জানালায় জানালায়। ও বাইরে আসতেই এক ক্রুদ্ধ চীৎকার উঠল। ভিড় বাড়ছে। চারদিন ধরে কানা ঘুষো প্রচার চলছিল, এবার যেন বিদ্বেষের তোড় বয়ে গেল। মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠে এল শূন্যে, মায়েরা ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে দিলে ওকে, তাদের ইঙ্গিতে প্রতি-শোধের উন্মত্ততা। বুড়োরা ওকে দেখে গয়ার ফেললে। পরাজয়ের পর এ এক অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া, জনপ্রিয়তার এই-ই যথার্থ উল্‌টো পিঠ। যত

দুঃখ সয়েছে, সব নিষ্ফল হয়ে যেতে ওরা ভেঙে চুরে গেছে। সে দিচ্ছে যত বুভুক্ষা আর মৃত্যুর দক্ষিণা।

জাচারি ফিলোমেনের সঙ্গে যাচ্ছিল, সে ইচ্ছে করেই এতিয়েংকে ধাক্কা মেরে বসল। বিদ্বেষভরে মুখ বিকৃত করে বললে,

দ্যাখ্, দ্যাখ্, মোদের সাঙাৎ কেমন মুটিয়েছে। মরা লাশ খেয়ে খেয়েই তো ওর অমন চেকনাই হয়েছে!

লেভাক-বৌও এরই মধ্যে বাইরে এসে গেল। সঙ্গে ব্যুতেলুপ। তার বেবের্ত গুলীতে খুন হয়েছে বলে সে আবার কেঁদে উঠল।

হাঁ গো, হাঁ—এমন ভীতুয়া আছে, যারা কাচ্চা-বাচ্চাদের খুন-জখমি হতে দেয়! ও যদি মোর বাচ্চাকে ফেরত দিতে চায়, ও নিজে গোরে গিয়ে সেঁধোক না! স্বামী হাজতে আছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। ব্যুতেলুপ আছে। সংসারও চলছে। হঠাৎ স্বামীর কথা মনে পড়ায় আবার চেঁচিয়ে উঠল,

যা—ভাগ্! তোর মতো পাজিরা ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে, আর সাচ্চা মানুষরা পচছে হাজতে!

ওকে এড়াতে গিয়ে পিয়েরোঁ-বৌ-এর মুখোমুখি পড়ে গেল এতিয়েং। সে তখন বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। মার মৃত্যুতে সে রেহাই পেয়ে গেছে। বুড়ীর যা মেজাজ হয়ে উঠেছিল, তাতে ওদের সবাইকেই বোধ হয় ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হোত। তাছাড়া, পিয়েরোঁর খুদে মেয়ে লিদির জন্য এক ফোঁটাও তার দুঃখ হয় নি; বরং সে খুন হয়েছে বাঁচা গেছে! কিন্তু সেও পড়শী-দের সঙ্গে তাদের মন পাবার জন্য ভিড়ে গেল।

ওরে মোর মা রে, মোর বাচ্ছারে! কি হ'ল তাদের? তুমি তাদের আড়ালে দিব্যি লুকিয়ে ছিলে। তোমার উপর ছোঁড়া গুলি তো ওরা বুক পেতে নিলে।

কি করবে এতিয়েং? পিয়েরোঁ-বৌ আর আর-সবাইকে গলা টিপে মেরে ফেলবে তারপর সারা ধাওড়ার বিরুদ্ধে লড়াই করবে? মুহূর্তের জন্য তাই-ই ইচ্ছে হ'ল। মগজে রক্তের স্পন্দন জাগছে। ওর সাথীরা তো পশু। ওরা এমন ধারা বোকা, এমন বর্বর—যে, ওর উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। ঘটনার ধারা সম্বন্ধে ওরা ওয়াকিবহাল নয়। এ যে নিছক মূর্খতা। কিন্তু ওদের উপরে কর্তৃত্ব করবার তো ক্ষমতা আর তার নেই। তাই সে বিরক্ত হয়ে পা চালিয়ে দিলে, ভ্রূক্ষেপ করল না ওদের অপমানে। তারপরে শুরু হ'ল পলায়ন। প্রতি বস্তি থেকে উঠল টিটকারি। ওরা ওর পেছু নিলে। সমস্ত খনির গোলামের অভিশাপ যেন ঘৃণার বজ্র হয়ে বিস্ফূর্ত হয়ে পড়ল। সে নিজেই এখন শোষক, হত্যাকারী—ওদের দুঃখের কারণ। ভীত এতিয়েং ধাওড়া থেকে ছুটে চলল। তার পিছনে ক্রুদ্ধ জনতা চীৎকার করতে করতে ধাওয়া করছে। সদর সড়কে এসে কয়েকজন মাত্র নিরস্ত হ'ল। কিন্তু বাকি সবাই ধাওয়া করে চলল। টিলার নীচে আঁভাতাসের সামনে তারা এসে হাজির হ'ল। এতিয়েং এবার লা ভোরোর দিক থেকে আসা একদল মজুরের ভিড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

বুড়ো মোকে আর সাভাল ছিল দলে। মোকে ছুঁড়ি আর ছেলে মোকের মারা যাবার পরও বুড়ো চুপচাপ সহিসের কাজ করে যাচ্ছে। টুঁ শব্দটি করেনি। হঠাৎ আজ এতিয়েংকে দেখে ফুঁসে উঠল, জল গড়িয়ে পড়ল চোখ দিয়ে,

মুখে তার অশ্লীল গালাগাল। চিবানো তামাকের ধারা দুকষ বেয়ে নেমে এল।

ওরে শয়তান, ওরে হারামী। ওরে বেজম্মা! দাঁড়া, দাঁড়া, মোর বেটা-বেটির শোধ তুলব তবে ছাড়ব। ওদের মতোই তোর হাল করে ছাড়ব!

একখানা ইট নিয়ে দু-টুকরো করে সে ছুঁড়ে মারল। সাভালও জো পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। সেও প্রতিশোধ নেবার সুযোগে উল্লসিত।

তবে তাই হোক—ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেই। সবাই তো যে যার পালা শোধ করলে, ওরে আঁস্তাকুড়ের কুত্তা এবার তোর পালা।

সেও এতিয়েন্‌র দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। বর্বর উল্লাস দেখা দিয়েছে, হইচই পড়ে গেছে। সবাই তুলে নিচ্ছে থান থান ইট—ভেঙে নিচ্ছে—সিপাহী-দের যেমন পিষে দিতে চেয়েছিল, তেমনি ওকেও চাইছে। হতবুদ্ধি এতিয়েং, পালাবার শক্তি নেই। সে মুখোমুখি দাঁড়ালে, কথায় ওদের শান্ত করতে চেষ্টা করছে। তার সেই পুরানো বক্তৃতা আবার যেন ঠোঁটে ফিরে এসেছে—একদিন এই বক্তৃতা ওরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছে। সে সেই কথাই বলতে লাগল—একদিন ওদের নেশার যোগান দিয়েছে এই কথায়, ওদের হাতের তেলোয় ভেড়ার পালের মতো শাসন করেছে। কিন্তু হায় সে শক্তি তো নেই। শুধু ঢিলে ঢিলে আসছে ওর কথার জবাব। বাঁ হাতে এসে লাগল একটা ঢিল। ও সরে গেল। এবার ঘোর বিপদ, আঁভাতাস-এর সুমুখে ভিড় ওকে ঘিরে ধরেছে।

রাসেনার ঠিক এমনি সময়, দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

সহজস্বরে বললে, ভিতরে চলে এস!

এতিয়েন্‌র মনে দ্বিধা, সে ওখানে কিছুতেই ঠাঁই নিতে যেতে চায় না।

এস, এস! আমি ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব'খন।

অবস্থা বুঝে রাজী হ'ল এতিয়েং! ঢুকে পড়ে বারের পিছনে আশ্রয় নিলে। এদিকে সরাইখানার মালিক চওড়া কাঁধ তুলে দরজা জুড়ে দাঁড়াল। সাঙাৎরা, একটু বুঝদার হও। তোমরা তো আমাকে জান। আমি তোমাদের কখনো ঠকাইনি। আমি চিরদিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে চেয়েছি, আমার কথা যদি শুনতে, তাহলে এ দশা তোমাদের হোত না। এ তো হক্ কথা।

কাঁধ আর ভুঁড়ি দোলাচ্ছে রাসেনার। বহুক্ষণ ধরে তার বাগ্মিতার ধারা যেন ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে জনতার উপর। উষ্ণধারায় যেন নিদ্রাতুর তারা। আবার সে তার পুরানো সাফল্য ফিরে পেয়েছে, পেয়েছে জনপ্রিয়তা। এর জন্য আয়াস স্বীকার করতে হয় নি। এক মাস আগে তাকে বুঝি ভীরু বলা হয় নি, বুঝি তার বক্তৃতায় ওঠেনি ছি-ছি, ধিক্কার। জনতা ভুলে গেছে তার লাঞ্ছনার কথা। হর্ষধ্বনি উঠেছে, সায় দিচ্ছে, বহুৎ আচ্ছা। মোরা তোমার সাথে আছি সাঙাৎ। আচ্ছা বলেছ সাঙাৎ! তুমুল হর্ষধ্বনি উঠছে।

এতিয়েং আছে আড়ালে। মূচ্ছাহত মানুষের দশা তার। বুকে তার বিক্ষোভ, তিক্ততা। বনের জমায়েত রাসেনারের ভবিষ্যদ্বাণী তার মনে পড়ছে—জনতার অকৃতজ্ঞতার কথা সে বলেছিল—ভয় দেখিয়ে ছিল। এ কি মূর্খতা! সে যা কিছু করেছে, সব ভুলে গেল? এতই ওরা ঘৃণিত, এতই ওরা হেয়! ওরা যেন অন্ধ শক্তি, নিজেদের অবিরাম খেয়ে খেয়েই ওদের শক্তি। ক্রুদ্ধ সে হয়েছে, তবু বুঝতে পারলে, এই মূর্খের দল নিজেদের উদ্দেশ্য-

কে ধ্বংস করছে। আবার নিজের পতনে এল হতাশা। উচ্চ আশার এই তো চরম পরিণতি। কি, সত্যই কি আশা নেই? মনে পড়ল—বীচ গাছের ছায়ায় তিন হাজার জনতা তারই কথার প্রতিধ্বনি তুলেছিল—স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন তো দু'হাতে সে কুড়িয়ে নিয়েছিল জনপ্রিয়তা। এরা তখন ছিল তার নিজের মানুষ, তাঁবেদার মানুষ—আর সে ছিল এদেরই মালিক। সেই দিন থেকেই সে এক মহা স্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিল—ম'তসু তো তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল; পারী এখনো দূর অস্‌ত্। লোকসভায় সে যাবে, বুর্জোয়াদের সে তার বাগ্মিতায় চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। লোক-সভায় সেই হবে মজুর সদস্যের প্রথম বক্তৃতা। এখন তো সব শেষ। ভেঙে গেছে স্বপ্ন, জেগে উঠেছে, নিজে সে এখন ঘৃণিত, হেয়, আর একঘরে—তার নিজের মানুষেরা তাকে ইঁট ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিলে!

রাসেনারের স্বর উচ্চগ্রামে উঠে এল।

হিংসার কখনো জিত্ হয় না। দুনিয়াও এক দিনে ঢেলে সাজা যায় না। যারা বলে এক দিনে বদলে দেবে দুনিয়াদারি, তারা হয় ঠাট্টা করে, নয় তো এ তাদের পেজোমি।

সাবাস! সাবাস! ভিড় থেকে উঠল গর্জন।

তাহলে দোষী কে? এতিয়েঁ নিজেকে শুধালে। তার দুঃখ আরো চরমে উঠল। একি তার দোষ—এই যে এত দুঃখ পেল মানুষ, আর ব্যথায় তার বুকে রক্ত ঝরছে—এই যে এত হত্যা—এই যে উপোস করে মরছে মেয়েরা আর শিশুরা—একি তার দোষ? এই বিপর্যয়ের আগে এক রাতে ও তো এই দৃশ্যই মনশ্চক্ষে দেখেছিল। কিন্তু তখন ছিল বাইরের শক্তি—সেই শক্তিই তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। সাথীদের মতো সেও ভেসে চলেছিল উন্মাদনায়। সে নিজের কর্তৃত্ব কখনো খাটাতে যায় নি—বরং জনতাই তাকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। পিছন থেকে—জনতার ভরসা না পেলে সে কখনো একাজ করত না। ঘটনার ধারায় প্রতি মুহূর্তে সে ভীত হয়ে পড়েছে, প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনার পর মনে হয়েছে এ তো আগে বুঝতে পারে নি, এমন বিপর্যয় তো চায় নি। যেমন, তার নিজের বিশ্বস্ত সাথীরা যে তাকেই একদিন ঢিল ছুঁড়ে মারবে—সে কথা কি করে সে বুঝতে পারত? উন্মাদ মানুষ এরা, এদের সে ভুরিভোজ আর আরামের জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে আজ ওরা অভিযোগ করছে—ওরা মিছে কথাই বলছে। অনুশোচনাকে এমনি তর্কে বিতর্কে সে রুদ্ধ করে দিতে চাইল। নিজে যে উচিত কাজ করেছে—এই কথাই সে মনকে বোঝালে। কিন্তু এরই আড়ালে দেখা দিল সন্দেহ। এক আবছা অনুভূতি যেন মাথা চাগিয়ে উঠছে—কাজ অনুপাতে সে ছিল অক্ষম। অর্ধ-শিক্ষিত মানুষের এমন সন্দেহই থাকে। আর সে সন্দেহ এতিয়েঁকে যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এখন তো সাহস উবে গেছে, সাথীদের ভাষাও সে আর বলে না। ওদের সে ভয় করে, জনগণের অন্ধ, অদম্য বিরাট চাপের ভয়ে সে ভীত। সে চাপ তো প্রকৃতির শক্তির মতোই সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেবে—যত নিয়ম-কানুন আর মতবাদ থাক—সবকিছু মুছে দেবে। ও যেন ওদের দল থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে—ওর রুচি, ওর প্রবৃত্তি ওকে এক উচ্চ সামাজিক বৃত্তে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে। এখন তো ওদের দেখলে গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

হর্ষধ্বনির ভিতরে রাসেনারের বক্তৃতা শেষ হ'ল।

বহুৎ আচ্ছা রাসেনার! ঐ তো মোদের মানুষ! সাবাস সাঙাৎ!

সরাইখানার মালিক এবার দরজা বন্ধ করে দিলে। জনতা ছত্রভঙ্গ। দুজনে এবার মুখোমুখী দাঁড়াল, দুজনেই কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। মুখে কারো কথা নেই। তারপর একত্রে পান করতে বসল।

সেই দিনই লা পিয়োলে'য় এক বিরাট ভোজের আয়োজন হ'ল। নিগ্রেল আর সিসিলের বাকদান উৎসবের ভোজ। আগের দিন থেকেই গ্রিগোয়েররা খাবার ঘর ঘষা মাজা করতে শুরু করে দিয়েছিল। বসবার ঘরখানাও ঝাড়-পোঁছ করা হ'ল। রান্নাঘরে মহিমময়ী মেল্যাঁ সগৌরবে ভর্জিত মাংসের তদারক করতে ব্যস্ত, সস্ বার বার নেড়ে দিচ্ছে। বাড়িখানা গন্ধে ম-ম করছে।

সহিস ফ্রান্সিস পরিবেশনে অনরাইনকে সাহায্য করবে বলে ঠিক হয়েছে। আর মালী করবে দরোয়ানের কাজ, মালী-বৌ ধোবে বাসন-কোসন। এ এক পিতৃশাসিত সামন্ত ভূস্বামীর ভবন, এখানে কখনো এমন উৎসবের ধূম পড়েনি।

সব কিছুই চমৎকার। হানাবু-ঘরনী সিসিলের প্রতি প্রীতিতে বিগলিত। যখন মঁসুতে সরকারী উকীল ভাবী বর-কনের স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব করলেন, তিনি নিগ্রেলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। মঁসিয়ে হানাবুও আনন্দিত। সবাই তাঁর সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব দেখে অবাক হয়ে গেল। খবর ছড়িয়ে পড়ল কানাকানিতে, এখন পরিচালক মণ্ডলীর নেকনজরে আছেন ম্যানেজার, ধর্মঘট দাবিয়ে দিতে তিনি যে প্রচণ্ড কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন তার জন্য লিজিয়ন অফ অনর (ফরাসী সরকারের সম্মানার্হ পদমর্যাদা) তক্মায় বিভূষিত হবেন। সবাই সদ্য ঘটে-যাওয়া ব্যাপার সাবধানে এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু তবু তাঁদের আনন্দে বিজয়েরই উল্লাস ধ্বনিত হয়ে উঠল—ভোজ ও বিজয়ের সরকারী অনুষ্ঠানে পরিণত হ'ল। অবশেষে, বিপদ থেকে তো রেহাই মিলল, আবার শান্তিতে পানভোজন আর সুখে নিদ্রা তো চলবে। ভোরোর মাটিতে এখনো যাদের রক্ত শুকিয়ে যায়নি, তাদের কথাও উঠে পড়ল। তবে সে সোচ্চার নয়, শুধু ইঙ্গিত মাত্র। তাও আবার বিবেচকের মতই করা হ'ল। সবাই একমত—উপযুক্ত শিক্ষাই তারা পেয়েছে। কিন্তু সবাই তার জন্যে ব্যথিত। গ্রিগোয়েররা প্রস্তাব করলেন, এই যে ক্ষত হ'ল, ধাওড়ায় গিয়ে এর সেবা করাই সকলের কর্তব্য। আবার সেই প্রশান্তি তাঁরা ফিরে পেয়েছেন, আবার বদান্যতার উৎস খুলে গেছে। বীর খনির মজুরদের হয়ে নানা ওজুহাত দেখালেন—আবার তাদের তো খনির তলায় তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন। তারা তো চিরন্তন দাসত্বেরই উদাহরণ। মঁসুর হোমরা-চোমরার দল আবার নিরাপত্তা ফিরে পেয়েছেন। তাই তাঁরা একবাক্যে সায় দিলেন—বেতন-সমস্যাটা খতিয়ে দেখা দরকার। ভর্জিত মাংস পরিবেশিত হ'ল এবার। মঁসিয়ে হানাবু প্রধান ধর্মযাজকের কাছ থেকে পাদরী রাঁভিয়ের পদচ্যুতি-জ্ঞাপক চিঠিখানা পড়ে শোনালেন। বিজয়-উৎসব এইভাবেই সুসম্পন্ন হ'ল। এ অঞ্চলের বুর্জোয়ারা তো পাদরী-কাহিনী শুনে জ্বলে উঠেছিল—সে কি না সিপাহীদের খুনে বলে

ফতোয়া দেয়! তরপরে যখন মিষ্টিমুখের সময় এল, সরকারী উকীল দৃঢ়স্বরে জাহির করলেন, তিনি একজন স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি।

দেনেউলি'ও মেয়ে দুটিকে নিয়ে এসেছেন। এই উৎসবের আনন্দে তিনি নিজের সর্বনাশের দুঃখ চেপে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। ম'তসু কোম্পানির কাছে ভান্দাম বিক্রির কওলায় স্বাক্ষর করেছেন সেদিন সকাল বেলা। তার গলায় ছুরি বসাতে যাচ্ছে কোম্পানি, তবু তিনি পরিচালক মণ্ডলীর সবগুলি দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছেন। তাঁরা এতদিন ধরে যার জন্যে লোলুপ হয়েছিল, সামান্য টাকায় তিনি তা তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এত কম টাকা যে পাওনাদারদের ঋণও শোধ হবে কিনা সন্দেহ। বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বহাল থাকার জন্য তারা এক প্রস্তাবও করে, তিনি শেষ মুহূর্তে তাতেও রাজি হয়ে গেছেন। এ যেন এক আকস্মিক সৌভাগ্য। যে পিটে তিনি তাঁর সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে দিয়েছিলেন, সেইখানেই তাঁকে এক বেতনভুক পদ নিতে বাধ্য হতে হয়েছে। এইভাবেই সামান্য পুঁজির ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হ'ল। এবার থেকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা অদৃশ্য হয়ে যাবে—তাদের উপর পড়েছে অভিশাপ। অতৃপ্ত উদর নিয়ে হাঁ করে আছে ধনবাদ—সে ওদের টুকরো টুকরো গ্রাস করবে। বৃহৎ পুঁজির যে জোয়ার এসেছে, তাতে তারা ভেসে যাবে। ধর্মঘটে তাঁরই তো চরম ক্ষতি হ'ল। ম'সিয়ে হানাবুর সরকারী চাপরাস-প্রাপ্তির স্বাস্থ্যপান তো তাঁরই নিজের বিপর্যয়ে ধনবাদী সমাজের আমোদ-প্রমোদ ছাড়া কিছু নয়। তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা, লুসি আর জিনির যেন এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। অদল-বদল-করা পোষাকে ওদের চমৎকার দেখাচ্ছে। ওরা সর্বনাশের ভিতরেও উচ্চরোলে হাসছে। ওরা বেপরোয়া তরুণী, টাকাকে ওরা তুচ্ছ করে বলেই অমনি করে ওরা হাসতে পারে।

বসবার ঘরে কফি পান করতে চললেন ম'সিয়ে দেনেউলি', এমন সময় গ্রিগোয়ের এসে তাঁর সম্পর্কিত ভাইকে এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

আর কি করবে বল? ম'তসুর শেয়ার বেচে টাকাটা ভান্দামে ফেলাটাই তোমার ভুল হয়েছিল। তুমি নিজেই এই বিপদ টেনে এনেছ, টাকাও উবে গেল, এদিকে মেহনতও যথেষ্ট হ'ল। কিন্তু আমার খনিকে দেখ দেখি—আমার দেরাজের টাকা থেকে কখনো কোথাও নড়ে চড়ে না। আমি তো ওরই দৌলতে নিষ্কর্মা বসে খাচ্ছি। আমার নাতি-নাতনীরাও এমনি খেয়ে পরে যাবে।

দুই

রবিবার রাতে এতিয়েঁ ধাওড়া থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে এল। নির্মেঘ আকাশ, ছড়ানো-ছিটোনো তারার দল। নীচের মাটিতে নীলচে গোধূলি যেন নেমে এসেছে তারার আলোয়। খালের ধারে গিয়ে হাজির হ'ল এতিয়েঁ। খালধার ধরে মার্সিয়েন-মুখো চলতে লাগল। এটি তার প্রিয় সড়ক, জ্যামিতিক রেখার মতো এঁকে-বেঁকে গেছে খাল—গলানো রুপোর পাতের মতো ছড়িয়ে-

ছড়িয়ে পড়েছে অসীম বিস্তারে। তারই ধারে সোজা চলে গেছে ঘাসে-ঢাকা পথ। দৈর্ঘ্যে লীগ-দুই হবে। এখানে কারো সঙ্গে কোনদিন দেখা হয় না। কিন্তু আজ একজনকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে বিরক্তই হ'ল। তারার মিয়নো আলোয় দুই নিঃসঙ্গ পথিক একে অপরকে মুখোমুখী হতে তবে চিনতে পারলে।

তুমি! এতিয়েঁ বলে উঠল।

সুভেরিন জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাঁড়লে। মুহূর্তের জন্য দুজনের গতি স্তব্ধ। তারপর মার্সিয়েনের দিকে পাশাপাশি চলতে লাগল। দুজনেই দুজনের ভাবনায় বিভোর, অন্যের উপস্থিতির বুঝি খেয়াল নেই। এতিয়েঁই প্রথম কথা বললে।

খবরের কাগজে প্লুচার্তের খবর পড়েছ? প্যারীতে জব্বর নাম করেছে।

এতিয়েঁ আবার বললে, বেলভিল্-এর সভার পর মানুষ রাস্তায় ওর জন্যে ভিড় করে ছিল—তারপর ওকে নিয়ে যা কান্ডটা করলে। তাহলে এতদিনে ও একটা কেউকেটা হয়ে গেল, এখন যা মন চায় তাই-ই করবে। তা ওর গলা ভাঙা থাকুক আর না থাকুক।

মিস্ত্রী সুভেরিন কাঁধে ঝাঁকুনী দিলে। সুবক্তার উপর ওর যথেষ্ট ঘৃণা। মানুষ যেমন ওকালতি করতে যায়, ওরা তেমনি ঢোকে রাজনীতির ক্ষেত্রে। কথার পর কথা গেঁথে রোজগার করে।

এতিয়েঁ ডারুইন পড়ছে এখন। পাঁচ-সু'র সুলভ সংস্করণে ডারুইনের সারানুবাদ—জনপ্রিয় সংস্করণ। সে পড়ে অর্ধেকটা হজম করেছে, অর্ধেকটা রয়ে গেছে অজ্ঞাত। কিন্তু তবু বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে, জীবন-সংগ্রামের কথা জানতে পেরেছে, যারা সবচেয়ে যোগ্য তারাই টিকে থাকবে। দুর্বল যে সে গ্রাস করবে হৃষ্টপুষ্ট জীবকে—বলশালী যে সে গিলে খাবে এই জরাজীর্ণ বুর্জোয়াদের। ডারুইনবাদী সোশালিস্টদের উপর তীব্র হয়ে উঠল সুভেরিন—সে তাদের মূর্খতার কথা বললে। ডারুইন তো বৈজ্ঞানিক অসামঞ্জস্যের প্রচারক—তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচন তো অভিজাত বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই প্রযোজ্য। এতিয়েঁ ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে চাইলে, সে নিজের সন্দেহ প্রকাশ করলে এক উদাহরণ দিয়ে!—ধর, পুরানো সমাজ-ব্যবস্থার শেষ টুকরোটুকুও ধসে পড়বে; কিন্তু নয়া দুনিয়ার কি আবার তেমনি অবিচার অন্যায় নিয়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠার ভয় নেই? সেখানে কি কেউ দুঃখী আর কেউ ধনী হবে না, কেউ হবে না সুদক্ষ বুদ্ধিমান—নিজের স্বার্থে সবকিছুকে খাটাবে না—আর আর—একদল হবে না মূর্খ আর অলস—তারাই কি আস্তে আস্তে দাসত্বে নিজেদের বিকিয়ে দেবে না? এই যে চিরন্তন দুঃখদুর্দশার চিত্র উদ্‌ঘাটিত হ'ল, তারই বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে উঠল সুভেরিন। মানুষের পক্ষে ন্যায় যা তা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাহলে মানুষের তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই উচিত। পচাগলা সমাজের বুকে চালাতে হবে নির্মম হত্যাকাণ্ড—যে পর্যন্ত না শেষ মানুষটি ধ্বংস হয়ে যায়, ততদিন অবধি চালাতে হবে। আবার দুজনেই চুপ করে গেল।

সুভেরিন নরম ঘাসের উপর বহুক্ষণ মাথা নীচু করে চলল। চিন্তায় সে বিভোর, জলের ধার ঘেঁষে চলেছে। ছাদের উপর দিয়ে নিশায়-পাওয়া মানুষ

যেমন স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ায়, তেমনি তার নিশ্চিন্ত ভাব। এবার অকারণেই সে চমকে উঠল। যেন ভূত দেখেছে। উপর দিকে তাকালে, মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মৃদুস্বরে সাথীকে বললে,

কি করে ও মরল, সে-কথা কি তোমাকে বলেছি ?

কে মরল ?

আমার স্ত্রী—রাশিয়ায়।

এতিয়েঁর অংগভংগী অস্পষ্ট। সে অবাক হয়ে গেছে ওর গলার স্বর শুনে। কাঁপছে স্বর। হঠাৎ ও যেন নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিতে চায়। অথচ ও তো যেন অচেতন মানুষ, সকলের থেকে আলাদা হয়েই থাকে। ও বুঝি নিজের থেকেও নিজে আলাদা। এতিয়েঁ শুধু জানে 'স্ত্রী' তার প্রেমিকা মাত্র, মস্কৌতে তার ফাঁসি হয়।

সুভেরিন কাহিনী শুরু করে দিলে। তার স্বপ্নময় দৃষ্টি খালের শুভ্র জলরেখার উপর পড়ে আছে। রাতের অন্ধকারে নীলাভ দীর্ঘ গাছের সারের ভিতর দিয়ে দূরে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে জলের রেখা। সে বলতে লাগল, আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। মাটির নীচের একটা গর্তে চোদ্দ দিন কেটে গেছে। এরই মধ্যে একটা রেল-সড়ক উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু রাজার গাড়ি নয়, একটা সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ি উড়ে গেল......তারপরে আনুস্কা গ্রেফতার হ'ল। সে আমাদের রোজ খাবার দিয়ে যেত। চাষী সেজে সে আসত আমাদের কাছে। সে-ই পলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলে, পুরুষ কেউ করতে গেলে মানুষের নজরে পড়ে যেত। আমি বিচারের সময় ছিলাম জনতার ভিড়ে। ছ'দিন ধরে দেখলাম ওর বিচার।

স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, কাশির দমক উঠল।

দু-দুবার চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। ভিড় ডিঙিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবারও ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কি হবে ? একজন কমতি পড়া মানে তো একজন সৈনিক চলে গেল। ওর বড় বড় চোখ দুটি যখন আমার চোখে এসে মিলছিল, তখন তারা যেন বলছিল—না, না অমনটি কোরো না।

আবার কাশির দমক উঠল।

শেষ দিন সেই ময়দানেও ছিলাম। ঝুপঝুপ করে ঝরছিল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ওদের যত ব্যবস্থা সব তছনছ হয়ে গেল। আর চার জনকে ফাঁসি লটকাতে ওদের ঝাড়া বিশ মিনিট সময় লেগে গেল। এরই মধ্যে দড়ি গেল ছিঁড়ে, চতুর্থ জনকে ওরা তখনো নিকেশ করে দিতে পারেনি। আনুস্কায়া তার পালার প্রতীক্ষা করছিল। আমাকে দেখতে পায়নি, তবু ভিড়ের ভিতরে বার বার খুঁজছিল। আমি এবার একটা পিল্‌পের উপর দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও দেখতে পেলে। আর তো আমাদের চোখ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল না। মৃত্যুর পরেও যেন আমার উপর ওর সেই দৃষ্টি অনুভব করলাম। টুপী তুলে ওকে শেষ বিদায় জানিয়ে চলেও এলাম।

আবার বিরতি। খাল বিছিয়ে আছে সাদা সড়কের মতো—দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ওরা হাল্‌কা পায়ে চলতে লাগল। আবার যেন নিঃসংগতা এসে জুড়ে বসেছে। দিগন্তে বিবর্ণ জলধারা যেন আকাশকে ফুঁড়ে দিয়েছে —তার ক্ষত সেখানে আঁকা।

সুভোরিন বলতে লাগল, তার স্বর এখন কঠোর, সেই তো আমাদের শাস্তি। আমরা পরস্পরকে ভালবেসে পাপ করেছিলাম—তাই তো এই শাস্তি। হাঁ, ওর মৃত্যু হয়ে তো ভালই হ'ল, ওর রক্ত বীরদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমারও আর দুর্বলতা নেই। কিছুই নেই আমার। নেই পরিবার, স্ত্রী, বন্ধু, যেদিন নিজের হাতে অন্যের জীবন নেব, বা অন্যের হাতে নিজের জীবন দেব—সেদিন তো হাত আর কাঁপবে না।

এতিয়েং শিউরিয়ে উঠে থমকে দাঁড়াল। রাত বড় ঠাণ্ডা। তর্ক সে করতে চায় না, তবু বললে,

আমরা বহুদূর এসে গেছি, এখন ফিরলে হয় না?

আবার লা ভোরোর দিকে ফিরে চলল দুজনে। কিছুক্ষণ পরে এতিয়েং বললে,

নতুন ইস্তাহার পড়েছ?

সেদিন সকালেই কোম্পানি বড় বড় হলদে রঙের ইস্তাহার লটকে দিয়েছে। এগুলিতে আপসের সুর একটু দেখা যায়, তেমন অস্পষ্টতাও নেই। পরের দিন যেসব মজুর কাজে যোগ দেবে তাদের কার্ড ফেরত নেবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। সব দোষ-ঘাট ভুলে যাবে—এমন কি দলের চাঁইদের পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে।

হাঁ দেখেছি, সুভোরিন জবাব দিলে।

তোমার কি মনে হয়?

আমার মনে হয় এইখানেই এ পালা সাঙ্গ হ'ল। ওরা কালই ভেড়ার পালের মতো সুড় সুড় করে ঢুকে পড়বে। তোমরা সবাই ভীরু—সবাই।

এতিয়েং তার সাথীদের স্বপক্ষে ওজুহাত দেখালে। সাহসী একজনই হয়, কিন্তু উপোসী মানুষের দল তো অসহায়। ওরা লা ভোরোয় এসে পৌঁছল। সে ঐ কালো বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে শপথ করলে, নিজে তো কখনো আর ওখানে ফিরে যাবে না। কিন্তু যারা যাবে, তাদের ক্ষমা করতেও তার বাধবে না। গুজব রটেছে ছুতোর এখনো স্যাফটা মেরামত করেনি। সেই সম্পর্কে সে জিজ্ঞেস করলে। এ কি সত্যি? স্যাফটের কাঠের খাঁচাটার ওপরে মাটির চাপ পড়ে পড়ে সেটা নাকি এমন নুয়ে পড়েছে যে কেজটা পাঁচ মিটার ধরে ঘষড়ে ঘষড়ে চলে? সুভোরিন আবার চুপ করে গেছে, সে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। সে কাল কাজে গিয়েছিল, কেজ এখন চলতে গিয়ে সত্যিই দু'পাশে বেধে যায়, ঘষড়ে ঘষড়ে চলে। ইঞ্জিন-চালককে তাই এই জায়গায় এসে গতি বাড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু উপরওয়ালাদের একথা বলতেই, তারা সেই একই মন্তব্য করেছে—তারা কয়লা চায়, খাঁচার কাঠামোটা পরে মেরামত করলেও চলবে।

এতিয়েং বললে, কিন্তু একদিন তো চুরমার হয়ে যাবেই। তখন তো চমৎকার হবে।

ছায়া-ঘেরা পিটের দিকে তাকিয়ে সুভোরিন উত্তর দিলে, যদি চুরমার হয়েই যায়, তোমার সাঙাৎরা তা জানতে পারবে। তুমি তো ওদের আবার কাজে নামতে বলেছ।

মঁতসুর গির্জার ঘড়িতে ন'টা বাজল। এতিয়েং এবার বাড়ি গিয়ে শুয়ে

পড়বে বলে বিদায় নিতে চাইল। সুভেরিনও হাত বাড়িয়ে না দিয়েই বিদায় নিলে।

আসি। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

কি! চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ, আমার কার্ড ফেরত চেয়েছি। আর কোথাও যাব।

এতিয়েং অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মনে তার ব্যথা। দুঘণ্টা ধরে দুজনে ঘুরে বেড়িয়েছে, তারপরে বন্ধু কিনা এমনি শান্তভাবেই বললে একথা। কিন্তু হঠাৎ বিচ্ছেদ-ব্যথায় বুক যে তার ভরে গেল। ওরা মিতালি পাতিয়েছিল, দুজনেই একসঙ্গে মেহন্নত করেছে। এখন বিদায়-বেলায় ব্যথা তো পাবেই।

চলে যাচ্ছ? কোথায় যাবে?

যাব কোথাও। এখনো জানি না।

আবার দেখা হবে তো?

না—সে আশা নেই।

দুজনে দুজনের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইল, বলার কিছু বুঝি নেই।

তাহ'লে আসি!

এসো।

এতিয়েং ধাওড়ায় গিয়ে ঢুকল। সুভেরিন আবার ঘুরে এল খালের ধারে। আবার একা চলল মাথা নীচু করে। কালোয় কালো আঁধারের সেও যেন এক অঙ্গ; সে যেন রাতের এক সঞ্চরমান ছায়া মাত্র। দূরে ঘড়ি বাজছে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনল। রাত দুপুর বেজে গেল ঘড়িতে। সে এবার খালপাড় ছেড়ে পিট-মুখো চলতে লাগল।

এসময়ে পিট একেবারে ফাঁকা থাকে। শুধু ঘুমন্ত সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুটোর আগে ফার্নেস জ্বলে না—কাজের জন্য তৈরী হয় না পিট। একটা আলমারির পিছনে কোটটা রেখে এসেছে, তারই খোঁজ করতে সে এসেছে—এই কথাই বললে। কোটে মুড়ে সে এনেছে যন্ত্রপাতি। একটা ভোঁড়, একখানা খুদে করাত, একখানা হাতুড়ি আর র‍্যাঁদা তাতে আছে। এবার বাইরে না গিয়ে সে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল। মইগুলো যেখানে আছে সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল। কোটের বান্ডিলটা বগলে নিয়ে সে আলো ছাড়াই নেমে পড়ল। মইগুলো গুণে গুণে ধাপ ঠিক করছে। কেজ এসে তিনশো চুয়াত্তর মিটারে ধাক্কা খায়—এখানে পঞ্চম সারের রোলা আছে। চুয়ান্নখানা মই গুণে গুণে ও এবার হাত বাড়িয়ে রোলার স্ফীতি অনুভব করলে। নুয়ে পড়েছে কাঠামো। এই-ই ঠিক জায়গা।

সুদক্ষ কারিগর যেমন মাথা ঠান্ডা রেখে কাজটার ছক আগে ভেবে নেয়, তেমনি ভেবে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। নিঃসরণী স্যাফট আর প্রধান স্যাফটটির মধ্যে কাঠের দেয়াল, সেই দেয়ালের একখানা তক্তা সে করাত দিয়ে কাটতে লাগল। দু-একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালছে; এই আলো হচ্ছে, এই নিবে যাচ্ছে। সেই আলোর সাহায্যেই দেয়ালের অবস্থাটা কি, সদ্য কতখানি মেরামতি হয়েছে তা দেখে নিলে।

ক্যালে আর ভ্যালোঁসিয়ের মাঝখানে স্যাফট বসানো বড়ই দুঃসাধ্য। এখানে নীচে বয়ে যায় গুপ্ত হ্রদের জলধারা—স্যাফট এরই ভিতর দিয়ে বসিয়ে যেতে হয়। এই জলধারা আবার ছড়িয়ে পড়েছে উপত্যকায়। যদি পিপের কাঠের মতো জুড়ে দেওয়া যায় কাঠ, তাহলে এই ঝরনাধারা ঠেকানো যায়। নইলে খনির ভিতরে এসে হাজির হবে স্রোত, আর স্যাফটাকেও বিচ্ছিন্ন করে দেবে। লা ভোরোর পিটে যখন কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়, তখন দু-দুটো কাঠের দেয়ালও তৈরি হয়েছিল। একটা ছিল স্যাফটের উপরের দিকটার জন্য —সেটা বালি আর সাদা মাটির ভিতর দিয়ে চলে গেছে—যেখানে খড়িমাটির শুরু সেখান অবধি গিয়ে ঠেকেছে। এই দেয়ালে ফুটোফাটা অবধি নেই—জল এসে সবসময়েই এখানে ঘা মারছে—তাই কাঠ ভিজে ভিজে স্পঞ্জের মতো হয়ে আছে। আর নীচু দেয়ালটা ঠিক কয়লার স্তরের উপরেই ময়দার মতো মিহি বালির ভিতর দিয়ে চলে গেছে। বালি নয়, যেন বালির ঢেউ। নীচের দেয়ালের আড়ালে আছে ঝরনাধারা—এক অন্তরালের সমুদ্র—নর্ডের পিটের সে এক ভীতি। সে সমুদ্রে ঝড় বয়ে যায়, আবার ভাঙচুরও হয়, কিন্তু সে অতল, অনাবিষ্কৃত, তার কালো কালো ঢেউ মাটির তিনশো গজেরও নীচে ফুলে ফুলে ওঠে। এমনি এই দেয়ালগুলো এই বিরাট চাপের বিরুদ্ধে মজবুত করেই তৈরি, কিন্তু পুরানো কাঁথিগুলো যখন ধসে যায়, তখন আশে-পাশের মাটির স্তূপ জমে ওঠে—সেইখানেই ভয়। কাঁথি বসে গেলে মাটিতে ফাট ধরে—আর সেই ফাট কাঠের দেয়াল অবধি এগিয়ে আসে—তারপরে দেয়ালেও চাপে চাপে ফাট ধরিয়ে দেয়—আর দেয়াল তখন স্যাফটের ভিতরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ধস নামবারও বড় ভয় থাকে। তাহলেই বন্যা এসে ভরে দেবে পিট, বয়ে আনবে ধস-ভাঙা মাটি আর অন্তঃশীলা ঝরনার ধারা বইবে—আসবে প্রলয়।

যেখানটা কাঠ খুলে ফেলেছিল, সুভোরিন দুদিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে সেই-খানটায়ই বসে পড়ল। কাঠের দেয়াল ক'টা ভাগে বিভক্ত। হঠাৎ পঞ্চম ভাগে নজর পড়ল, কাঠামো থেকে আলগা হয়ে গেছে তক্তাগুলো। কতগুলো কাঠ তো একেবারে জোড়া থেকে খসে পড়েছে। কত যে ছিদ্র হয়েছে তার কি ঠিক আছে। খনির মজুররা একে বলে ফুটোফাটা। আলকাতরা আর তুলো দিয়ে ফুটোগুলো এ'টে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন আর সে আঁটুনি নেই। মিস্ত্রীর সময়ের অভাব, তাই সে কোণে কোণে লোহার পটি মেরে দিয়েছে, স্ক্রুগুলোও ভাল করে এ'টে দেয়নি। ওদিকে আড়ালের বালির সাগরে উঠছে অনন্ত বিক্ষোভ। আর দেয়াল নড়বড়ে হয়ে পড়ছে।

স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে সে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লোহার পাত ক'খানার স্ক্রুগুলো খুলে ফেললে, এবার একটা ধাক্কায়ই এগুলো খুলে আসবে। এ কাজে স্নায়ুর জোরও যথেষ্ট দরকার। সে তো বার চারেক টলে পড়ে যাচ্ছিল, পড়লে একেবারে একশো আশীগজ তলায় গিয়ে ঠিকরে পড়ত। কোন রকমে টাল সামলে নিলে, কাঠের ডান্ডা দুটোর সঙ্গে কেজটা ঝোলানো থাকে, এই দুটোয় ভর করেই কেজ শূন্যে ওঠা-নামা করে। সুভোরিন ওরই একটা আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর ঝুলে ঝুলে চলতে লাগল। কখনো বা ঝুলতে ঝুলতে চলেছে, কখনো বা জিরিয়ে নিচ্ছে কখনো বা কনুই অথবা হাঁটু দিয়ে

ধরে আছে—মৃত্যুর প্রতি এ যেন প্রশান্ত অবজ্ঞা। একটা নিঃশ্বাস এসে গায়ে লাগলেও বুঝি সে তলায় পড়ে যাবে। তিন তিনবার সে পড়েও যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিলে। অকম্পিত, শান্ত সুভোরিন। প্রথমে হাতড়ে বেড়াতে লাগল, তারপরে শুরু হ'ল কাজ। পিছল তক্তার ভিতরে যখনি অসুবিধে হচ্ছে, তখনি জ্বালছে দেশলাই। স্ক্রুগুলো আলগা করে দিয়ে, এবার তক্তার উপর আক্রমণ চালাল। এবার বিপদ আরো বেশি। সে আসল তক্তাখানা খুঁজে বার করল, যার সঙ্গে অন্যগুলো জুড়ে মেলানো হয়েছে। এই-খানাই অন্য তক্তাগুলোর অবলম্বন। এবার শুরু হ'ল ভোঁড় ফোঁড়া, করাত-কাটা। তক্তা কেটে কেটে তার প্রতিরোধশক্তি সে কমিয়ে আনছে। ফুটো আর কাঠের ভিতর দিয়ে এবার শতধারায় ফিনকি দিয়ে ছুটছে জল। চোখে দেখতে পাচ্ছে না সুভোরিন, বরফের মত ঠাণ্ডা ধারায় ভিজে উঠছে। দুটো দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। দেশলাই নেতিয়ে গেছে। ঘন রাত। আর নীচে অতল আঁধারের গহ্বর ওত পেতে আছে।

এবার রাগই হ'ল। অজানা অনুভূতি তাকে পেয়ে বসেছে, তারই মোহে সে মাতাল। এই যে বৃষ্টিধারাময় ভয়ংকর অন্ধকূপ—এ যেন তাকে ধ্বংস-লীলায় উন্মাদ করে তুলেছে। এখানে আক্রমণ চলল দেয়ালের উপরে—এলোপাথাড়ি আক্রমণ। যেখানে আঘাত হানছে, বুঝি সারা দেয়ালটা ওর মাথায়ই ভেঙে পড়বে। উন্মত্ততায় সে অধীর, যেন কোন জীবন্ত দেহে সে বিঁধে দিচ্ছে ছুরির ফলা। এ তার দুশমন, একে সে ঘৃণা করে। সে এই ভোরোকে হত্যা করবে—এই যে পাপ পিট চিরদিন হাঁ করে আছে—এত নরমেধ গ্রাস করেছে—একে তো সে বাঁচতে দেবে না! যন্ত্রের টুকটাক গোনা যাচ্ছে, শিরদাঁড়া এবার সোজা করলে। তারপর চলল হামাগুড়ি দিয়ে। নীচে নামছে, আবার উপরে উঠে আসছে। আশ্চর্য, সে এখনো হুমড়ি খেয়ে পড়েনি। ও যেন এক নিশাচর পাখী। এই উড়ে উড়ে এসে বসছে, আবার উড়ে উড়ে পালাচ্ছে।

এবার শান্ত হয়ে এল রাগ। নিজের উপরই এখন অখুশী। ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে কি কাজটা করা চলে না। হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলে। এবার চলে এল নিঃসরণী স্যাফ্‌টের ভিতরে। তক্তা কেটে যে ফুটোটা করেছিল, সেটা আবার এঁটে দিলে। এই-ই থাক; আর বেশি ক্ষতি করে সে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিতে চায় না। আর তা হলে তো তখন-তখনি মেরামত শুরু হয়ে যাবে। লা ভোরো একটা জানোয়ার। ওর পেটে জখম করে দেওয়া হ'ল; দেখি রাতটা টেকে কি না! ও আঘাতের সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে দিয়ে গেল; ভীত সন্ত্রস্ত দুনিয়া জানুক স্বাভাবিক মৃত্যু জানোয়ারটার হয়নি। ধীরে সুস্থে গুছিয়ে নিলে যন্ত্রপাতি, এবার জামার ভিতরে পুরে ফেলে মই বেয়ে উঠতে শুরু করলে। কেউ তাকে দেখে ফেলেনি। পিট থেকে সে এবার বেরিয়ে এল। পোষাক বদলাবার কথাও তার মনে হ'ল না। রাত তিনটে বাজল। সে পথে প্রতীক্ষায় রইল।

ঠিক এই সময়ে এতিয়েঁও জাগন্ত। চোখে তার ঘুম নেই। কামরায় নেমেছে গহন অন্ধ রাত। সেখানে সামান্য শব্দ উঠতেই সে চমকে উঠল। ছেলেমেয়েদের চাপা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায় আর শোনা যায়

বুড়ো-বনেমোর আর মেয়ু-বৌয়ের নাক-ডাকানি। আর তার কাছে শুয়ে আছে জাঁলিন, তার নাক থেকে উঠছে পিকলু-বাঁশীর শব্দ। স্বপ্ন দেখছে নাকি। পাশ ফিরে শুতেই আবার নাক-ডাকানি শুরু হয়ে গেল। কোথায় যেন খন্ খন্ শব্দ উঠল, কে যেন উঠে বসেছে। এতিয়েঁর মনে হ'ল, ক্যাথেরিন বোধ হয় অসুস্থ।

সে চাপা গলায় শুধালে, কে-তুমি? কি ব্যাপার?

জবাব নেই। আর সবার নাক-ডাকানি অব্যাহত। পাঁচ মিনিট আর সাড়া শব্দটি নেই। আবার খন্‌খন্! এবার সে নিশ্চিত, ভুল তার হয়নি। ঘরের ওপাশে চলে এসে সে আঁধারে হাত বাড়িয়ে দিলে। উল্টো দিকের বিছানা হাতড়ে দেখবে। ক্যাথেরিনকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জেগে বসে আছে।

বেশ তো, রা কাড়লে না কেন? কি করছ বসে বসে?

এবার ক্যাথেরিন বললে,

আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে গেনু গো।

এত রাতে বিছানা ছেড়ে উঠছিলে?

হ্যাঁ, পিটে কামে যাব।

এতিয়েঁ অভিভূত—বিছানার একধারে বসল। ক্যাথেরিন তাকে বুঝিয়ে বললে। এমনি কুঁড়েমির জীবন তার আর ভাল লাগে না। চারদিকে যেন চোখের সার তার দিকে প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে থাকে, তাকে ভৎসনা করে। সে কাজে যাবে, না হয় সাভালের হাতে মারধরই খাবে। তার মজুরির টাকা মা যদি না নেয়, সেও ভি আচ্ছা। সে সোমথ হয়েছে, নিজের পথ নিজেই দেখে নেবে। নিজেই রাঁধবে-বাড়বে-খাবে।

তুমি বিছানায় যাও গো, কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিই। তোমার যদি অতো দয়ামায়া থাকে—কাউকে কথাটি বোলো না।

কিন্তু এতিয়েঁ চলে গেল না। ওর কাছেই বসে রইল। দুঃখে করুণায় সে বিগলিত; আদর করে ওর কোমর দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। বুকে চেপে ধরেছে, দুজনের জামায় জামায় লাগছে ঘসা—পরস্পরের নগ্নদেহের উষ্ণতা অনুভব করছে পরস্পরে। এখনো রাতের ঘুমের আর্দ্রতা সারা বিছানায় লেপা। এবার ক্যাথেরিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলে। তারপর কাঁদতে লাগল। আস্তে আস্তে। সেও এবার গলা জড়িয়ে ধরল এতিয়েঁর, তারপর এক উদগ্র আলিঙ্গনে বেঁধে তাকে কাছে টেনে নিয়ে এল। এতো আলিঙ্গন নয়, আশাহীনার শেষ আশা। এমনিভাবেই কেটে গেল সময়। আর কোন কামনা নেই। ওদের পিছনে পড়ে আছে বিগত দিন আর তার দুঃখ, ভালবাসার অতৃপ্তি। ওদের মধ্যে কি সব শেষ হয়ে গেছে? এখন তো ওরা স্বাধীন—ওরা কি আর কোন দিন আবার পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে? ওদের অতীত ভালবাসায় যদি সামান্য দৈহিক অভিজ্ঞতাও থাকতো, ওরা হয় তো এ লজ্জা কাটিয়ে উঠত। কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিলে, ওদের মিলতে দিলে না। এর কারণ সেই পুরানো সংস্কার। তারা নিজেরাও তার মানে জানে না, বোঝে না।

ক্যাথেরিন ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, যাও, নিজের বিছানায় যাও গো।

আলো জ্বালবনি, মা সজাগ হবে। এখন কাপড়-চোপড় পরব। আমাকে যেতে দাও গো।

এতিয়ে'র ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এখনো জড়িয়ে ধরে আছে। এক অবর্ণনীয় ব্যাথায় ভরে গেছে বুক। তার মনে শান্তি আর সুখের কামনা—যে করেই হোক্ চাই শান্তি, চাই সুখ! নিজের ভবিষৎ জীবনের ছবি দেখতে পাচ্ছে—সে বিয়ে করেছে, সুন্দর একখানি সংসার—আর তো তার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই—শুধু দু'জনে থাকবে, তারপর যখন দিন ফুরিয়ে আসবে—দুজনের হবে সহমরণ। শুকনো রুটি খেয়েই সে খুশী থাকবে, তাও যদি আবার একজনের মতই জোটে—তা হবে ক্যাথেরিনেরই প্রাপ্য। আর কি চাই? জীবনে আর কিছুর কি দাম এর চেয়ে বেশি?

ক্যাথেরিন নিজেকে মুক্ত করে নিলে।

আমাকে যেতে দাও গো!

প্রেমে গদগদ এতিয়েং। সে কানে কানে বললে,

একটু দাঁড়াও। আমিও আসছি।

নিজেই বলে অবাক হয়ে গেল। সে শপথ করেছে, আর কখনো পিটে নামবে না। তাহলে হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত কেন?—কেন এ কথা বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে? একটু দ্বিধা হ'ল না, মনে তর্ক, দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'ল না? অমনি ঘনিয়ে এল প্রশান্তি, সন্দেহ-সংশয় দূরে চলে গেল। সে যেন তেমনি একজন মানুষ—যে উভয় সংকট থেকে উদ্ধারের পথ পেয়ে গেছে—হঠাৎ এসেছে মুক্তির উপায়। ক্যাথি ভয় পেয়ে গেল। সে তার জন্যই জীবন বলি দিতে চলেছে একথা তার মনে হ'ল। পিটে গিয়ে তো ও পাবে শুধু লাঞ্ছনা, অপমান। সেই ভয়েই তো ভীত ক্যাথি। কিন্তু এতিয়েং হেসে উড়িয়ে দিলে। ওরা নোটিস লটকে দিয়েছে, কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। তাই তো এতিয়ে'র কাছে যথেষ্ট।

আমিও কাম করতে যাব। আর কথা নয়! এস, কাপড়-চোপড় পরে নিই।

অন্ধকারে ওরা কাপড়-চোপড় পরে নিলে। দু'জনেই বড় হুঁশিয়ার। ক্যাথেরিন তার পোষাকটা ঠিক করে রেখেছিল সন্ধ্যায়। এতিয়েং আলমারি থেকে বার করলে তার কোর্তা ব্রীচেস। মুখ-হাত ধোয়া-পাখলা হ'ল না। কি জানি যদি শব্দ হয়। সবাই ঘুমন্ত। যেখানে মা ঘুমোয়—সেই ফালি পথটা ওদের পার হয়ে আসতে হবে। এমন বরাত, রওনা হতেই একটা চেয়ারে লেগে হুমড়ি খেয়ে দু'জনেই পড়ে গেল। মা জেগে উঠে ঘুম জড়ানো স্বরে শুধালে,

কে-রে? কি হ'ল?

ক্যাথেরিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সে কাঁপছে, এতিয়ে'র হাত চেপে ধরেছে।

এতিয়েং বললে, আমি। তুমি শুয়ে পড়। গরম লাগছে, তাই বাইরে থেকে একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি।

আচ্ছা!

মেয়ু-বৌ আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ক্যাথেরিনের নড়বারও সাহস নেই।

বহুক্ষণ পরে ওরা নীচে খাবার ঘরে এল। মতসুর এক মহিলার দয়ার দান একখানা রুটি থেকে সে দু-টুকরো রেখে দিয়েছিল। সেই টুকরো দুখানা নিয়ে ওরা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

সুভেরিন আঁভাতাসের সরাইখানার কাছে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আধঘন্টা ধরে সে দেখছে আন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে খনির মজুররা চলেছে কাজে ফিরে। গোরু ভেড়ার পালের মতো পায়ের ভোঁতা আওয়াজ বাজছে পথে। সে গুনছে তাদের, কসাই যেমন তার পশুগুলিকে কসাইখানার মুখে দাঁড়িয়ে গুণে গুণে ঢোকায়—তেমনি করেই শুনছে। সংখ্যা দেখে তাক লেগে যাচ্ছে। সে দুঃখবাদী—কিন্তু ভীরুর সংখ্যা দেখে সেও তাজ্জব বনে গেছে। এত লোক কাজে ফিরে আসবে—এ কথা সে ভাবেনি। মজুরের ভিড় চলেছে কাতারে কাতারে, সে দাঁড়িয়ে আছে দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ তার উজ্জ্বল

সে এবার চমকে উঠল। মানুষ চলেছে, অন্ধকারে মুখ দেখে চেনা যায় না। কিন্তু একজনের চলার ধরণ দেখে চিনে ফেললে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে থামালে।

কোথায় চলেছ ?

এতিয়েঁও চমকে উঠল। সে ওর কথায় জবাব না দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে,

'কি হে, তুমি এখনো ঢোক নি ?'

তার পরে জানালে, সে চলেছে পিটে। শপথ সে করেছিল এ কথা সত্য; কিন্তু যে জিনিস একশো বছর পরে হয় তো আসবে, তার জন্য এখন থেকে তো হাত পেতে বসে থাকা যায় না। তাছাড়া, ব্যক্তিগত কারণও আছে।

সুভেরিন শুনে কেঁপে উঠল। এতিয়েঁর ঘাড় ধরে সে ধাওড়ার দিকে তাকে ঠেলে দিলে।

শোন, বাড়ি যাও ? আমি বলছি—যাও—ভাগ !

এমন সময় এসে দাঁড়াল ক্যাথেরিন। সে তাকে দেখেই চিনলে। এতিয়েঁ প্রতিবাদ জানালে—তার যা খুশি করবে—কাউকে সে হাকিম মানবে না। ইঞ্জিন-মিস্ত্রী চোখ বুলিয়ে ক্যাথেরিন আর এতিয়েঁকে দেখে নিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন তার প্রতিরোধ শক্তি ফুরিয়ে গেছে। সে আত্মসমর্পণ করেছে। যখন পুরুষ তার মনটাকে মেয়ের মনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেয়, তখন তো সে পুরুষ শেষ হয়ে গেল। তার তখন মরাই ভাল। হয়তো তার প্রেমিকাকেও দেখতে পেল বিদ্যুৎ ঝলকের মত। মস্কোর পার্কে সে ঝুলছে ফাঁসি কাঠে।—তার জীবনের শেষ সূত্র এমনি করেই ছিন্ন হয়ে গেছে। সে তো সেই থেকে নিজের আর অন্যের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—খেলতে পারে। সে সহজভাবেই বললে,

বেশ তো, চলে যাও !

এতিয়েঁ বিব্রত, দ্বিধা এসেছে তার। এমনিভাবে চলে যাওয়া যায় না, কিন্তু কথা খুঁজে পেলে না।

সুভেরিন বললে, তাহলে চললে ?

হ্যাঁ। এস, হাতে হাত মেলাও সাথী। ভালাই হোক। কিছু মনে কোরো না !

ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে দিলে স্যুভেরিন। তার সাথী নেই, তার বাঞ্ছিতা নারী নেই...

তাহলে বিদায়!

হ্যাঁ, আসি।

স্তব্ধ হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল স্যুভেরিন। সে দেখছে লা-ভোরোর পিটে ঢুকছে ক্যাথেরিন আর এতিয়েঁ।

তিন

চারটে থেকেই নামা শুরু হয়ে গেল। বাতি ঘরে হাজরে লেখার আফিসে দাঁসার নিজেই হাজির। যে মজুর আসছে, হাজিরা-বইতে তার নাম লিখে রাখছে। হাতে একটা করে বাতি দিচ্ছে। মন্তব্য না করে সবাইকেই সে ভরতি করে নিলে, নোটিসের প্রতিশ্রুতি মেনে চলছে দাঁসার। কিন্তু, ক্যাথেরিন আর এতিয়েঁকে জানালায় দেখে, তার মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠল। রেগে উঠে তাদের ফিরিয়ে দেবারই তার ইচ্ছে, কিন্তু আবার নিজের বিজয়ে সে উৎফুল্ল। ব্যঙ্গভরেই মনে মনে বললে, তাহলে সবচেয়ে জঙ্গী মানুষও লুটিয়ে পড়ল? কোম্পানির তাহলে বরাত ভাল হবে! মঁতসুর জাঁদরেল পালোয়ানটাও এসেছে রুটি মাঙতে! এতিয়েঁ চুপচাপ বাতিটা নিয়ে ক্যাথেরিনের সঙ্গে স্যাফট-এর দিকে চলল।

ক্যাথেরিনের ভয়, এখানেই ওরা সবাই হামলা বাধাবে। ঢুকতেই সে দেখলে জনবিশেক লোকের মাঝখানে সাভাল দাঁড়িয়ে আছে কেজের অপেক্ষায়। সাভাল তাকে দেখেই তেড়ে এল, কিন্তু এতিয়েঁকে দেখেই থেমে গেল। মুখে তার বিদ্রূপের হাসি, কাঁধটায়ও একটা বিশ্রী ঝাঁকুনি দিলে। বহুৎ আচ্ছা! ভারি সে তোয়াক্কা রাখে! বয়েই গেল তার, তাহলে জায়গাটা গরম থাকতে থাকতেই আর-একটা জুটেছে। ভালই হ'ল, আপদ গেল! তা ভদ্দর লোকের যদি এঁটো কাঁটা পছন্দ হয় তো সে তার নিজের ব্যাপার। কিন্তু তাচ্ছিল্য, দেখালেও তারই আড়ালে ঈর্ষা দেখা দিলে। তার চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল। সবাই চুপচাপ, নড়চে-চড়ছে না। নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। আগন্তুকদের দিকে ট্যারচা চোখে তাকাচ্ছে ওরা; বিষণ্ণ মানুষের দল, ক্রোধ নেই। সবারই মুখ স্যাফ্‌টের দিকে ফেরানো। হাতে বাতি; পাতলা কাপড়ের কোর্তা গায়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। কামরায় ঝড়ো হাওয়া। এবার কেজ লাগানো হ'ল, সেখানে ঢোকার হুকুমও মিলল। ক্যাথেরিন আর এতিয়েঁ একটা গাড়িতে কোন রকমে উঠে পড়ল। সেখানে পিয়েরোঁ আর দুজন মাল-কাটা ছিল। তাদের পাশের গাড়িতে সাভাল দাঁড়িয়ে আছে। সে ওদের দেখে মোকে-বুড়োকে বললে, কোম্পানি দাঙ্গাবাজদের না তাড়িয়ে দিয়ে ভুল করছে। কিন্তু বুড়ো সহিস শুধু হাত নাড়লে। আবার তার সেই কুকুরের মতো আত্মসমর্পিত জীবনে সে ফিরে গেছে। তার ছেলেমেয়ের মৃত্যুর কথা ভেবে আর তো সে ক্ষেপে ওঠে না।

কেজ এবার লাগানো সারা। আস্তে আস্তে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। মাঝখানে এসে হঠাৎ এক বিষম ঝাঁকুনি লাগল। লোহার ডাণ্ডা নড়ে উঠল—সবাই হুমড়ি খেয়ে একে অপরের গায়ে গিয়ে পড়ল।

এতিয়েং গোঙিয়ে উঠল, কি হ'ল? ওরা কি আমাদের এমনি করে পিষে দেবে নাকি? ঐ নড়বড়ে কাঠের দেয়াল তৈরি করে রেখেছে, ওরই জন্য পিটের নীচে আমাদের পচতে হবে দেখো! ওরা—আবার মুখ নেড়ে বলে, দেয়াল মেরামত করেছে!

যাহোক, কেজ বাধা পার হয়ে গেল। এবার জলের ধারার ভিতর দিয়ে চলল। মজুররা জলের শব্দ শোনার জন্য কান পেতে রইল। তারা অধীর, অস্থির। তাহলে আরো নতুন ফুটো-ফাটা দেখা দিয়েছে?

পিয়েরোঁ ক'দিন আগে থেকেই কাজে ভিড়ে গেছে। ওরা তাকে সবাই মিলে শুধালে, ব্যাপার কি। সে নিজেও ভয় পেয়েছে। সে-কথা জানাতে চায় না। কি জানি, হয়তো পাঁচ-কান হয়ে কথাটা মালিকদের কানে উঠবে। তাঁরা হয় তো ভাববেন, সেও তাঁদের নিন্দে করছে। তাই সে বললে,

ভয় কিসের! এমনিই তো চেরটা কাল আছে। ফুটো ফাটা মেরামত করার সময় পায় নি।

মাথার উপরে ঝরে পড়ছে মুষলধারে জল। যখন ওরা পিটের তলায় গিয়ে হাজির হ'ল, সে যেন এক মহা প্রলয়। কোন সর্দার যে মই বেয়ে উঠে তদন্ত করবে, তাও মাথায় এল না। পাম্প দিয়েই জল বার করে দেওয়া চলবে—তার পরে রাতের বেলা মিস্ত্রী এসে করবে মেরামতী কাজ। কাঁথিতে কাজ শুরু করতে গিয়ে নানা বাধা এসে হাজির হ'ল। মাল-কাটাদের কাজ শুরু করার আগে ইঞ্জিনিয়ার হুকুম দিলেন, পাঁচ দিন ধরে সবাইকে পিট রক্ষার কাজ করতে হবে। এটাই এখন জরুরী ব্যাপার। প্রতি জায়গায় ধস্ নামছে। পথগুলো একেবারে বন্ধ হয়ে আছে। কয়েক শো গজ ধরে মেরামত করা দরকার। দশজন করে একটা গ্যাঙ্ গড়ে উঠল, প্রতিটা গ্যাঙ্ রইল এক একজন সর্দারের তাঁবে। এবার যেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে, সেখানেই তারা কাজে লেগে গেল। এরই মধ্যে নামা শেষ হয়ে গেছে, তিনশো বিশজন কুলি সবসুদ্ধ নেমেছে পিটে। কাজ যখন পুরো দমে চলতো তখনকার অর্ধেক মানুষ এসে ভরতি হয়েছে।

এতিয়েং আর ক্যাথেরিন যে-গ্যাঙে, সাভালও ভিড়ে গেছে সেখানে। হঠাৎ এসে ভিড়ে যায়নি। প্রথমে সে সাঙাৎদের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, তারপরে ছোট সর্দারকে হাত করে দলে ভিড়ে গেছে। গ্যাঙ তিন কিলোমিটার দূরে উত্তরের কাঁথির একেবারে শেষে গিয়ে হাজির হ'ল। ডিকস-হুৎ-পুমেস স্তরের একটা কাঁথি ধস্ নেমে বন্ধ হয়ে গেছে, সেইটে পরিষ্কার করে ফেলাই তাদের কাজ। শাবল আর গাঁইতি নিয়ে ওরা ধসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতিয়েং, সাভাল আর পাঁচজন কুলি পাথর আর মাটি সরিয়ে দিচ্ছে। ক্যাথি আর দুজন গাড়ি-ঠেলিয়ের সঙ্গে সেই পাথর আর মাটি ঠেলা-গাড়ি ভরতি করে একেবারে পিটের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। কাজ চলছে। কারো মুখে কথা নেই। সর্দার মোতায়েন। কিন্তু ক্যাথির দুই প্রেমিকের ভিতরে তবু ঘুষো-ঘুষির উপক্রম হ'ল। সাভালই পয়লা শুরু করলে। বিড়বিড় করছে, ঐ

বেশ্যাটার সঙ্গে তার কাজ-কারবার শেষ; কিন্তু তবু সে ওকে ছাড়বে না। ও কাছে আসতেই ধাক্কা মারছে। এতিয়েঁ দেখতে পেয়ে শাসালে, সে ওর গায়ে হাত তুলবে তো তাকে দেখে নেবে। দু'জনে দু'জনের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। শেষে তো কাজিয়া বাধে আর কি! দু'জনকে ছাড়িয়ে দিতেই হ'ল।

আটটার সময় দাঁসার এল কাজের তদারকে। তারও তিরিক্ষি মেজাজ। ছোট সর্দারের উপর তম্বি শুরু হয়ে গেল। কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না, এ সব চলবে না। ফিরে-ফিরতি রোলা লাগাতে হবে। সে বলে গেল, ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে ফিরে আসছে। নিগ্রেলের জন্য সকাল থেকে সে বসে আছে। কেন যে সে দেরি করছে বোঝা যাচ্ছে না।

আর এক-ঘণ্টা কেটে গেল। মাটি আর পাথরের জঞ্জাল সরানো বন্ধ রেখে ছোট সর্দার এবার ঠেকনো দেওয়ার কাজে সবাইকে লাগিয়ে দিলে। এমন কি গাড়ি ভরতি-করিয়ে আর ঠেলাওয়ালারাও কাঠ বয়ে আনবার কাজে লেগে গেল। এ এক অন্ধ কাঁথি, বন্ধ কাঁথি। এখানে এই খনির প্রান্ত-সীমায় কুলি গ্যাঙ যেন শেষ চৌকির পাহারাদার। অন্য কাঁথিগুলির সঙ্গে তাদের একেবারে যোগাযোগ নেই। তিন-চারবার দূরে মানুষের ছুটে যাবার শব্দ শুনে ওরা ফিরে তাকিয়ে কান খাড়া করে রইল। কি ব্যাপার? মনে হ'ল, একে একে সবগুলো কাঁথি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে—সবাই ছুটে চলেছে। গভীর নিস্তব্ধতায় মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দ। ওরা আবার সামনে ফিরে কাজ করতে লাগল। হাতুড়ির ঘা ঘূর্ণি হয়ে ঝরে পড়ছে, ঠেকনো লাগানো হচ্ছে। আবার জঞ্জাল পরিষ্কার শুরু হয়েছে। গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেছে পাথর আর মাটি।

ক্যাথেরিন ঠেলা গাড়ি নিয়ে ফিরে এল।

ভয় পেয়ে গেছে। জানালে, পিটের মুখে কেউ নেই।

কত হাঁকডাক দিনু, কেউ রা কাড়লে না গো। সব্বাই চলে গেছে।

ওরা অবাক হয়ে গেল। দশজন কুলিই শাবল-গাঁইতি ফেলে ছুটে যেতে চায়। ওদের খনির তলায় ফেলে রেখে পালিয়েছে সবাই, পিটের মুখ থেকে ওরা এখন দূরে, বহু দূরে। পাগল হয়ে গেল কুলির দল। শুধু বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে সবাই সার বেঁধে ছুটে চলল। পুরুষ, মেয়ে আর বাচ্চারা-সবাই! এমন কি ছোট সর্দারেরও মাথা ঠিক নেই। জোরে হাঁক ডাক পাড়ছে—কাঁথির পর কাঁথির অসীম নিস্তব্ধতায় সে ভীত। কি ব্যাপার? মানুষজন নেই কেন? তবে কি কোন দুর্ঘটনাই ঘটল? বিপদের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে, কিন্তু এখনো তা অস্পষ্ট—তাই তো বেড়ে গেছে ভয়। এক অজানা ভীতির আশঙ্কা যেন দুলে-দুলে উঠছে।

পিটের মুখে এসে ওরা হাজির হ'ল। জলের স্রোত এবার ওদের বাধা দিলে। হাঁটু অবধি জল। ছোটার উপায় নেই। আস্তে আস্তে জলের উদ্দাম স্রোতের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। মনে আশঙ্কা, এক মুহূর্ত দেরি করলে হয় তো মৃত্যু এসে দেখা দেবে।

এতিয়েঁ চেঁচিয়ে উঠল, হা ভগবান, কাঠের দেয়াল বোধহয় ভেঙে গেছে। এইখানেই আমাদের পড়ে থাকতে হবে।

নীচে নামবার পর থেকে পিয়েরোঁ স্যাফ্‌টের দিকেই তাকিয়ে ছিল। জলের ধারা ঝরছে তো ঝরছেই। শুধু তাই নয়। তার গতিও বাড়ছে। আর দু'জন কুলির সঙ্গে গাড়ি ভরতি করতে করতে সে একবার মাথা তুললে। বড় বড় জলের ফোঁটা এসে পড়ল চোখে মুখে। জলের গর্জন এসে বাজল কানে। এতেও সে তত ভয় পায়নি। যখন দেখলে তার পায়ের নীচের গর্তটা জলে ভরে গেল, সত্যিই সে শিউরিয়ে উঠল। জল এবার ছাপিয়ে উঠে লোহার পাতে মোড়া মেঝে অবধি ভাসিয়ে দিলে। তার মানে, ফুটোফাটার বিরুদ্ধে আর যুঝতে পারছে না পাম্প। ক্লান্তিতে বুঝি গোঙাচ্ছে। পাম্পের গোঙানিও শুনতে পেল। এবার সে দাঁসারকে হুঁশিয়ার করে দিলে। সে গাল পেড়ে জবাব দিলে, ইঞ্জিনিয়ার এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন। দু-দু'বার সে শুধালে, দুবারই দাঁসার কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। পিয়েরোঁ ফিরে এল কাজে। দাঁসারের কি দাপট! বলে কি না,—জল বাড়ছে তো কি হয়েছে? সে কি করবে?

বুড়ো মোকে বাতাইলকে নিয়ে এসে হাজির। তার কাজের পালা এবার। কিন্তু দু-হাতে তার রাশ টেনে রাখতে হচ্ছে। ঘুমন্ত বুড়ো জানোয়রটা হঠাৎ জেগে উঠে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। স্যাফ্‌টের দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে কি চীৎকার! যেন মরণ ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে।

আমার বুড়ো পণ্ডিত, কি হ'ল তোর? বিষ্টি দেখে ভয় পেলি?

আয়, এগিয়ে আয়! ওতে তোর কি কাম?

কিন্তু ঘোড়া নড়ে না। সমস্ত দেহটা থরথরিয়ে কাঁপছে। জোর করে ওকে কাঁথিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

বুড়ো মোকে আর বাতাইল কাঁথিতে মিলিয়ে যেতে না যেতেই শূন্যে হঠাৎ শব্দ উঠল। ভাঙনের শব্দ। তার পরেই ধস নামার দীর্ঘ আওয়াজ। কাঠের দেয়ালের এক ভাগ আলগা হয়ে খসে পড়েছে একশো আশী গজ তলায়—পড়তে পড়তে দেয়ালে খাচ্ছে ঘা।

পিয়েরোঁ আর ক'জন কুলি সময় মতো সরে গিয়েছিল। শুধু একখানা ওক কাঠের তক্তা পড়ে একটা খালি গাড়ি চুরমার হয়ে গেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বাঁধ-ভাঙা ধারার মতো জলের বন্যা ধেয়ে এল উপর থেকে নীচে। দাঁসার প্রস্তাব করলে, সে কাছে গিয়ে তদন্ত করবে। কিন্তু এরই মধ্যে আর একটা কাঠ গড়িয়ে পড়ল। দুর্ঘটনায় সে হতচকিত। তাড়াতাড়ি হুকুম দিলে, পিট ছেড়ে সবাই সরে পড়ুক। সর্দারদের কাঁথিতে খবর দিতে পাঠালে।

এবার শুরু হ'ল ভয়াবহ ধস নামা। মানুষের স্রোত কাঁথির পর কাঁথি থেকে ছুটে আসছে। কেজে ওঠার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ বা মই বেয়ে উঠবে বলে ঠিক করলে। কিন্তু তারা নেমে আসতে বাধ্য হ'ল। উপরের পথ বন্ধ। কেজের পর কেজ উঠে যাচ্ছে উপরে। যারা পড়ে আছে, তারা ভয়ে দিশেহারা। যাহোক, একটা খাঁচা তো উপরে উঠে গেল, আর-একটা উঠতে পারবে কি না কে জানে। স্যাফ্‌ট যে মাটি আর পাথরে ভরতি হয়ে আসছে। অবিরাম জলের শব্দ উঠছে, বাড়ছে শব্দ, আর তারই ভিতরে চাপা আওয়াজ। কাঠ ভাঙছে, হুড়মুড় করে পড়ছে। একটা কেজ

অকেজো হয়ে গেল। ভেঙে গেছে, দুটো ডান্ডার সঙ্গে ঝুলে আছে। ডান্ডা দুটোও বুঝি ভাঙা। আর একটা ঘষড়ে ঘষড়ে চলেছে, এখুনি তার পাটাং ছিঁড়ে যাবে। এখনো একশো জন মানুষ উপরে উঠতে বাকি। সবাই হাঁফাচ্ছে, পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছে—রক্ত ঝরছে গা দিয়ে, জলে তারা আধ-ডুবন্ত। দুজন তো কাঠ পড়ে তখন-তখনি মারা গেছে। পঞ্চাশ গজ নীচে জলে পড়ে ডুবে গেছে।

দাঁসার তবু শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। একটা শাবল তুলে নিয়ে সে শাসালে, যে হুকুমের অবাধ্য হবে, তার মাথা সে শাবলের ঘায়ে দুভাগ করে দেবে। ওদের সে সারবন্দী দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে। সে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলে, মাল-কাটারা যাবে সবার শেষে। কিন্তু তারা হুকুম মানবে না। পিয়েরোঁ ভয়ে ফ্যাকাশে মেরে গেছে, সে প্রথম দলেই পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু দাঁসার তাকে আটক রাখার জন্যে এই হুকুম জারি করলে। কেজ যখনি উঠছে, তখনি দাঁসার তাকে দল থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। দাঁসারের নিজেরও দাঁতে দাঁতে বাজনা শুরু হয়ে গেছে। আর এক মিনিটের ওয়াস্তা, তারপরেই জীবন্ত সমাধি হবে। সবকিছু ভাঙছে উপরে, বন্যা যেন স্ফীত নদীর মতো উদ্দাম হয়ে ছুটে আসছে; আর তার সঙ্গে কাঠ-কুটরোর পশলা। এ পশলা মৃত্যু আনে, হত্যা করে। এখনো ক'জন বাকি। তারা ছুটতে ছুটতে আসছে এগিয়ে। দাঁসার ভয়ে পাগল হয়ে গেল। একটা গাড়িতে সে লাফিয়ে উঠে পড়ল। তার পিছনে লাফিয়ে উঠে পড়ল পিয়েরোঁ। কেজ উঠতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে এসে হাজির হ'ল পিটের মুখে এতিয়েঁ আর সাভালের গ্যাঙ। কেজ চলতে তারা দেখেছে, তাই ছুটে এল। কিন্তু কাঠ-কুটরোর পশলার ভয়ে সরেও গেল। ক্যাথেরিন ফোঁপাচ্ছে। সাভাল গাল পাড়তে লাগল। তারা দলে বিশ জন। ঐ পাজী উপরওয়ালারা কি এমনি করে তাদের ফেলে রেখে গেল? বুড়ো মোকেও বাতাইলকে নিয়ে ফিরে এল। তার তাড়া নেই। এখনো রাশ ধরে আছে। ঘোড়া আর মানুষ দুটিই যেন অবাক হয়ে গেছে এই বন্যা দেখে। জল এরই মধ্যে ঊরু অবধি উঠে এসেছে। এতিয়েঁ চুপচাপ। সে এবার ক্যাথেরিনকে কোলে তুলে নিলে। ঊর্ধ্বমুখ বিশজন মানুষ, স্যাফ্‌টের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এখন আর স্যাফ্‌ট নয়, একটা ছোট গর্ত। আর সেই গর্ত থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটছে নদী। উপর থেকে সাহায্য আসার আশা নেই। ভয়ে তারা চেঁচাচ্ছে।

উপরে উঠে এল দাঁসার। দেখতে পেলে নিগ্রেল ছুটে আসছে। বরাত ভাল তার। সেই দিন সকালে হানাবু-ঘরনী বিছানা ছেড়ে উঠেই তাকে আটক রাখলেন। বিবাহের উপহার বাছাইয়ের জন্য তালিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বেলা দশটা বেজে গেল। ছুটে আসতে আসতে সে চীৎকার করে শুধালে, কি ব্যাপার?

পিট সাবাড় হুজুর, সর্দার বললে।

কোন রকমে বলে গেল সর্বনাশের কাহিনী। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বাস করতে চায় না। এর কাঠের দেয়াল আপনা থেকে ধসে পড়তে পারে! নিশ্চয়ই রং চড়িয়ে ফলাও করে বলছে ওরা। ব্যাপারটা দেখা দরকার।

নীচে বোধহয় আর কেউ নেই ?

দাঁসার বিব্রত। না, না, কেউ নেই। তাইত মনে হয়। তবে কেউ পড়ে থাকতেও পারে।

নিগ্রেল খেঁকিয়ে উঠল, তাহলে, তুমি উপরে উঠে এল কেন ? নিজের লোকদের ফেলে আসা তো ঠিক নয়। তা তো হতে পারে না।

বাতি গুণে দেখার হুকুম হ'ল। সকালে তিনশো বাইশটা বাতি বিলি হয়েছিল, এখন দুশো পঞ্চান্নটা শুধু পাওয়া গেল। কেউ কেউ বললে, যা ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়েছিল, তারা বাতি ফেলেই ছুটে এসেছে। মজুরদের সবাইকে ডেকে জড়ো করার চেষ্টা হ'ল, কিন্তু তবু গুনতিতে পুরো পুরি দাঁড়াল না। কেউ কেউ চলে গেছে, কেউ বা হাঁকডাক শুনতে পেলে না। হারানো লোকের সংখ্যা সম্বন্ধে কেউ একমত নয়। বিশজন হতে পারে, আবার চল্লিশজনও হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার স্পষ্ট বুঝলে, নীচে এখনো মানুষ রয়ে গেছে। তাদের চীৎকার জলের শব্দ আর কাঠ-কুটরোর আওয়াজ জানলার ভিতর দিয়ে কানে এসে বাজছে। স্যাফ্‌টের মুখে ঝুঁকে পড়লেই সে-চীৎকার শোনা যায়।

নিগ্রেল ভাবলে, মঁসিয়ে হানাবুকে খবর দিয়ে আনায়। তিনি এসে পিট বন্ধ করে দেবার হুকুম দেবেন। কিন্তু তারও উপায় নেই। বড় দেরি হয়ে গেছে। কুলিরা এরই মধ্যে দুশো চল্লিশ নম্বর ধাওড়ায় চলে গিয়ে সর্বনাশের কথা রটিয়ে দিয়েছে বস্তিতে বস্তিতে। ছেলে মেয়ে বুড়োর দল টিলা বেয়ে ছুটে নেমে আসছে চীৎকার করতে করতে। কান্নার রোল পড়ে গেছে। ওদের হটিয়ে দিতে হবে। একদল ওভারসিয়ারকে পাঠান হ'ল ওদের রুখতে। ওরা এসে আবার কাজে বাধা না দেয়। কুলি আর কামিনের দল যারা উদ্ধার পেয়েছে, তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পোষাক-আষাক ছাড়বার কথা ভুলে গেছে। ঐ সর্বনাশা গহ্বরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। ওখানেই আর একটু হলে চিরদিনের মতো তারা গোর চাপা পড়ত। মেয়েরা ওদের আশে পাশে ঘুরঘুর করছে, কাকুতিমিনতি করছে। কারা উঠে এল কারা পড়ে রইল তাদের নাম জানতে চায়। অমুক আছে নাকি গো ওখানে ? আছে নাকি ঐ অমুক মরদ ? কে কে পড়ে রইল গো ? ওদের নাম মনে নেই। বিড়বিড় করে কি বলছে নিজেরাই জানে না। থর থর করে কাঁপছে, পাগলের মতো ওদের অঙ্গভঙ্গী। যেন ঐ ভাবেই সেই ভয়াবহ দৃশ্য ওরা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায়। জনতা দ্রুত বেড়ে উঠছে, কাছে পথ থেকে উঠল উচ্চরোলে কান্না। বনেমোরের সেই পিটের পাড়ের ডেরায় সারাক্ষণ বসে আছে একটি মানুষ। সে সুভোরিন। চলে যায় নি। দেখছে, নজর রাখছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েরা চীৎকার করে উঠল, নাম বল গো, নাম বল !

নিগ্রেল একবার এসে দেখা দিয়ে বললে, নাম জানতে পেলেই বলা হবে। এখনো আমরা হাল ছেড়ে দিইনি। সবাই উদ্ধার পাবে। আমি নিজে নীচে নামব।

জনতা অপেক্ষমান। নিঃশব্দ ব্যথায় অধীর। ইঞ্জিনিয়ার ধীর, স্থির। নামবার তোড়জোড় করছে। কেজ আগেই খুলে নেওয়া হয়েছিল। এবার

আবার ঝুলিয়ে দেবার হুকুম হ'ল। একটা গাড়ি জুড়ে দেওয়াও হ'ল। জলে বাতি নিবে যেতে পারে ভেবে সে গাড়ির নীচে আর একটা ঝুলিয়ে নিলে। সেখানে জল ঢোকবার ভয় নেই।

সর্দারেরা তোড়জোড়ে সাহায্য করছে। তাদের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে মেরে গেছে। থরথর করে কাঁপছে তারা।

নিগ্রেল হঠাৎ বলে উঠল, দাঁসার, তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

তাকিয়ে দেখলে, কারো সাহস নেই। বড় সর্দার দাঁসার কাঁপছে, ভয়ে সে হতবুদ্ধি। সে ঘৃণাভরে তাকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

না, দরকার নেই। তুমি বাধা হয়েই দাঁড়াবে। আমি একাই যাব।

তারের সঙ্গে ঝুলছে ছোট টব-গাড়িখানা। এক হাতে বাতি আর আর-এক হাতে সংকেত রজ্জু ধরে সে ইঞ্জিনম্যানকে হুকুম দিলে।

ইঞ্জিন টব-গাড়িখানাকে চালিয়ে দিলে। গহ্বরের ভিতরে মিলিয়ে গেল নিগ্রেল। সেখান থেকে উঠছে অবরুদ্ধ মানুষের চীৎকার। এখনো সে-চীৎকার শোনা যায়।

স্যাফটের উপর দিকটায় কোন ক্ষতিই হয় নি। কাঠের দেয়াল সেখানে অটুট আছে। ঝুলতে ঝুলতে চলেছে শূন্যে নিগ্রেল, বাতি এপাশে-ওপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। জোড়ের মুখে মুখে ফুটোফাটা কম, তাই বাতি নিভে গেল না। এবার তিনশো গজ নীচে এল। এখানে নীচের দেয়াল শুরু হয়েছে। যেমনটি ভেবেছিল, ঠিক তাই হ'ল। বাতি নিবে গেল, টব-গাড়ি ভরতি হয়ে গেল জলে। এখান থেকে বাড়তি বাতিটাই হ'ল তার আলোর একমাত্র উৎস-তার একমাত্র সম্বল। অন্ধকারে সেই আলোই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সে সাহসী, কিন্তু পরিপূর্ণ সর্বনাশের উপলব্ধি তাকে স্তব্ধ করে দিলে। কেঁপে উঠল নিগ্রেল। শুধু ক'খানা কাঠ এখনো ঠিক জায়গায় আছে। অন্যগুলো কাঠামো সুদ্ধ পড়ে গেছে। যেখানে তারা ছিল, এখন সেখানে বিরাট গহ্বর হাঁ করে আছে। আর সেই গহ্বর থেকে বেরুচ্ছে রাশি রাশি মিহি ময়দার মতো হলদে বালি। আর সেই অন্তঃলীন সমুদ্রের ধারা তার রহস্যময় ঝড় আর জাহাজডুবির সর্বনাশা ভীতি নিয়ে বাঁধভাঙা ধারার মতো ছুটে আসছে— শতধারায় ঝরে পড়ছে। সে আরো নীচে এল, স্ফীত গহ্বরগুলির একেবারে ভিতরে। স্ফীতি শুধু তাদের বেড়েই চলেছে। নিগ্রেল জলের তোড়ে সে ঘূর্ণিত এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ছে, ঘূর্ণায় ঘূর্ণিত হচ্ছে। তার নীচে ঝুলছে বাতির লাল তারা। কিন্তু সে তো ম্লান হয়ে গেছে। তাই এখন দীর্ঘ ছায়ার ভিড়। আর সেই ছায়া যেন দূরে কোন ধ্বংসীভূত নগরের অলিগলি আর বাগ-বাগিচার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এ মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। শুধু একমাত্র আশাই এখন আছে। যারা বিপদে পড়েছে, তাদের উদ্ধার। নীচে নামতে নামতে চীৎকার আরো জোরালো হয়ে উঠল। হঠাৎ সে থেমে পড়ল, থেমে পড়তে বাধ্য হ'ল। স্যাফ্‌টের পথে এক দুরন্ত বাধা। এক গাদা কাঠ-কুটরো পড়ে পথ আটক করে আছে। কাঠের দেয়াল, ভাঙা, জয়েস্ট পাম্পের তামার পাত, আরো কত কি! সে বহুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল। মনে ব্যথা। হঠাৎ থেমে গেল আর্তনাদ। জল ক্রমেই বেড়ে উঠছে, হত-

ভাগ্যেরা এখন কাঁথিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মাথা সমান জল না উঠলেই তা সম্ভব।

নিগ্রেল হার মানলে। সংকেত-রজ্জুতে মারলে টান। তাকে উপরে তুলে নিক। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে থামাবার হুকুম দিলে। সর্বনাশের এই আকস্মিকতায় সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। এর কারণ বোঝা তো বুদ্ধিরও অগম্য। তবু সে বুঝতে চায়, বার করতে চায় কারণ। এখনো কাঠের দেয়ালের যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেইটুকু পরীক্ষা করতে লেগে গেল। দূর থেকেই কাঠের কাটা দেখে অবাক হয়ে গেল। বাতিটা স্যাঁতস্যাঁতে আব-হাওয়া নিবুনিবু হয়ে এসেছে। সে আঙুল দিয়ে তাই কাটা জায়গাটা দেখতে লাগল। এযে করাত কাটা দাগ। নির্ঘাত করাত কাটা! ভ্রমর দিয়েও ফোঁড়া হয়েছে। এক কথায় ধ্বংসের পুরোপুরি আয়োজন—একেবারে ডাহা দুশমনি। স্পষ্ট বোঝা গেল, এ সর্বনাশ আগে থেকে পরিকল্পিত—ছক কাটা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এমন সময়ে শেষ কাঠামোটাও ধসে পড়ে গেল, তারই ধাক্কায় সেও পড়ে যাচ্ছিল। সাহস উবে গেছে। যে এমন কাজ করেছে, তার কথা ভেবে চুল খাড়া হয়ে উঠেছে ভয়ে, রক্ত হিম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, শয়তান বুঝি এখনো লুকিয়ে আছে ছায়ার ভিড়ে। এক সীমাহীন ভয়ংকর তার রূপ। সে বুঝি এক সঙ্গে গোর চাপা পড়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। চীৎকার করে উঠল নিগ্রেল, সংকেত-রজ্জু ধরে জোরে মারলে টান। এই তো সময়। একশো গজ উপরে কাঠের দেয়ালটাও নড়ে নড়ে উঠছে। তক্তার জোড় খুলে খুলে যাচ্ছে, আলগা হয়ে আসছে স্ক্রুপ। আর ফিনকি দিয়ে ছুটছে জলের ধারা। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তার পরেই গোটা স্যাফ্‌টা হুড়মুড় করে ধসে পড়বে।

উপরে মঁসিয়ে হানাবু নিগ্রেলের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কি ব্যাপার? শুধালেন।

ইঞ্জিনিয়ার উত্তর দিতে পারলেন না। তার জবাব বন্ধ হয়ে গেছে, সে প্রায় মূর্ছাহত।

এ হতে পারে না, অসম্ভব, মঁসিয়ে হানাবু বলে উঠলেন। তুমি ভাল করে দেখেছ?

নিগ্রেল মাথা নাড়লে। তার দৃষ্টিতে হুঁশিয়ারী। সর্দাররা কান পেতে আছে, তাদের সামনে সে বলতে চায় না। মামাকে দশ গজ দূরে নিয়ে গেল। কিন্তু এত বুঝি বেশি দূর নয়। তাই আরো দূরে নিয়ে চলল। তার পরে ফিসফিসিয়ে বললে সর্বনাশের কথা। তক্তা করাত দিয়ে কাটা হয়েছে, ভ্রমর ফোঁড়া হয়েছে। পিটের তলায় কে হেনেছে ঘা, ক্ষত হয়েছে। সেই ক্ষত দিয়ে ঝরছে রক্ত। গোঙাচ্ছে পিট।

ম্যানেজারের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাঁরও স্বর চাপা, এই বিরাট বিপর্যয়ের ভিতরে তাঁকে শান্ত হয়েই থাকতে হবে। মঁতসুর দশহাজার মজুরের সুমুখে তিনি তো আর থরথরিয়ে কাঁপতে পারেন না। পরে দেখা যাবে! দুজনে কানাকানি চলল। তাঁরা অবাক; কার এমন মজবুত স্নায়ু যে নেমে গিয়ে শূন্যে ঝুলে থেকে এমন সর্বনাশ করলে! এরই মধ্যে যে বিশবার মরতে পারত লোকটা। এ উন্মাদনার কারণ যে বোঝা যায় না।

প্রমাণ পেয়েও যে বিশ্বাস করা চলে না। প্রসিদ্ধ পলায়নের কাহিনীতে বন্দীরা মাটি থেকে তিরিশ গজ উঁচু জানালা গলে লাফিয়ে পড়ে, পালিয়ে যায়, একথা যেমন বিশ্বাস করতে মন চায় না—এত যেন তাই।

সর্দারদের কাছে ফিরে এলেন মঁসিয়ে হানাবু। মুখ তাঁর উদ্বেগে বিকৃত। হতাশ হয়ে তিনি তখুনি পিট ছেড়ে চলে আসার হুকুম দিলেন। এক শব-যাত্রা শুরু হয়ে গেল। নিঃশব্দে সবাই পিট ছেড়ে চলেছে। পিছন ফিরে তাকাচ্ছে বিরাট ইটের বাড়িটার দিকে। সেখানে আর জনমানব নেই। এখনো তবু দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা, কিন্তু তার উদ্ধারের আশা লুপ্ত হয়ে গেছে।

ম্যানেজার আর ইঞ্জিনিয়ার সবার শেষে পিট ছেড়ে চলে এলেন। জনতা তাঁদের ঘিরে ধরল। আবার সেই একঘেয়ে চীৎকার।

নাম চাই গো; নাম চাই! নাম, নাম?

প্রতীক্ষারত মেয়েদের দলে এসে এরই মধ্যে ভিড়ে গেছে মেয়ু-বৌ। রাতের সেই শব্দের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার মেয়ে আর ভাড়াটে দুজনেই নিশ্চয় এসে এখানে নেমেছে। প্রথমে সে তো চেঁচিয়েই উঠেছিল, নেমেছে, ভালই হয়েছে। ওখানে ওদের গোর চাপা পড়ে মরাই ভাল। ও দুটোর মন বলে বালাই নাই, একেবারে ভীরু যাকে বলে ওরা তাই। কিন্তু তবু আর সবার সঙ্গে সেও ছুটে এসেছে। এখন তো পয়লা সারে এসে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে ও কাঁপছে। আর সন্দেহেরও অবকাশ নেই। চারিদিকে চলছে আলোচনা। যারা নীচে পড়ে আছে, তাদের নামও জানা গেছে। হ্যাঁ, ক্যাথি তো আছেই, এতিয়েঁ-ছোঁড়াও আছে—একজন সাঙাৎ তো দেখেছে ওদের। আর সকলের সম্বন্ধে ওরা একমত নয়। কিন্তু এদের দুজনের সম্বন্ধে ওরা নিশ্চিত। না, না, সে নয়, আর একজন। সাভালও আছে না কি? একটা গাড়ি-ঠেলিয়ে ছোঁড়া তো দিব্যি গেলে বললে, সে সাভালের সঙ্গেই নেমেছিল। লেভাক-বৌ আর পিয়েরোঁ-বৌয়ের আপনজন কেউ বিপদে পড়েনি, তবু তারাও আর সবার মতোই কান্না জুড়ে দিলে। জাচারি পয়লা দলেই উপরে উঠে এসেছে। সব ব্যাপারেই হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া তার স্বভাব। কিন্তু এখন সেও কাঁদতে-কাঁদতে মা-বৌকে চুমু খেল। মার পাশে এসে দাঁড়াল, তার দুঃখের ভাগী হ'ল। বোনের প্রতি এক অপ্রত্যাশিত স্নেহে সে অধীর। সরকারী বিজ্ঞপ্তি না-পাওয়া অবধি কিছুতেই বিশ্বাস করলে না, তার বোন নিচে পড়ে আছে।

নাম বল গো, নাম বল! দোহাই ভগমানের দোহাই—নাম গুলান বলে দাও!

নিগ্রেল আর সইতে পারলে না, সে ওভারসিয়ারদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল,

ওদের থামাতে পার না? আর তো সহ্য হয় না। শোন, কে-কে নিচে পড়ে আছে জানি না।

দু'ঘণ্টা ধরে এমনি চলছে। এই আকস্মিক বিপর্যয়ে পুরানো রিকুইলার খনির আর একটা স্যাফ্‌টের কথা কারো মনে পড়েনি। সেই দিক দিয়েই উদ্ধারের চেষ্টা হবে, মঁসিয়ে হানাবু একথা ঘোষণা করতে যাবেন, এমন সময় আর এক গুজব রটে গেল।—পাঁচজন না কি জলের তোড় এড়িয়ে ভাঙাচোরা

মই বেয়ে সেই অব্যবহৃত পথে উঠে এসেছে। এদের মধ্যে বুড়ো মোকেও নাকি আছে। সবাই অবাক হয়ে গেল। কেউ জানত না, বুড়ো নিচে পড়ে আছে। কিন্তু পাঁচজনের মুক্তির কাহিনী শুনে কান্না আরো বেড়ে গেল। আর পনেরো জন সাথী তো পালিয়ে আসতে পারেনি। তারা এগুতে গিয়ে ভুল পথে চলে গেছে, ধস নেমে কেউ বা আটক পড়েছে। আর তাদের সাহায্য করবারও উপায় নেই। এরই মধ্যে রিকুইলারে জল দাঁড়িয়েছে দশ গজ। নামও জানা গেল এবার। জবাই-করা মানুষের গোঙানিতে বাতাস বিদীর্ণ।

নিগ্রেল খেঁকিয়ে উঠল, ওদের চুপ করাতে পারবে কি না বল? হটিয়ে দাও ওদের। একশো গজ তফাৎ যাক! বিপদের ভয় আছে। হটিয়ে দাও, হটিয়ে দাও!

হতভাগ্যদের হটিয়ে দেওয়া দরকার। নতুন সর্বনাশের আশঙ্কায় ওরা অধীর—ওদের হটিয়ে দেবার মানে তো আলাদা। মৃত্যুর কথা মালিক চাপা দিতে চায়। সর্দারেরা ওদের বুঝিয়ে দিলে তা নয়। স্যাফ্‌ট যদি ধসে পড়ে তো সমস্ত খনিই ধসে পড়বে। ওরা কথাটা শুনে ভয়ে হতবাক্ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে পিছু হটে এল, কিন্তু পিছু হটাবার জন্য পাহারাদারের সংখ্যা দুগুণ বাড়িয়ে দিতে হ'ল। জায়গাটার প্রতি ওদের কেমন এক মোহ দেখা দিয়েছে। তাই ওরা নিজেদের অজান্তেই ফিরে-ফিরে আসছে। হাজার হাজার মানুষ পথে করছে ভিড়, ঠেলাঠেলি করছে। সবগুলি ধাওড়া থেকে এসেছে মানুষ, এমন কি মঁতসু থেকেও এসেছে। আর পিটের পাড়ের ডেরায় বসে আছে সেই মেয়েলী চেহারার সুশ্রী মানুষটি। একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে। তার বিষণ্ণ দুটি চোখ পিটের উপর নিবন্ধ। এক লহমার জন্যেও সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না।

এবার শুরু হয়ে গেল প্রতীক্ষা। দুপুর। কারো পেটে দানা পড়েনি। কেউ বাড়ি যায়নি। মরচে-রঙা মেঘ আস্তে আস্তে ধূসর, ধূমল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। রাসেনারের সরাইখানার বাগিচার আড়াল থেকে আসছে প্রকাণ্ড এক কুকুরের ঘেউ-ঘেউয়ানি। জনতার গন্ধ পেয়ে কুকুরটা সোরগোল তুলেছে। জনতা আস্তে আস্তে পাশের মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ছে। পিটের চারিদিকে একশ গজ ঘিরে এক বৃত্ত রচিত হয়েছে। তারই কেন্দ্রে শূন্য লা ভোরো। সেখানে জনমানব নেই, টুঁ শব্দটি নেই। এক যেন মরুভূমি। দরজা-জানালা খোলা, ভিতরের পরিত্যক্ততা দৃশ্যমান। পাটকিলে রঙের একটা বেড়াল সর্বনাশের আঁচ পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে পালাল। বয়লারের আগুন এখনো নেবেনি। লম্বা ইটের চোঙগুলো এখনো হালকা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উগরে দিচ্ছে। কালো মেঘে থমথমে-আকাশ, তারই গায়ে হালকা ধোঁয়ার কুণ্ডলী লেগে লেগে আছে। মোরগের তীক্ষ্ণ, তীব্র চীৎকার ভাসছে বাতাসে। এই বিস্তীর্ণ বাড়ির সার এখন মুমূর্ষু, ওদের একমাত্র মৃত্যুআর্তনাদ বেজে উঠছে ঐ চীৎকারে।

বেলা দুটো বাজল। কোন পরিবর্তন নেই। মঁসিয়ে হানাবু, নিগ্রেল আর অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারের দল তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন অ-কুস্থলে। ফ্রক-কোট আর কালো টুপী পরা উপরওয়ালার দল এসে দাঁড়ালেন জনতার পুরোভাগে। চলে যাবার উপায় নেই, ক্লান্তিতে পা যেন ভেঙে যাচ্ছে, সর্বনাশের মুখো-

মুখি ও'রা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন, মাঝে-মাঝে ফিসফিস করছেন নিজেদের মধ্যে। যেন কারো অন্তিম শয্যার পাশে তাঁরা হাজির। জোরে কথা বলার সাহস নেই। এরই মধ্যে উপরের দেয়ালের বোধহয় সবখানিই ধসে পড়ে গেছে। ও'রা হঠাৎ হুড়মুড় শব্দ শুনতে পেলেন, গহ্বরের গভীরে উঠল প্রতিধ্বনি। তারপরে দীর্ঘ—দীর্ঘ স্তব্ধতা। ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে, ক্ষত হয়ে উঠছে গভীর থেকে গভীরতর। ধস নামছে নিচে, ক্রমেই উপরে উঠে আসছে—এবার উপরে ধরবে ফাট—ধস্ নামবে।

নিগ্রেল অসহিষ্ণু, অস্থির; সে দেখতে চায়। সে একাই এগিয়ে চলল সেই ভয়ংকর গহ্বরের মুখে। আর সবাই তার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে এলেন। লাভ কি ? সে তো কিছু করতে পারবে না। তবু, একজন কুলি সর্দারদের বৃত্ত এড়িয়ে শেডে ছুটে চলে গেল। আস্তে আস্তে ফিরেও এল। সে তার কাঠের গোড়াতোলা জুতো আনতে গিয়েছিল।

তিনটে বাজল। এখনো কোন পরিবর্তন নেই। এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে গেল জনতা, তবু এক পা পিছু হটলে না। রাসেনারের কুকুরটা আবার ঘেউঘেওয়ানি শুরু করে দিয়েছে। তিনটে বেজে বিশ মিনিটে মাটি কে'পে উঠল; বোঝা গেল। ভোরো টলমল করে উঠল, তবু এখনো মজবুত পিট, এখনো খাড়া আছে। তখন-তখনি আবার দু-নম্বর ধাক্কা। বিস্ময়াহত জনতার ভিতর থেকে উঠল দীর্ঘ চীৎকার। আলকাতরা-মাখা স্ক্রিনিং শেড দুবার টলমল করে ভয়ংকর শব্দে ভেঙে পড়ল। তারই চাপে গুঁড়িয়ে গেল কাঠামো, এমন-ভাবে ভাঙা-কড়ি বর্গায় কড়ি বর্গায় ঠোকাঠুকি লেগে গেল, স্ফুলিঙ্গের ঝরণাধারা যেন উৎসারিত হয়ে পড়ল। তারপর থেকে অবিরাম কাঁপতে লাগল মাটি। নিচে ধস নামে আর মাটি কাঁপে। এ যেন এক বিস্ফূর্ত আগ্নেয়-গিরি। দূরে আর কুকুর ঘেউঘেউ করে না, এখন কান্না জুড়ে দিয়েছে উচ্চ-রোলে। আসন্ন ভূমিকম্পের টের সে পেয়েছে, তারই সূচনা করছে কান্নায়। মেয়েরা আর ছেলেপুলেরা ভূমিকম্পের প্রতি কম্পনে চীৎকার করে উঠছে। দশ মিনিটও লাগল না, গম্বুজঘরের শ্লেটের ছাদ ভেঙে পড়ল, রিসিভিং আর ইঞ্জিনঘরের দেয়াল দু-ভাগ হয়ে গেল। তারপরে সব চুপচাপ। আর ধস্ নামছে না। মৃত্যুময়ী স্তব্ধতা আবার ঘিরে এল।

এক ঘণ্টা ধরে এমনি ভাবেই রইল লা ভোরো। বর্বরজাতির আক্রমণে যেন বিপর্যস্ত নগরী। আর চীৎকার উঠছে না। শুধু দর্শকদের বৃত্ত এখন আরো দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাঁরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এক সময়ে যেটা ছিল স্ক্রিনিং শেড, এখন সেখানে শুধু আছে ভাঙাচুরো কড়িবর্গা; তারই ভিতর দিয়ে উ'কিঝু'কি মারছে ভাঙা ক্রাডল আর দোমড়ানো কপিকলগুলি। রিসিভিং ঘরে এখন জঞ্জালের স্তূপ জমে উঠেছে। ইটবৃষ্টি হয়ে গেছে সেখানে, দেয়াল আর পলেস্তারার বেশির ভাগই এখানে এসে জমা হয়েছে। হেড-গীয়ারের লোহার খাঁচাখানা এখন পিটের ভিতরে চাপা পড়ে গেছে। এখনো একটা কেজ ঝুলে আছে দেখা যায়, একটা ছে'ড়া তারও ঝুলছে। গাড়িগুলি চূর্ণবিচূর্ণ, ধাতুর পাত আর মইয়েরও কোন পাত্তা নেই। কেন যেন এখনো বাতিঘরটা দাঁড়িয়ে আছে, বাঁ দিকে এখনো দেখা যায় উজ্জ্বল বাতির সার। ইঞ্জিনঘরও ভেঙে গেছে। মনে হয় যেন জানোয়ারের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে,

তবু এখনো ইঞ্জিনখানা তার দৃঢ় আসনে অটুট আছে। তামার কাজ এখনো ঝকমক করছে, আর ইস্পাতের বিরাট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনো ধ্বংসহীন মাংসপেশীর মত দেখা যাচ্ছে। বিরাট ক্রেনটা শূন্যে নুয়ে আছে, দেখে যেন মনে হয় কোন দৈত্যের একখানা শক্তিশালী জানু—দৈত্য জানু তুলে করছে বিশ্রাম।

একঘণ্টা ধরে সব চুপচাপ। ভাঙচুর আর চলছে না। মঁসিয়ে হানাবুর বুঝি আবার আশা ফিরে এল। মাটির টাল-মাটাল বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে ইঞ্জিন আর বাকি পিটটা বুঝি রক্ষা পেল। তবুও তিনি কাউকে এগিয়ে যেতে নিষেধ করলেন। আরো আধঘন্টা দেখা যাক। কিন্তু এ প্রতীক্ষা অসহ্য। নতুন আশা উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে। দ্রুত স্পন্দন উঠছে মানুষের বুকে। দিগন্ত থেকে ছুটে এল একখানা ঘন কালো মেঘ, অকাল গোধূলিই নিয়ে এল। মাটির নিচের তুফানে ধ্বংস হয়ে গেছে পিট, আর সেই ধ্বংসের উপর নেমে এল অশুভ রাত্রি। সাত ঘন্টা ধরে সবাই এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নড়ে চড়েনি। খায়-দায়নি।

এবার সাবধানে এগিয়ে চললেন ইঞ্জিনিয়ারের দল। এমন সময় আবার মাটি এক বিরাট বিক্ষোভে কেঁপে উঠল। তাঁরা পালিয়ে এলেন। মাটির অন্তরালে নির্ঘোষ বেজে উঠল, যেন এক বিরাট গোলান্দাজ বাহিনী উপসাগর লক্ষ্য করে তোপ দাগছে। উপরের শেষ বাড়িগুলোও টলতে টলতে ভেঙে পড়ল। এক ঘূর্ণিঝড় এসে স্ক্রিনিং শেডের আর রিসিভিংরুমের ধ্বংসস্তূপ উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। এবারে বয়লার ঘর খানখান হয়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তারপরে সেই চৌকো গম্বুজঘর, যেখানে ধুক ধুক করে হাঁপ ছাড়ত পাম্পটা—গুলী-বেঁধা মানুষের মতো সেটা লুটিয়ে পড়ল। তারপরে আর-এক ভয়াবহ ব্যাপার। ওরা চেয়ে দেখলে, ইঞ্জিনটা তার দৃঢ় আসন থেকে খসে এল, তার ভিত্ থেকে উপড়ে পড়ল। তখনো আহত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুঝছে। ছুটছে ইঞ্জিন, ছড়িয়ে দিচ্ছে তার থাবা। যেন ভর দিয়ে উঠে পড়বে। কিন্তু পারলে না। উলটে পড়ে গেল, মরে গেল। একেবারে চুরমার হয়ে গেল, গহ্বর তাকে গ্রাস করলে। শুধু এখনো দাঁড়িয়ে আছে তিরিশ গজ লম্বা চোঙটা, তুফানে জাহাজের মাস্তুলের মতোই হেলছে, দুলছে। ওদের মনে হ'ল, এখুনি চোঙটা তুফানে জাহাজের মাস্তুলের মতোই হেলছে, দুলছে। ওদের মনে হ'ল, এখুনি ভেঙে পড়বে, ধুলোয় গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ সমস্ত চোঙটাই বসে গেল, মাটি তাকে আস্তই গ্রাস করলে। একখানা বিরাট মোমবাতি যেন হঠাৎ গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিছুই বাকি নেই, এমন কি পলতেটুকু পর্যন্ত না। সব শেষ; শয়তান জানোয়ারটা এই গর্তে ওত পেতে বসেছিল, নরমেধের ভূরিভোজে তার পেট ঢোল হয়ে উঠেছিল। আর সেই ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না, নেই দীর্ঘ হাঁপানির আওয়াজ। অতলতম গহ্বরে তলিয়ে গেছে লা-ভোরো, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

চীৎকার করে ছুটে পালাচ্ছে জনতা। হাতে চোখ ঢেকে ছুটছে মেয়েরা ত্রাসের প্রবল বন্যা বয়ে গেল পুরুষদের ভিতরে, যেন শুকনো পাতার স্তূপে বয়ে গেল হাওয়া। চীৎকার চেপে রাখতে চাইছে, তবু উঠছে চীৎকার। বিরাট গহ্বর দেখে ওদের ফুসফুস ফেটে বেরুচ্ছে চীৎকার, হাত নাড়ছে ওরা,

গহ্বর অসীম বিস্তৃতি নিয়ে হাঁ করে আছে। হাঁ বেড়ে উঠছে ক্ষণে-ক্ষণে, এ যেন স্তিমিত আগ্নেয়গিরির এক ক্রেটার। পনেরো গজ তার খাই, সড়ক থেকে খাল-পাড় অবধি চল্লিশগজ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত ইয়ার্ডখানারও বাড়িগুলির মতোই দশা। বড় বড় কাঠে পাটাতন, সাঁকো, লাইনকে লাইন, টব-গাড়ির সার, তিন-তিনটে রেল সড়ক, আর রোলার গাদা; এক নিমিষে গ্রাস করে ফেলেছে গহ্বর। বিচালির স্তূপ যেমনি সাবাড় করে ফেলে গোরু-মোষ—এও যেন তেমনি। শুধু ক্রেটারের গহ্বরে পড়ে আছে কাঠ-কুটরো, ইট, পলেস্তারা। ভয়াবহ সে দৃশ্য। দুমড়ে, পিষে, গুঁড়িয়ে গেছে সবকিছু এই বিপর্যয়ে। এখনো গহ্বর বেড়ে চলেছে। ফাট ধরছে নিচ থেকে—আর সেই ফাটল ছড়িয়ে পড়ছে প্রান্তর অবধি। রাসেনারের পানশালা অবধি ফাট ছড়িয়ে পড়ল, দেয়ালটা চিড় খেয়ে গেল। তাহলে কি এই গহ্বরে তলিয়ে যাবে সারা ধাওড়া? এই ভয়ংকর সন্ধ্যায় কোথায় পাবে তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই? সারা গাঁখানা কি তলিয়ে যাবে নাকি? এদিকে যে আকাশ সীসে-রঙ হয়ে এল। মনে হয়, পৃথিবীর ধ্বংসে ঐ আকাশও বুঝি এবার যোগ দেবে। কি উপায়?

নিগ্রেল হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। মঁসিয়ে হানাবু পিছু হটে এলেন। তাঁর চোখে জল। সর্বনাশের এখনো বাকি আছে। খালের পাড় ধসে ধসে পড়ল। জল এসে ফাটলে ঢুকছে ফুটন্ত ধারার মত। গহ্বরে মিলিয়ে যাচ্ছে। পিট আকণ্ঠ পান করছে জলধারা, তার মানে বছরের পর বছর ধরে কাঁথিতে কাঁথিতে বয়ে যাবে বন্যা। গহ্বর পূর্ণ হয়ে গেল। লা-ভোরো যেখানে ছিল, এখন সেখানে পঙ্কিল হ্রদ। এযেন তেমনি হ্রদ, যার নিচে বিছিয়ে থাকে ঈশ্বরের দ্বারা ধ্বংসীভূত পাপপুরীগুলি। ভয়ংকর নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। শুধু শোনা যায় জলপ্রপাতের গর্জন। পৃথিবীর কুক্ষিতে পড়ছে জলধারা, গর্জন তুলছে।

পিটের পাড় টাল-মাটাল। সেখান থেকে উঠে পড়ল সুভেরিন। এই পূর্ণ ধ্বংস দেখে মেয়ু-বৌ আর জাচারি অভিভূত। এরা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ধ্বংস স্তূপের নিচে চাপা পড়ল হতভাগ্যের দল। ওরা তো মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর। ওদের মাথার উপরে ভেঙে পড়ল সর্বনাশ। শেষ সিগারেটের টুক-রোটা ও ছুঁড়ে ফেলে দিলে, অন্ধকারে পথ চলতে লাগল সুভেরিন। একবার পিছনে ফিরেও তাকালে না। তার ছায়া ছোট হয়ে এল, মিলিয়ে গেল রাতের আঁধারে। তার গন্তব্যস্থান অজানা। অজানার পথেই সে ছুটে চলেছে। সে যাবে, ধীর ভাবে সে ধ্বংস করবে। ডিনামাইট দিয়ে সে উড়িয়ে দেবে নগর আর মানুষের দল। যেদিন শেষ মৃত্যুপথযাত্রী বুর্জোয়া বংশধরেরা তার পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যাবে বিস্ফূর্ত হয়ে উঠবে পথের পাথর, সেদিনও নিঃসন্দেহে সে থাকবে সেখানে।

চার

লা-ভোরো ধ্বংসের রাতেই মঁসিয়ে হানাবু প্যারী রওনা হয়ে গেলেন। কাগজে সামান্য খবর বেরুবার আগেই তিনি পরিচালকমণ্ডলীকে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দিতে ইচ্ছুক। পরদিন যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি ধীর, স্থির। তাঁর কর্তৃত্বের স্বাভাবিক চালটুকুও বজায় রাখলেন। দেখে মনে হ'ল, তিনি এই বিপর্যয়ের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। এমন কি পরিচালক পরিষদের নেকনজরটুকুও হারান নি। বরং, এই ব্যাপারের চব্বিশ ঘন্টা পরে তাঁকে সরকারী সম্মানে বিভূষিত করবার হুকুমনামা স্বাক্ষরিত হ'ল।

ম্যানেজার নিরাপদ হলেন বটে, কিন্তু কোম্পানি এই ভীষণ আঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠল। কয়েক কোটি ফ্রাঙ্ক ক্ষতিই শুধু হয়েছে এমন নয়, এ যেন একেবারে চরম আঘাত। তাদের একটি খনির এই সর্বনাশে পেয়ে বসল আগতদিনের সর্বনাশের ভয়। আশঙ্কায় তারা আকুল, তাই ঠিক করল, ব্যাপারটা চাপা দিয়েই রাখবে। যদি দুষ্কৃতকারীকে খুঁজেই পাওয়া যায়, তাকে শহিদ বানিয়ে লাভ কি! তার সেই ভয়াবহ বীরত্বে অন্যের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েই বা কি হবে? এতে তো শুধু দলপুষ্ট হয়ে উঠবে ঘর-জ্বালানো বদমায়েস আর খুনের দলের। তা ছাড়া প্রকৃত দোষী কে সে-খবর তারা পায়নি। শুধু তারা আঁচ করেছে, এর মধ্যে লিপ্ত আছে বহুলোক। এমন কাজ একজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এত সাহস আর শক্তি কার আছে! এই একটা চিন্তাই কোম্পানির উপর যেন ভার হয়ে চেপে বসেছে। তাদের খনিগুলির প্রতি এ এক জবর হুমকি। এ হুমকি ক্রমাগত বেড়ে-বেড়েই উঠবে, খনিগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে হবে। ম্যানেজার এক বিরাট গোয়েন্দাবিভাগ সংগঠনের হুকুম পেলেন, যারা এর ভিতরে লিপ্ত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, ধীরে ধীরে তাদের বরখাস্ত করতে হবে। এই শুদ্ধির উপায় গ্রহণ করেই কোম্পানি সন্তুষ্ট রইল—বিচক্ষণতা আছে এ উপায়ে, আছে কূটনীতি।

হেড সর্দা দাঁসারের তখন-তখনি জবাব হয়ে গেল। সে-ই-ই একমাত্র বলি পড়ল। পিয়েরোঁর বাড়িতে কেলেঙ্কারির পর লোকটাকে আর রাখা সম্ভব নয়। একটা ছুতোও পাওয়া গেল। বিপদের সময় সে সর্দার হয়ে ভীরুর মত তার কুলিদের ফেলে পালিয়ে এসেছে। কুলিদের উপর এ এক কূট চাল চালা হল। তারা তো দাঁসারকে ঘৃণাই করে।

জনসাধারণের ভিতরে কিন্তু নানা গুজব রটে গেল। এক খবরের কাগজে সংশোধনের প্রস্তাব করে পত্রাঘাতও করলেন পরিচালকমণ্ডলী। খবরটা ছিল এই, ধর্মঘটীরা নাকি এক পিপে বারুদ এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিচালকমণ্ডলী খবরটার বিরুদ্ধবাদীতাই করলেন। তাড়াহুড়ো তদন্ত করতে এলেন সরকারী পর্যবেক্ষক। তাঁর রায় বেরুল, কাঠের দেয়াল স্বাভাবিক ভাবেই ধসে পড়েছে। কারণ, অনেক দিন থেকেই মাটি ফেঁপে ফুলে উঠছিল। কোম্পানি চুপচাপ থাকাটাই পছন্দ করলেন। খবরদারি যে করেননি, তার দোষত্রুটিও কাঁধে নিলেন নির্বিচারে। তিনদিন পরে প্যারীর কাগজে কাগজে

রোমহর্ষক খবরের পর্যায়ে দেখা দিল খনির বিপর্যয়। মানুষের মুখে শুধু পিটের নিচে যারা মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছে, তাদেরই কথা। তারা ভোরবেলার কাগজে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল তাদেরই খবর, লোভীর মতো গিলতে লাগল। মঁতসুর বিচক্ষণ বুর্জোআ সমাজ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন, লা-ভোরোর নাম উঠলেও তাঁরা এখন চুপচাপ থাকেন। এক যেন উপকথা গড়ে উঠল, কানে কানে বলতে গিয়ে অতি বড় সাহসী যে সেও শিউরিয়ে উঠতে লাগল। হতভাগ্যেরা বলি পড়ল, তাদের প্রতি করুণা উথলে উঠল সারা দেশে; ধ্বংসীভূত পিটে দর্শকের ভিড় লেগে গেল। গোটা পরিবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ভয়াবহ ধ্বংসের দৃশ্য। ওরই নিচে গোর চাপা পড়েছে হতভাগ্যের দল।

দেনেউলিং বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কাজ শুরু করেই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর প্রথম কাজ হল, খালকে আবার তার গর্ভে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া। কেন না জলধারা প্রতি মুহূর্তেই পিটকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ এক বিরাট কাজ। তিনি, একশো লোককে একটা বাঁধ বাঁধার কাজে লাগিয়ে দিলেন। গর্জমান জলধারা দু-দুবার বাঁধ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নয়া পাম্প বসানো হল, চলল এক তুমুল সংগ্রাম। ধাপে ধাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে-যাওয়া মাটির স্তর জয় করে নেওয়া হল। প্রচণ্ড বিক্রমে আবার প্রতিষ্ঠিত হল স্তরের পর স্তর।

কিন্তু চাপা-পড়া কুলিদের উদ্ধারের চেষ্টা হ'ল সবচেয়ে বড় কাজ। সবাই মেতে উঠল কাজে। নিগ্রেলকে উদ্ধার সাধনের চরম প্রচেষ্টায় নিযুক্ত করা হ'ল। সহযোগীও মিলে গেল অনেক। সব ক'জন মজুরই ভাই-বেরাদরি ভাব থেকে ছুটে এল কাজে। ধর্মঘট তারা ভুলে গেছে, ভাতার কথাও তাদের মনে নেই। মুফোত কাজ করতেও তাদের দ্বিধা নেই। তারা চায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে সাথীদের উদ্ধার সাধনে। সাথীরা তো এখন মরতে বসেছে। হাতিয়ার নিয়ে সবাই এল, সবাই ব্যগ্র, কোথায় চালাবে হাতিয়ার। অধিকাংশ মজুরই এই আকস্মিক বিপর্যয়ের ধাক্কা এখনো সামলে উঠতে পারেনি। এখনো কাঁপছে দেহ, ঘাম ছুটছে, আর অবিরাম দুঃস্বপ্ন দেখে দেখে তারা পাগল। তবুও তারা উঠে দাঁড়াল, মাটির বিরুদ্ধে লড়তে তারা দৃঢ়-সংকল্প —মাটির উপরে তুলতে হবে শোধ। বরাত খারাপ, কি করে কি করা যাবে তাই নিয়েই বাধল ফ্যাসাদ। সত্যই কি করা যায়? কি করে নামা যায় নীচে? কোন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে মাটিকে?

নিগ্রেলের মতে, হতভাগ্যেরা কেউ বেঁচে নেই। পনেরোজন মানুষ নিশ্চয়ই মরে গেছে। হয় ডুবে মরেছে, নয় তো মারা গেছে দম বন্ধ হয়ে। কিন্তু খনির বিপর্যয়ের সময় নিয়ম হচ্ছে, চাপা-পড়া মানুষদের জীবন্ত বলেই ধরে নিতে হয়। এই ধারণা নিয়েই কাজ শুরু করে দিলে নিগ্রেল। পয়লা সমস্যাটা সে ভেবে নিলে, ওরা কোথায় আশ্রয় নিতে পারে। সর্দার আর ঝুনো মজুরদের ডেকে সে পরামর্শ করলে। সবাই একমত যে, জল বেড়ে যাওয়ায় ওরা নিশ্চয়ই কাঁথি থেকে সরে এসে উপরের কয়লার স্তরে ঠাঁই নিয়েছে। তার মানে উপরের স্তরের কোন প্রান্তসীমায় তারা আটক হয়ে আছে। তা ছাড়া, বুড়ো মোকের খবরের সঙ্গে ত এর মিল খুঁজে পাওয়া

গেল। তার কাহিনী এলোমেলো, তবু তার থেকেই আঁচ করা যায়, ওরা ভয় পেয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়। আর এই দলগুলো কয়লার স্তরের উপর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। উদ্ধারের উপায় নিয়ে যখন আলোচনা চলল, সর্দাররা একমত হতে পারলে না। পিটের মুখ থেকে সবচেয়ে কাছের পথও দেড়শো গজ নীচে। সেখানে স্যাফট বসানো অসম্ভব। শুধু রিকুইলারই এখন একমাত্র প্রবেশের পথ। ওরা ওখান দিয়েই এগুতে পারে। কিন্তু সেই সাবেক আমলের পিটও এখন বন্যায় ভেসে গেছে। ভোরোর সঙ্গে আর তার যোগাযোগ নেই। জলের উপরে প্রথম স্তরের কয়েকটা কাঁথিই শুধু এখনো জেগে আছে। পাম্প দিয়ে জল বার করে ফেলতে হ'লে বছরের পর বছর লেগে যাবে। সব চেয়ে সেরা উপায় হচ্ছে, এই কাঁথি-গুলোতে সরজমিনে তদন্ত করে দেখা যে, এখান দিয়ে ডুবন্ত পথে যাওয়া যায় কি না। সেখান থেকে আবার হতভাগ্য কুলিরদল যেখানে আছে বলে সন্দেহ করা যাচ্ছে, সেখানে পেঁাছনো চলে কি না। নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসার জন্যে চাই যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক। বহু অসম্ভব পরিকল্পনাও গজিয়ে উঠছে ক্ষণেক্ষণে। সেগুলিকে বাতিল করাও দরকার।

নিগ্রেল দপ্তরের ধুলো ঘাঁটতে লেগে গেল। দুটি পিটের পুরানো দুখানা নক্সাও মিলল। সে তন্ন তন্ন করে দেখে ঠিক করলে, কোনদিক থেকে তদন্ত শুরু হবে। উদ্ধার প্রচেষ্টা যেন ওকে ধীরে ধীরে উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। আর সবার মতোই ও আত্মাহুতির উন্মাদনায় অধীর। মানুষ আর সব কিছুর প্রতি বিদ্রূপাত্মক উদাসীনতা ওর আছে, তবু ও যেন মেতে উঠেছে। রিকুই-লারে নামতে গিয়েই পয়লা বাধা দেখা দিল। স্যাফটের মুখ থেকে বাধা সরানো দরকার। পাহাড়ী য়্যাশ গাছটা কেটে ফেলা হল, ব্ল্যাকথর্ণ-হথর্ণের ঝোপ পরিষ্কার হয়ে গেল। মইগুলোর মেরামতি চলল। এবার শুরু হল অভিযান। ইঞ্জিনিয়ার দশজন মিস্ত্রীকে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন স্তরের বিভিন্ন জায়গা, মিস্ত্রীরা হাতিয়ার দিয়ে ঘা মারতে লাগল। গভীর নিস্তব্ধতায় ওরা কয়লার স্তরে কান পেতে রইল আঘাতের প্রত্যুত্তরের আশায়। যে কটা কাঁথিতে যাওয়া সম্ভব, সেখানেই ওরা এমনি করলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। উত্তর এল না। ওরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ওরা কি কয়লার স্তর কাটতে শুরু করে দেবে? কোথায় যাবে—গিয়ে কার নাগাল পাবে? কেউ তো এখানে নেই বলেই মনে হয়। তবু তল্লাস চলতে লাগল। ক্লান্তিতে দেহ টলছে, উদ্বেগে ভরে উঠেছে মন—তবু তল্লাস থামছে না।

পয়লা দিন থেকেই মেয়ু-বৌ ভোরে উঠেই রিকুইলারে গিয়ে হাজির হয়। স্যাফটের কাছে একখানা কাঠের উপর বসে থাকে, রাত অবধি নড়ে চড়ে না। পিট থেকে যখন কেউ উঠে আসে, তখনি একমাত্র লাফিয়ে উঠে শুধায় চোখের ভাষায়।—কি—কেউ নেই গো? না, নেই। নিঃশব্দে সে আবার বসে পড়ে। আবার মুখ গম্ভীর করে বসে থাকে, প্রতীক্ষা করে। জাঁলিনের এলাকায় ওরা হানা দিয়েছে। সেও তাই ছুটে এসেছে। ভীত শ্বাপদের মতোই সে গুঁড়ি মেরে মেরে চলে। তার ভয়, ডেরার লুণ্ঠিত ধনদৌলত এবার বেরিয়ে পড়বে। সেই ছোকরা সান্ত্রীর কথাও মনে আছে। কি জানি পাথরের

স্তূপের নীচে তার ঘুমে যদি ব্যাঘাতই ঘটে যায়। কিন্তু খনির সে অংশটা এখন জলে জলময়। ওরা বাঁ দিকে খুঁড়ে চলেছে পশ্চিমের কাঁথিতে। প্রথমে ফিলোমেনও এসেছিল জাচারির সঙ্গে। জাচারি এই উদ্ধারকারী দলেরই একজন! কিন্তু বেহুদা সর্দি লাগাবার ভয়ে সে সরে পড়ল। এখন সে ধাওড়ায়ই থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কাশে, কোন রকমে দিন কেটে যায়। এসব নিয়ে আর সে মাথা ঘামায় না। কিন্তু জাচারির অন্য চিন্তা নেই—সে তার বোনকে ফিরিয়ে আনতে সমস্ত মাটি গিলে ফেলতেও রাজী। রাতে সে চীৎকার করে উঠল, সে বোনকে দেখেছে, শুনেছে তার স্বর। উপোসে উপোসে রোগা ডিগডিগে হয়ে গেছে, ফুসফুস ঝাঁজরা হয়ে গেছে সাহায্যের প্রার্থনায়। বিনে হুকুম দু-দুবার সে খুঁড়তে চেষ্টা করল। সে বললে, ঐখানেই আছে তার বোন। সে তো নিশ্চিত। ইঞ্জিনিয়ার আর তাকে নীচে নামতে দিলেন না। কিন্তু সে তো পিট ছেড়ে যাবে না। শেষে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। মার পাশে যে বসে থাকবে, তারও জো নেই। সে শুধু ছুটোছুটি করতে লাগল, একটা কিছু সে করতে চায়।

তিনদিন হল কাজ শুরু হয়েছে। নিগ্রেল হতাশ। ঠিক করেছে, সন্ধ্যের দিকে তল্লাসির পালা সাঙ্গ করে দেবে। দুপুরের খাওয়ার পরে সে শেষ চেষ্টা করবার জন্যে ফিরে আসছিল তার দলবল নিয়ে, এমন সময় দেখলে স্যাফটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জাচারি। মুখচোখ তার লাল, নিঃশ্বাস-রুদ্ধ, সে চেঁচিয়ে উঠল,

ঐ হোথায়—হোথায় আছে ও। মোর কথায় জবাব দিলে। জলদি চল, চল!

পাহারাওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে সে মই বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল। সে দিব্যি দিয়ে বললে, গিয়োম স্তরের প্রথম কাঁথিতে কে-একজন তার টোকার জবাব দিয়েছে টোকা মেরে।

নিগ্রেলের বিশ্বাস হল না, বললে, তুমি যে জায়গাটার কথা বলছ, সেখানে তো আমরা দু-দুবার খুঁজে দেখেছি। যাহোক, আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

মেয়ু-বৌও উঠে দাঁড়াল। তাকে আটক রাখা হল যাতে সে নীচে না নামে। স্যাফটের ধারে অন্ধকারে গহ্বরের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

জায়গাটায় পেঁছেই নিগ্রেল থেমে থেমে তিনবার টোকা দিলে। তারপর কান পেতে রইল কয়লার স্তরে। সবাই নিস্তব্ধ। আওয়াজ ভেসে এল না। মাথা নাড়লে নিগ্রেল। আহা-বেচারী, হয়তো ও স্বপ্নই দেখেছে। জাচারি এবার পাগলের মতো ঘা মারতে শুরু করলে। আবার বুঝি শুনেছে সে সাংকেতিক উত্তর, তাই তার চোখ প্রদীপ্ত, দেহ উত্তেজনায় থরোথরো। পালা করে সবাই চেষ্টা করলে এবার। দূরাগত স্পষ্ট উত্তর পেয়ে সবাই মহাখুশি। ইঞ্জিনিয়ার অবাক। আবার সে কান পেতে শুনল, আস্তে আস্তে কানে এসে বাজছে অস্পষ্ট আওয়াজ। নিঃশ্বাসের মতোই আবছা শব্দ। তালে তালে বেজে উঠছে টোকা, শোনাই বুঝি যায় না। তবে বোঝা যায়। এ সেই খনির মজুরদের চিরপরিচিত সুর—যখন ওরা কয়লার স্তরের সঙ্গে বিপদের মুখোমুখি লড়াই করে, তখনই এমনি সুর বেজে ওঠে। কয়লার স্তর দূর হতে দূরান্তে

এ শব্দ নিয়ে যায়। স্ফটিক স্বচ্ছ হয়ে বেজে ওঠে সংকেত। একজন সর্দার এবার আঁচ করে বললে, তাদের আর সাথীদের মধ্যে, অন্তত পঞ্চাশ গজের ব্যবধান তো হবেই। কিন্তু তবুও নাগাল পাওয়া সম্ভব। তাদের তারা খুঁজে পাবে, ছুঁতে পারবে। আনন্দের আর যেন সীমা নেই। নিগ্রেলকে তখনি ঐ দিকে খোঁড়ার হুকুম দিতে হল।

স্যাফটের মুখে মার সঙ্গে দেখা হতেই জাচারি তাকে জড়িয়ে ধরল।

পিয়েরোঁ-বৌ তবু বড় নিষ্ঠুর, সে এসেছে মজা দেখতে। বললে, অতো লাফাও-ঝাঁপাও কেনে? ক্যাথি যদি হোথায় না থাকে, তখন কি হবে গো? তখন তো কেঁদে দিশে পাবেনি।

সত্য কথা। ক্যাথেরিন হয়তো ওখানে নেই। আর কোথাও হয়তো পড়ে আছে। জাচারি গর্জন করে উঠল, তোর বক্‌বকানি থামা তো মাগী! ও হোথায় আছে, আলবৎ আছে। আমি জানি।

মেয়ু-বৌ আবার বসে পড়ল। চুপচাপ সে, মুখ ভাবলেশহীন। আবার প্রতীক্ষা শুরু হয়ে গেছে।

মঁতসুতে খবরটা রটে যেতেই আর-একদল লোক ছুটে এল। দেখার কিছু নেই, তবু তারা সেখানে রইল। তাদের দূরে হটিয়ে দিতে হল শেষটায়। নীচে চলতে লাগল দিবারাত্রি কাজ। বাধা এসে হাজির হতে পারে এই ভয়ে ইঞ্জিনিয়ার স্তরে তিনটি সুড়ঙ্গ কাটার হুকুম দিলে। মজুরেরা যেখানে আছে, সেখানে গিয়ে মিশবে এই তিনটি সুড়ঙ্গ। একজন করে মজুর এই সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলল। দুঘন্টা অন্তর বদলির পালা। ঝুড়ি ভরতি হতে লাগল কয়লায়। পুরোদমে চলল খোঁড়ার কাজ। প্রথমে কাজ জোর চলতে লাগল। একদিনে ছ'গজ খোঁড়া হয়ে গেল।

স্তরে কাজ করবার জন্য বাছাই করে লোক নেওয়া হল। তাদের মধ্যে জাচারি একজন। এ সম্মান সকলেরই বাঞ্ছিত। দুঘণ্টা পরে জাচারির বদলির পালা আসতে সে ফুঁসে উঠল। সে সাথীদের পালা-মতো কাজ করতে দেবে না, গাঁইতি ছাড়বে না। তাদের সে বঞ্চিত করেই এগিয়ে চলল। তার সুড়ঙ্গটা আর সবার থেকে এগিয়ে চলল। এমন উৎসাহে সে কয়লার স্তরের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে যে, সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ওরা শুনতে পেল তার নিঃশ্বাসের শব্দ। যেন হাপর শোঁ শোঁ করছে আর কি। যখন সে টলতে টলতে বেরিয়ে এল, তখন ক্লান্তিতে মাথা ঘুরছে, সারা গা কালো কাদায় মাখামাখি। সে এসেই পড়ে গেল, তাকে কম্বল চাপা দিতে হল। আবার খানিকক্ষণ পরেই ছুটল কাজে। তখনো পা টলছে। তবু শুরু হয়ে গেল লড়াই। আঘাত পড়ছে, চাপা আওয়াজ উঠছে। রুদ্ধ গোঙানির শব্দ বাজছে আবার বিড়বিড় করে পাড়ছে গাল। এ যেন সৈনিকের উন্মাদনা—হত্যার ভিতর দিয়ে সে তার বিজয়ের পথ করে নেবে। ভাগ্য মন্দ, এবার, কয়লার স্তর কঠিন হয়ে এল, দু-দুবার রাগে অধীর হয়ে কয়লার উপর গাঁইতি ভেঙে ফেললে। এগুতে পারছে না বলেই তার যত রাগ। আর এক আপদ গরম। প্রতি গজে বাড়ছে গরম। এই সংকীর্ণ গর্তে হাওয়া ঢোকে না। অসহ্য গুমোট দেখা দিয়েছে। একটা হাওয়া আসার হাতকল আছে বটে, কিন্তু

তবু হাওয়া তেমন খেলতে পাচ্ছে না। তিন-তিনবার মজুরদের বার করে আনা হল। তারা তখন অচেতন।

নিগ্রেল মাটির তলায় রইল তার কুলিদের সঙ্গে। তার খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হল নীচে, খড়ের গাদায় সে ঘন্টাদুয়েক করে ঘুমিয়ে নিলে গায়ে কোট মুড়ি দিয়ে। মানুষদের দৃঢ় সংকল্প তখনো অটুট। ও পাশে হতভাগ্যদের কাকুতি-মিনতিই তাদের সংকল্প জীইয়ে রাখল। তাদের টোকার আবেদন এখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জলদি করতে বলছে। এখন তো একেবারে স্পষ্ট, হার্মনিকার সুর-সংগতের মত তালে তালে বেজে উঠছে। ঐ সুরই তাদের পথপ্রদর্শক। সেনাবাহিনী যেমন তোপের দিকে এগিয়ে যায়, তেমনি সেই স্ফটিক-স্পষ্ট ঝঙ্কারের দিকে তারা আগুয়ান হয়ে চলল। যখনি পালা বদলি হচ্ছে, নিগ্রেল সুড়ঙ্গের ভিতরে যাচ্ছে, টোকা মারছে, শুনছে। প্রতিবারেই স্পষ্ট আর দ্রুত হয়ে বেজে উঠছে উত্তর। আহবান জানাচ্ছে, এস, ত্বরায় উদ্ধার কর! আর তো তার সন্দেহ নেই। ঠিক পথেই চলেছে তারা। কিন্তু কি আস্তে আস্তে! সময়-মতো সেখানে গিয়ে বুঝি আর পৌঁছনো যাবে না। প্রথমে দুদিনে তেরো গজ এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে মাত্র পাঁচ গজ এল, চতুর্থ দিনে আরো কম। মাত্র তিন গজ। কয়লার স্তর এখন যে আরো কঠিন। এখন তাই দিনে দু-গজ এগুনো চলে। ন'দিনের দিন অমানুষিক পরিশ্রমে মাত্র বত্রিশ গজ এগুনো গেল। আরো অন্তত বিশ-গজ বাকি, তার বেশিও হতে পারে। বারোদিন বন্দী হয়ে আছে ওরা—চব্বিশ ঘণ্টার বারোগুণ করলে যা হয়, তত সময় তারা এই তুষার-শীতল অন্ধকারে রুটি আর আগুনের অভাবে পড়ে পড়ে ধুঁকছে। এই দুঃসহ দশা কল্পনা করে মজুরদের চোখ সজল হয়ে এল, হাতও বুঝি পঙ্গু। এর পরে কি-কেউ আর বাঁচতে পারে! দূরাগত ধ্বনি আগের দিন থেকেই ক্ষীণতর হয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তে তাদের ভয়, এই বুঝি থেমে গেল, থেমে গেল!

মেয়ু-বৌ রোজ সকালে এসেই স্যাফটের মুখে বসে থাকে। এ তার নিয়ম, কাঁখে করে এস্তেলকে নিয়ে আসে। সে ভোর থেকে সন্ধ্যে অবধি একা থাকতে পারে না। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নিঃশব্দে মজুরদের কাজ দেখে মেয়ু-বৌ। তাদের আশা আর ভীতির ভাগীদার হয়। চারিদিকে যারা ঘিরে থাকে, তারাও আশায়, উত্তেজনায় অধীর, এমন কি মঁতসুও অবিরাম আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এ তল্লাটের সমস্ত বুকের ধুকধুকানি বুঝি ঐ মাটির আড়ালে শোনা যায়।

ন'দিনের দিন দুপুরের খাবার সময় ডেকে-ডেকে জাচারির সাড়া মিলল না। তখন তার পালা বদলিরও সময়। সে তখনো পাগলের মতো কাজ করে চলেছে। আর মুখে তার গালাগাল। নিগ্রেলও একটিবারের জন্য এল, কিন্তু জাচারি মানবে না হুকুম। একজন সর্দার আর তিনজন মজুরও নিচে রয়ে গেল। পিটের মধ্যে আলোটা নিবু নিবু। শুধু কেঁপে ওঠে ঘনছায়ার ভিতরে। জাচারি রেগে গেল। এ আলোতে কাজে দেরি হয়ে যায়। তাই সে একটা বোকামি করলে। বাতিটার ঢাকনাটা খুলে দিলে। অথচ কড়া হুকুম, বাতির ঢাকনা কেউ খুলে দেবে না। ফায়ার-ড্যাম্পে নাকি ছেঁদা হয়ে

গেছে, আর গ্যাস চুইয়ে পড়ছে রাশি রাশি এই সংকীর্ণ পথগুলিতে। এখানে তাদের নিঃসরণেরও উপায় নেই। হঠাৎ বাজের গর্জন শোনা গেল গর্তের ভিতর থেকে উঠে এল ঝলক ঝলক আগুন, এ যেন তোপের মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে গোলা। সবকিছু জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। হাওয়াও যেন বারুদের মতোই জ্বলে উঠল—ছড়িয়ে পড়ল কাঁথির এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো। আগুনের ধারা নামল, ভাসিয়ে নিয়ে গেল সর্দার আর তিনজন মজুরকে। স্যাফটে আগুন ধরে গেল, আগ্নেয়গিরির উদ্গারের মতো শূন্যে উৎসারিত হল, বমি করে দিলে পাথর আর কাঠের টুকরো। কৌতূহলী দর্শকরা ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়ু-বৌ এস্তেলকে বুকে চেপে উঠে পড়ল।

নিগ্রেল আর আর-সবাই দুপুরের খাওয়া সেরে ফিরে এসে কান্ড দেখে রাগে জ্বলে উঠল। পা দাপতে লাগল মাটিতে। কোন উন্মাদ সৎ-মা যেমন নিজের খেয়াল-খুশি মেটাতে তার সৎ-শিশুসন্তানদের হত্যা করে—ঠিক তেমনি ওদের দশা। ওরা সাথীদের উদ্ধারে নিজেদের উৎসর্গ করেছে, নিজেদের কথা একটিবারও ভাবেনি। আরো ক'জন জীবন দেবে এই তো ছিল ওদের পণ! কিন্তু বোকামির জন্য এমন খেসারত দিতে হবে—একথা কে জানত! তিন-ঘন্টা ধরে অক্লান্ত চেষ্টা চলল, বিপদ তাদের শিয়রে। আবার কাঁথিতে গিয়ে তারা ঢুকল। এবার দুর্ঘটনার শিকারদের তুলে আনা হল। সর্দার আর তিনজন মজুর মরেনি, তাদের সারা গায়ে ক্ষত। সেই ক্ষত থেকে পোড়া মাংসের গন্ধ উঠছে। ওরা আগুন গিলেছে, গলায় পড়েছে ফোস্কা, গোঙাচ্ছে যন্ত্রণায়। শুধু বলছে, ওদের সাবাড় করে দিক সাথীরা—আর তো যন্ত্রণা সয় না! মজুর তিনজনের মধ্যে একজন গাঁইতির ঘায়ে গাঁস্ত-মারির পাম্পটা খতম করে দিয়েছিল ধর্মঘটের সময়ে। আর দু-জনেরও হাতে ক্ষত, সিপাহীদের দিকে জোরে ইট ছুঁড়তে গিয়ে আঙুলগুলো থেঁতলানো। ওদের নিয়ে চলল ধরাধরি করে। বিবর্ণমুখ জনতা টুপী খুলে অভিবাদন জানালে।

মেয়ু-বৌ তখনো প্রতীক্ষায় আছে। অবশেষে এল জাচারির দেহটা। পোষাক পুড়ে গেছে, দেহ তো নয়, যেন পোড়া কয়লা। চেনাই যায় না। মাথাটা চুরমার হয়ে গেছে বিস্ফোরণে তার চিহ্নও নেই। স্ট্রেচারের উপরে এনে রাখা হল সেই কিম্ভূত লাশ, মেয়ু-বৌ যন্ত্রচালিতের মতো চলল তার পেছনে। তার চোখ জ্বলছে, একফোঁটা জল নেই। এস্তেল কোলে তন্দ্রা-বিভোর, সে চলেছে। শোকের প্রতিমূর্তি মা, আলুল চুল উড়ছে হাওয়ায়। ধাওড়ায় এসে পেঁছল ওরা। ফিলোমেন মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর কান্নায় সে পেল স্বস্তি। মা আবার রিকুইলারে ফিরে গেল। ছেলেকে বাড়ি নিয়ে এসেছে, এবার আবার মেয়ের জন্য চলবে প্রতীক্ষা।

আরো তিনদিন কেটে গেল। অসম্ভব বাধার ভিতর দিয়ে চালু হল উদ্ধারের কাজ। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, পথ বিস্ফোরণে বন্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু কাঁথিগুলো এখন উষ্ণ আর বিষাক্ত হাওয়ায় ভরতি, নতুন নিঃসরণী নল না বসানো পর্যন্ত কাজ চলল না। প্রতি, বিশ মিনিট অন্তর পালা বদল হতে লাগল। ওরা এগিয়ে চলল। দু'গজের বেশি কিন্তু এগুনো সম্ভব হল না। মরণকে শিয়রে নিয়ে শুরু হল কাজ। এখনো জোরে পড়তে লাগল গাঁইতির ঘা, কিন্তু সে শুধু প্রতিশোধের উন্মত্ততায়। আর তো শব্দ শোনা

যায় না, আর তো ছন্দে বেজে ওঠে না উত্তর। বারোদিন কাজ চলেছে, বিপর্য-য়ের পর হল পনেরো দিন। আজ ভোর থেকেই মৃত্যুর স্তব্ধতা ঘনিয়ে এসেছে চারিদিকে।

নতুন দুর্ঘটনায় আবার মঁতসুর নাগরিকদের কৌতূহল বেড়ে গেছে। বাসিন্দেরা দলে দলে বিপুল উৎসাহে দেখতে আসছে। গ্রিগোয়েররাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন বলে ঠিক করলেন। সঙ্গী-সাথীও জুটে গেল। লুসি আর জিনিকে নিয়ে আসবেন তাঁর গাড়িতে। দেনেউলিঁ ওঁদের ঘুরে ঠিক হল বাড়ির গাড়িতে যাবেন লা-ভোরো দেখতে, আবার হানাবু-গৃহিণী ঘুরে দেখাবেন, খনির পুনরুদ্ধারের তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন। তার পরে রিকুইলার হয়ে তাঁরা ফিরে যাবেন। সেখানে নিগ্রেল তাঁদের জানাবে, সুড়ঙ্গ কতদূর এগিয়ে গেল। তাছাড়া এখনো চাপা-পড়া মানুষগুলোর উদ্ধারের আশা আছে কি না। তার পরে ব্যাপারটা সমাধা হবে সকলের একত্রে নৈশ-ভোজে।

প্রায় তিনটের সময়ে গ্রিগোয়ের দম্পতি তাঁদের মেয়েকে নিয়ে গাড়ি করে ধ্বংসীভূত পিটের সুমুখে এসে নামলেন। এসে দেখলেন, হানাবু-গৃহিণী এরই মধ্যে পৌঁছে গেছেন। সাগর-নীল রঙের পোষাক তার পরনে, ফেব্রু-য়ারীর নিষ্প্রভ সূর্যের আতপতাপ থেকে গায়ের রং বাঁচাচ্ছেন একটা বেঁটে ছাতার আড়ালে। আকাশ পরিষ্কার, বসন্তের আবহাওয়া। মঁসিয়ে হানাবু দেনেউলিঁর সঙ্গে হাজির আছেন। হানাবু-গৃহিণী অন্যমনস্ক হয়ে শুনছেন দেনেউলিঁর কথা, কি দুঃসাধ্য চেষ্টায় খালের বাঁধ বাঁধা হচ্ছে তারই কাহিনী। জিনির হাতে সবসময়েই তার স্কেচের খাতা থাকে। সে ছবি আঁকতে শুরু করে দিলে। ব্যাপারটা ভয়াবহ বলেই তার উত্তেজনাও যথেষ্ট। লুসি তারই পাশে একটা গাড়ির ভগ্নাবশেষের উপর বসে আছে। আনন্দে সে চেঁচাচ্ছে, তার খুব ভালই লাগছে। বাঁধ এখনো অসম্পূর্ণ, এখনো-সেখানে অসংখ্য ছিদ্র। ফেনিল জলধারা ছুটে আসছে, আর ঝুপঝাপ করে পড়ছে খনির বিরাট গহ্বরে। ক্রেটার শূন্যগর্ভ হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে, জল শুষে নিচ্ছে মাটি। নীচের ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপ বেরিয়ে পড়ছে, দেখা যাচ্ছে। বিবর্ণ নীল আকাশের নীচে সুন্দর দিনটি। এই সুন্দর দিনে ঐ গহ্বর যেন নর্দমার মতো দেখা যাচ্ছে। আর তারই ভিতরে বুঝি ডুবে আছে নগরীর ধ্বংস্তূপ, কাদায় বসে গেছে।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই দেখতে মানুষ দূর দূর থেকে আসছে!

সিসিলির স্বাস্থ্য উছলে পড়ছে, বিশুদ্ধ হাওয়ায় এসে সে মহা খুশী। সে হাসি-ঠাট্টা করছে। হানাবু-গৃহিণী মুখ বিকৃত করে বিড়বিড় করে মন্তব্য করলেন,

ব্যাপারটা মোটেই হাসি-তামাশার নয়।

ইঞ্জিনিয়ার দু'জন হেসে উঠলেন। সমাগত দর্শকদের তাঁরা চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন. পাম্পের কাজ কি করে চলে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু মহিলারা উদ্বিগ্ন। তাঁরা শুনে শিউরিয়ে উঠলেন, স্যাফট আবার বসাবার আগে ছ-সাত বছর ধরে পাম্প দিয়ে জল বার করে দিতে হবে। এমনি করেই জল নিষ্কাসন করা হবে খনি থেকে। না, এ উপায়ে চলবে না। অন্য উপায়

ভাবতে হবে। এই যে সর্বনাশ হল, এর তো আর উপায় নেই। এ শুধু দুঃস্বপ্নের খোরাক হয়ে রইল।

বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে হানাবু-গৃহিণী হঠাৎ বলে উঠলেন, চল যাই এবার। লুসি আর জিনি প্রতিবাদ জানালে। সে কি, এত তাড়াতাড়ি! আঁকা যে শেষ হয়নি! ওরা থাকতে চায়। বাপ ওদের নৈশভোজে নিয়ে যাবেন। মঁসিয়ে হানাবু একাই স্ত্রীর গাড়িতে এসে বসলেন। নিগ্রেলকে তিনি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চান। মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের বললেন, বেশ তো, আপনারা এগিয়ে যান। আমরা পিছনে আসছি। ধাওড়ায় একবার মিনিট পাঁচেকের জন্য ঘুরে আসব...আপনারা চলে যান, রিকুইলারে গিয়ে দেখা হবে।

গ্রিগোয়ের-গৃহিণী আর সিসিলি ওঠার পর, তিনিও চড়ে বসলেন। প্রথম গাড়িটা খালের দিকে জোরে ছুটে চলল, আর দ্বিতীয় গাড়ি ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে উঠতে লাগল টিলার উপরে।

এই যে দেখতে এলেন, এবার কিছুটা দয়া-দাক্ষিণ্য করে সেই দেখাটা সম্পূর্ণ করে দেবেন—এই গ্রিগোয়ের দম্পতির মনের সাধ। জাচারির মৃত্যুতে তাঁদের মন করুণায় আর্দ্র হয়ে গেছে মেয়ু-পরিবারের উপর। তাদের নিয়ে সারা তল্লাটে আলোচনা চলছে। বাপের উপর গ্রিগোয়ের-দম্পতির বিন্দুমাত্র করুণা নেই। ও তো একটা ডাকাত, ফৌজদের ও হত্যা করেছে। ওকে তো নেকড়ের মত খুঁচিয়ে মারাই উচিত ছিল। কিন্তু মার দশা দেখে ওরা গলে গেলেন দরদে। আহা, বেচারী! ছেলে হারাল সবে, আগে হারিয়েছে স্বামী। তার মেয়ে হয়তো এখন গোরচাপা লাশ হয়ে পড়ে আছে। বুড়ো পঙ্গু দাদুর কথা ছেড়েই দাও—ধস নেমে তো তার পা-খানা গেছে। আবার ধর্মঘটের সময় মেয়েটা গেছে উপোসে-উপোসে মারা। আংশিকভাবে পরিবারই এর জন্য দায়ী। বড় বাড় বেড়ে ছিল, কতগুলো বাজে কথা মাথায় ঢুকে খেপিয়ে তুলেছিল ওদের। কিন্তু তবুও তাঁরা দাক্ষিণ্য দেখাবেন এই পরিবারকে—দরাজ তাঁদের দিল। তাঁরা ক্ষমা করতে, ভুলে যেতে ইচ্ছুক, নিজের হাতে তাঁরা সাহায্য করতে চান—যদিও সামান্য সে সাহায্য। কাগজে ভাল করে মোড়া দুটো বাণ্ডিল রয়েছে গাড়ির আসনের নীচে।

এক বুড়ী গাড়োয়ানকে মেয়ু-বৌয়ের বাড়িটা দেখিয়ে দিলে। দোসরা ব্লকের ষোলো নম্বর বাড়ীটা তাদের। গ্রিগোয়েররা বাণ্ডিল দুটো নিয়ে নেমে পড়লেন। দরজায় কড়া নাড়াই সার হল। এবার হাত দিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করলেন। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। বাড়িখানা শোকার্ত প্রতিধ্বনি তুলছে। এ যেন দুঃখে জর্জর শূন্য বাড়ি, তুষারায়িত অন্ধকার, বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়ি।

সিসিলি হতাশ হয়ে বললে, কেউ নেই। এ আবার কি হাঙ্গামা বাবা! এসব নিয়ে এখন কি করব?

পাশের বাড়ির দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। লেভাক-বৌ এল বেরিয়ে। মশাই গো! ঠাকরুণ গো! দিদিমণি গো! তোমরা কি মোদের পড়শীর খোঁজে এয়েছ? তা সে তো হেথায় নেই, রিকুইলারে গেছে।

তড়বড় করে সে বলে গেল। বার বার বললে, মানুষ তো পরস্পরকে সাহায্য করবেই। মা গেছে; গিয়ে ধন্না দিয়ে আছে রিকুইলারে। আর সে

লেনোর আর আঁরিকে সামলাচ্ছে। বান্ডিল দুটোর উপরে তার নজর পড়ল। সে অমনি তার হতভাগী মেয়ের কথা বলতে লাগল। সে তো এখন বিধবা। নিজের দুঃখ দুর্দশার ফিরিস্তি শুরু হয়ে গেল, চোখ দুটো জ্বলে উঠছে লোভে। তারপর দ্বিধাভরে বললে,

দেখ গো, মোর কাছে চাবি আছে। তা হুজুর, হুজুরাণীরা যদি মন কর তো...দাদু তো বাড়িতেই আছে।

গ্রিগোয়েররা অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়লেন। কি—দাদু আছে? তবে যে কেউ জবাব দিলে না? ঘুমুচ্ছিল না কি? লেভাক-বৌ ঘর খুলতেই ও'রা দেখে অবাক হয়ে গেলেন, থেমে পড়লেন। বনেমোর একা নিবন্ত আগুনের কুণ্ডের ধারে চেয়ারে বসে আছে। চোখ মেলে চেয়ে আছে সামনের দিকে। কামরাটা এখন বেশ বড়ই মনে হয়। সেই কুহু-ডাকা ঘড়িটা আর বার্নিশ-করা আসবাবপত্র আর নেই। দেয়ালে সবুজ রঙের আস্তরের উপর সম্রাট সম্রাজ্ঞীর ছবি দুখানাই শুধু ঝুলছে, দরবারী পোষাকে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে, গোলাপী ঠোঁটে ফুটে উঠেছে সরকারী মহানুভবতার হাসি। বুড়ো ও'দের দেখে নড়লে-চড়লে না, বাইরে থেকে হঠাৎ আলো এসে পড়ায় কেঁপে উঠল না চোখের পাতা। পঙ্গু মানুষ, মানুষ যে ঘরে এসে ঢুকল বুঝি টেরই পায়নি। তার পায়ের কাছে একটা পাত্রে ছাই রয়েছে। পোষা বেড়ালের কাছে যেমন তাদের মলত্যাগের জন্য ছাই-ভরা পাত্র রেখে দেয় —এও তেমনি।

লেভাক-বৌ বললে, আপনারা কিছু মনে কোর না গো। ও একটু অভদ্দর হলেই বা খেতি কি! ওর তো মাথার ঠিক নেই। দু হপ্তা চলে গেল, একটা কথা কয়নি গো!

এমন সময় বনেমোরের কাশির দমক উঠল, যেন পাকস্থলী থেকে উঠে আসছে দমক, সে পাত্রে গয়ার ফেলল—কালো আর ঘন গয়ার। ছাইয়ের সঙ্গে মিশে গেল গয়ার। এখন যেন কয়লা-মেশানো কাদা বলে মনে হয়। পিটে যত কয়লা আছে সব বুঝি ও বুক থেকে কেশে কেশে বার করে দিতে পারে। আবার নীরবতা। আর নড়া-চড়া নেই। শুধু মাঝে মাঝে ফেলছে গয়ার।

অস্থির হয়ে উঠেছেন গ্রিগোয়েররা, বমি আসছে, তবু দু-একটা মিষ্টি কথা হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। একটু পিট-চাপড়ানি তো দরকার।

ম'সিয়ে গ্রিগোয়ের বললেন, বাপু, তোমার ঠান্ডা লেগেছে বুঝি?

বুড়ো চুপচাপ, মাথাটাও দুলে উঠল না। দেয়ালের দিকে সে তাকিয়ে আছে। গভীর নীরবতা আবার ঘনিয়ে এল।

গ্রিগোয়ের-গৃহিণী এবার বলে উঠলেন, তোমাকে একটু জাউ করে দেওয়া উচিত ছিল।

তবুও বনেমোর বোবা। নড়ে-চড়ে না।

আবার গৃহিণী বললেন, একটু চা করে দিলেও তো পারত।

সিসিলি বললে, বাবা, ওরা না বলেছিল, ও পঙ্গু। আমরা তো ভুলেই গেছি সে-কথা।

সে অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল। সে টেবিলের উপর কিছু সুরুয়া আর দু'বোতল মদ রাখলে। দু'নম্বর বাণ্ডিলটা খুলে বার করলে এক জোড়া

মস্ত বুট-জুতো। দাদুকে দেবার জন্য নিয়ে এসেছে। দুহাতে দুপাটি জুতো নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বুড়োর সোঁতে-ফোলা পায়ের দিকে। বুড়ো তো আর কখনো হাঁটতে পারবে না।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের পরিস্থিতিটা একটু সহজ করে নেবার জন্য বলে উঠলেন, বড় দেরীতে এল বুট জোড়া—তাই না বুড়ো? পরিহাস-তরল তাঁর স্বর। যাহোক, তাতে কি এল গেল। জুতো কাজে লেগে যাবে।

বনেমোর শুনতে পায়নি, তাই জবাবও দিলে না। মুখখানা দেখে ভয় হয়। যেন পাথুরে মুখ—তেমনি কঠিন, তেমনি ঠাণ্ডা।

সিসিলি তাই চুপিচুপি বুটজোড়া দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে দিলে। কিন্তু যতই সাবধান হোক, জুতোর কাঁটায় মেঝেয় শব্দ উঠল। বুট জোড়া যেন এ-ঘরে বেমানান, বেঢপ। সকলেরই চোখে লাগছে।

লেভাক-বৌ বুট জোড়ার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাছে, সে এবার বলে উঠল, তা বুড়ো কি আর আপনাদের সেলাম ঠুকবে গো। মাপ কর গো, কি বলতে কি বলে ফেলি। এ যেন হাঁসের নাকে চশমা পরানো হ'ল গো!

বক্ বক্ করে চলেছে লেভাক-বৌ। গ্রিগোয়েরদের তার ডেরায় নিয়ে যেতে চায়। তাঁদের মন ভেজাতে চায়। শেষে একটা ছুতোও খুঁজে পেল। লেনোর আর আঁরির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। ভারি ভাল ছেলে-মেয়ে, ভারি চটপটে। যা শুধাবে, অমনি তার জবাব দেবে। লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ে! ভদ্দর আদমিরা জিজ্ঞেস করে দেখুন না। কি জানতে চান বলুন, অমনি একেবারে তৈরি জবাব।

বাছা, এদিকে একবার এস তো! গ্রিগোয়ের মেয়েকে ডাকলেন। এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচেন।

অসিছি বাবা, তোমরা এগোও।

সিসিলি বনেমোরের কাছে একা রইল। সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ, কাঁপছে থর-থর করে। আগেও বুঝি কোথায় দেখেছে বুড়োকে। কোথায় দেখল এই এমন রক্তহীন কয়লার উল্কি আঁকা মুখ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল। চোখের সুমুখে ভেসে উঠল জনতার ভিড়। চিৎকার করছে তারা, তাকে ঘিরে ফেলেছে। ঠাণ্ডা হাত দুটো টিপে ধরেছে তার গলা। হাঁ, এই সেই লোক! আবার তার সঙ্গে দেখা হ'ল। হাঁটুর উপরে সেই হাত দু'খানা রেখে বসে আছে। পঙ্গু মজুরের হাত। ওর কব্জিতেই সমস্ত শক্তি। বুড়ো হয়ে গেছে, তবু এখনো তার শক্তি অটুট। ধীরে ধীরে বনেমোর যেন জেগে উঠল। ওকে দেখেছে, এবার তার খতিয়ে দেখার পালা। মুখখানা গন্‌গনে রাঙা হয়ে উঠল, মুখের হাঁ খুলে গেছে স্নায়ুর অধীরতায়, আর কালো কালো লাল ঝরছে। দুজনেই অবাক হয়ে দুজনকে দেখছে, বিলাসিনী, হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে, জীবনের দীর্ঘ অলসতা তাকে তাজা করে রেখেছে—তার শ্রেণীর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সে মেদোস্ফীত, তৃপ্ত জীব; আর ঐ মজুর,—জলে ভিজে ভিজে ধরেছে পায়ে সোঁত, হাড়গোড়-ভাঙ্গা জন্তুর মতো বীভৎস—ওয়ারিশানসূত্রে বাপ থেকে ছেলে পেয়েছে একটি শতকের মেহনতি আর বুভুক্ষা।

দশ মিনিট বাদে গ্রিগোয়েররা সিসিলিকে না দেখে আবার মেয়ুদের বাড়িতে এসে ঢুকলেন। এসেই আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁদের মেয়ে মাটিতে পড়ে

আছে। রক্তহীন মুখ, কে যেন গলা টিপে তাকে নিকেশ করে দিয়েছে। তার গলায় এক দানবের হাতের ছাপ—লাল দাগ। বনেমোর পড়ে আছে তারই পাশে। এখনো বাঁকানো তার আঙুল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে তার পিকদানি; ছাই ছড়িয়ে পড়েছে। কালো গয়ারের কাদায় মেঝেয় দাগ। আর সেই মস্ত জুতো জোড়া এখনো দেয়ালের এক-পাশে রয়েছে সাজানো।

কি হয়েছে জানা অসম্ভব। কেনই বা সিসিলি কাছে এল? আর বনেমোর তো চেয়ারের সঙ্গে লেগে আছে, সে-ই বা কি করে ওর গলা টিপে ধরল? যখন সে টিপে ধরে, তখন নিশ্চয়ই ক্ষেপে গিয়েছিল বুড়ো। পীড়নে নিষ্পেষণে তার অন্তিম আর্তনাদও বুঝি রুদ্ধ করে দেয়। টুঁ শব্দটি করেনি সিসিলি, একটু গোঙানিও সরু দেয়াল ভেদ করে পাশের বাড়িতে যেতে পারেনি। এ বুঝি আকস্মিক এক উন্মত্ততা। অভিজাত তরুণীর শুভ্র কণ্ঠ দেখে হত্যার দুর্দম কামনা বুঝি চেপে বসেছিল। সবাই পঙ্গু, অথর্ব বৃদ্ধের এই বর্বরতা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ভারবাহী পশুর শান্তশিষ্ট জীবন সে কাটিয়ে এসেছে, নয়া ভাবধারার সে বিরোধী। কিন্তু কি-এক অজানা বিদ্বেষ তিলে তিলে তাকে বিষাক্ত করে তুলছিল কে জানে! সেই বিষ পাকস্থলী থেকে উঠে এল মগজে—আর তারই ভয়াল তীব্রতায় সব গোলমাল হয়ে গেল। সে এখন হতচেতন। এতো এক পঙ্গু, জরদ্গবের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড।

গ্রিগোয়েররা লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে; শোকে রুদ্ধ কণ্ঠ, ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তাঁদের সাধের মেয়ে, যার কামনায় দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে তাঁরা অধীর হয়ে ছিলেন—তাকে দিয়েছেনও সবকিছু। তার ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চেয়ে জেগে বসে থাকতেন, নিঃশব্দে চলাফেরা করতেন। তাকে খাইয়ে-দাইয়ে তাঁরা সুখ পেতেন না, ভাবতেন কি করে আরো ওকে হৃষ্ট-পুষ্ট করা যায়। ওতো তাঁদের চোখে চির দুর্বল হয়েই ছিল। ওর মৃত্যু তাঁদের পতনেরই সামিল। আর বেঁচে থেকে লাভ কি, ওকে ছাড়াই তো বাঁচতে হবে।

লেভাক-বৌ চিৎকার করে উঠল। উন্মত্ত তার চিৎকার।

ওরে বুড়ো মড়া—ওরে ভিখিরী! কি করলি? কে একথা ভেবেছে গো? মেয়ু-বৌ তো সাঁঝের আগে ফিরবে না। ওকে গিয়ে খুঁজে আনব?

বাপ-মা অভিভূত, নিরুত্তর।

তাই যাই।

যাবার আগে জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখলে লেভাক-বৌ। সারা ধাওড়া এখন উত্তেজনায় অধীর। ভিড় বাড়ছে চারিদিকে। ঐ জুতো জোড়া চুরিও যেতে পারে। তা ছাড়া মেয়ুদের ঘরে তো আর মরদ কেউ রইল না, যে ঐ জুতো পায়ে গলাবে। তাই নিঃশব্দে সে জুতো জোড়া সরিয়ে ফেললে। ব্যুতেলুপের পায়ে মাপ মতো হবে ও-জোড়া।

রিকুইলারে নিগ্রেলের সঙ্গে হানাবু-দম্পতি গ্রিগোয়েরদের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করে আছেন। সন্ধ্যের দিকেই বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন বলে আশা করছেন। কিন্তু গিয়ে তো শুধু পাবেন মৃত দেহ। এখন তো মৃত্যুর থমথমে স্তব্ধতা চারিদিকে ঘিরে আছে। ইঞ্জিনিয়ারের পিছনে

মেয়ু-বৌ বসে আছে কাড়িবর্গার উপরে। লেভাক-বৌ এসে বুড়োর অদ্ভুত কাণ্ডের কথা বলতেই তার মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেল। অসহিষ্ণু মেয়ু-বৌ, বিরক্ত। হাত দুটো উত্তেজনায় উৎক্ষিপ্ত। তারপর লেভাক-বৌয়ের পেছু পেছু সে চলল।

হানাবু-গৃহিণীর উপর দিয়েই ধকলটা বেশি গেল। তিনি প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েন আর কি! একি কাণ্ড! বেচারী সিসিলি, এমন হাসিখুশি ছিল, এক ঘণ্টা আগেও ছিল প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা! মঁসিয়ে হানাবু স্ত্রীকে বুড়ো মোকের ডেরায় নিয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন পোষাক। কস্তুরী গন্ধ পেয়ে বিব্রত হলেন। ওঁর কাচুলীতো তারই সুবাসে মদির। সুস্থ হয়েই নিগ্রেলকে জড়িয়ে ধরলেন হানাবু-ঘরনী। চোখ দিয়ে ঝরছে অশ্রুর বন্যা। নিগ্রেলও হতবুদ্ধি। বিয়ের আশা তার শেষ। স্বামী স্ত্রী আর ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁরা পরস্পরের দুঃখে দুঃখী। মনের ভার নেমে গেল। এই যে বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটে গেল, এতে একটা সুরাহাই হ'ল তাঁর। নিজের ভাগ্নে বরং ভাল; গাড়োয়ান জুটলে তো কেলেঙ্কারির একশেষ হোত!

পাঁচ

পিটের তলায় জল এখন কোমর-অবধি। পরিত্যক্ত হতভাগ্যের দল ভয়ে আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছে। জলের ধারা কলকল্লোলিত। তারা তো বধির হয়ে গেছে তার শব্দে। কাঠের দেয়ালের ভগ্নাবশেষ এবার ভেঙে পড়ল। এ যেন প্রলয়ের শেষ নির্ঘোষ। আস্তাবলে বন্ধ ঘোড়ার চীৎকারে ওদের ভীতি এবার আরো ভয়াল হয়ে উঠল। এ যেন জবাইএর সময় পশুর অন্তিম আর্তনাদ।

মোকে বাতাইলের দড়াদড়ি খুলে দিয়েছে। বুড়ো ঘোড়াটা থরথর করে কাঁপছে, বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। জল ক্রমেই বাড়ছে। পিটের মুখ ভরে উঠছে। উত্তাল জল। তিনটি বাতি এখনো জ্বলছে। তাদের লালচে আলোয় জলধারা কেমন নীলচে হয়ে উঠল। হঠাৎ তুষার-শীতল জলের ছোঁয়া লাগল গায়ে। বাতাইল পাগলের মতো লাফিয়ে পিছনে হটে গেল, তারপর মিলিয়ে গেল কাঁথির ভিতরে। আর মানুষের দল নিরাপত্তার জন্য ছুটল তারই পিছনে।

মোকে চেঁচিয়ে উঠল, এই গর্তে বসে কি আর হবে। এস রিকুইলারের দিকটায় যাই।

পথ বন্ধ হবার আগে ওরা যদি পুরানো ঐ পিটে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তাহলে হয়তো মুক্তির আশা আছে। কথাটা ভাবতেই সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এক সারে বিশজন মানুষও ধাক্কা মারছে, ঠেলাঠেলি করছে। আলো গুলো ধরে আছে উঁচুতে, যাতে জল লেগে না নিবে যয়। বরাত ভাল, কাঁথিটা উঁচু। দুশো মিটার ওরা জল ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। জল ক্রমেই বাড়ছে। ভয়ার্ত মনে পুরানো সংস্কার ফুট কাটছে। ওরা ওদের মাটি-মাকে ডাকছে, তাঁর শিরা কেটে রক্ত ঝরাচ্ছে বলে তিনি তো ধনিকের উপর এই প্রতিশোধ নিচ্ছেন। কে এক বুড়ো মৃত্তিকা-মার সেই বিস্তৃত স্তোত্র অস্ফুট

স্বরে গেয়ে উঠল। বুড়ো আঙুলটা হেলিয়ে দিলে যাতে খনির শয়তান এসে তাদের না চেপে ধরে।

পয়লা মোড়ে পেঁছেই তর্ক-বিতর্ক বেঁধে গেল। সহিস বলে বাঁ দিকে যাবে, কিন্তু আর-সবার মত ডান দিকেই সোজা রাস্তা। এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল।

সাভাল চেঁচিয়ে উঠল, তাহলে এখেনেই তোরা পচে মর্! আমি তো এই সড়ক ধরলাম।

ডান দিকেই এগিয়ে গেল সে। তার পিছনে আরো দু'জন। বাকি সবাই মোকে-বুড়োর পিছনে। লোকটা রিকুইলারের পিটে থেকে বুড়ো হয়ে গেল। ওর কথার দাম আছে বই কি! কিন্তু বুড়ো নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত। কোন দিকে যাবে দিশে পাচ্ছে না। কারো মাথার ঠিক নেই; বুড়োরা পর্যন্ত পথ ঠাহর পাচ্ছে না। পথ তো নয় এক গোলকধাঁধা। প্রতিটা মোড়ে গিয়ে ওরা অনিশ্চিত আশংকায় থেমে থেমে পড়ছে। কিন্তু মন স্থির করা তো চাই।

এতিয়েং আছে একেবারে পিছনে। ক্যাথেরিনের জন্যই সে পিছনে পড়ে আছে। ভয়ে আর শ্রান্তিতে সে পঙ্গু। সাভালের দেখানো ডান দিকের পথটায়ই সে যেত। তার মনে হয়েছে, সাভালই ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু তবু যায় নি। চিরকাল এখানে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবে, তবু সাভালের পথে যাবে না। ঠেলাঠেলি বেড়ে উঠছে। ক'জন সাথী ওদিকে চলে গেল। বুড়ো মোকের পিছনে এখন মাত্র সাতজন।

এতিয়েং দেখলে, ক্যাথেরিন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, সে তাই বললে, আমার গলা জড়িয়ে ধর, আমি তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাব।

না, না, ক্যাথেরিন নিষেধ করলে। আর তো চলতে নারি। এখানে নিকেশ হলি তো ভাল হয়।

আর সবার চেয়ে পঞ্চাশ মিটার পিছনে পড়ে গেছে ওরা। এতিয়েং তাকে কোলে তুলে নিতে গেল। নারাজ হলেই বা কি, সে নেবেই কোলে তুলে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে কাঁথির পথ বন্ধ। একখানা মস্ত চাঁই খসে পড়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিলে দল থেকে। বন্যার জল এরই মধ্যে ভিজিয়ে দিয়েছে পাথর, চারিদিকে খসে পড়ছে চাঙড়ের পর চাঙড়। ওরা পেছু হটে আসতে বাধ্য হ'ল। আবার পথও হারিয়ে ফেললে। রিকুইলারের পথে মুক্তির আশা আর নেই। এখন শুধু একমাত্র আশা, উপরের স্তরে গিয়ে পেঁছনো। বন্যার জল কমে গেলে তবু উদ্ধারের উপায় হতে পারবে।

অবশেষে গিয়োম স্তর দেখা দিল। দেখে চিনতে পারলে এতিয়েং।

সে চেঁচিয়ে উঠল, যাক্ বাঁচা গেল। এখন তো কোথায় আছি তার পাত্তা মিলেছে। ঠিক পথ ধরেই তো চলছিলাম; এখন তো পথ মিলেজুলে একশা হয়ে গেল। এবার সিধে যাব। কাঁথিতে গিয়ে পেঁছব।

বন্যার জল এসে বুকে লাগছে, ধাক্কা মারছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ওরা। আলো যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ হতাশ হবে না। তেল বাঁচাবার জন্য ওরা একটা আলো নিবিয়ে দিলে। তেলটা বাতিতে ঢেলে দেবে। এবার চোঙটার কাছে এগিয়ে এল। পিছনে শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। কোন সাথী না কি? হয়তো ওদের মতোই রাস্তা বন্ধ দেখে ফিরে এসেছে। দূর থেকে

ভেসে এল গর্জন। কোথা থেকে ধেয়ে আসছে এই ঝড় বোঝা যায় না। শুধু ফেনা বুঝি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। ওরা চেঁচিয়ে উঠল। এক বিরাট সাদা ঢেউ অন্ধকার থেকে গড়াতে গড়াতে ছুটে এল। সামান্য কাঠের দেয়াল, তারই ওপাশে ওরা। সেই কাঠের দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল ঢেউ, ভেঙে পড়ল।

কে? বাতাইল। পিটের মুখ থেকে পালিয়ে এসে অন্ধকার কাঁথির পর কাঁথি পার হয়ে উন্মাদের মতো সে ছুটছিল। এই যে পাতালপুরী, এর পথ-ঘাট তার চেনা জানা। এখানে সে এগারোটি বছর কাটিয়েছে। চিরন্তন অন্ধকারের রাজ্যের সে বাসিন্দে—এই অন্ধকারে তাই সে দেখতেও পায়। জোর কদমে ছুটছে বাতাইল, মাথা নোয়ানো, পা তোলা। এই যে সরু নলের মতো পথ—এই পথ ধরে সে ছুটছে—তার বিরাট দেহটায় ভরে গেছে সংকীর্ণ পথ। পথের পর পথ পার হয়ে যাচ্ছে, মোড়ের পর মোড়। দ্বিধা নেই। কোথায় চলেছে সে? সে যাবে ঐখানে—ঐখানে—যেখানে তার যৌবনের স্বপ্ন বাসা বেঁধে আছে। যাবে সে সেই কলবাড়িতে—স্কার্পের কাটা খালের ধারে যেখানে সে একদিন জন্মেছিল। তার স্মৃতিতে এখন সূর্য ঝলমল করে উঠছে—একটা যেন বিরাট বাতি ঐ সূর্য—শূন্যে ঝুলে ঝুলে আছে। বাঁচতে সে চায়। পশুর স্মৃতি জেগে উঠেছে; আবার উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলবে, তারই কামনায় সে ছুটেছে রন্ধ্রের সন্ধানে। ঐ রন্ধ্র পথই তো সূর্যের উষ্ণ আলোর পথ—জীবনের পথ। তার সেই চিরাচরিত বশ্যতা এখন বিদ্রোহের প্লাবনে ভেসে গেছে; এই পিট তো তাকে তিলে তিলে হত্যা করছিল, তাকে অন্ধ করেও দিয়েছে এই পিট। কিন্তু জল যে পিছু ছাড়ে না। ঊরুর উপর এসে চাবুকের মতো পড়ছে, পিছনে কামড়ে দিচ্ছে, খুবলে নিচ্ছে। বাতাইল তাই ছুটছে। কাঁথি এবার সরু হয়ে এসেছে, ছাদ নিচু, দেয়াল বেরিয়ে এসে পথ প্রায় জুড়ে ফেলেছে। তবু সে ছুটছে জোর কদমে—গা ছড়ে যাচ্ছে, দেহের মাংস কাঠে টুকরো টুকরো বিঁধে আছে। চারিদিক থেকে খনি যেন তাকে পিষে ফেলতে চাইছে। তাকে সে চেপে ধরবে, তার টুটি টিপে নিকেশ করে দেবে।

এতিয়েঁ আর ক্যাথেরিন ওর কাছে এসে দেখলে, ও পাথরের চাঙড়ে আটক পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে সামনের পা দুটি গেছে ভেঙে। শেষ চেষ্টায় কয়েক হাত সে এগিয়ে গেল, কিন্তু আর যেতে পারে না। সে ফাঁদে পড়েছে, মৃত্যু তার টুঁটি চেপে ধরেছে। রক্তাক্ত মাথাটা বাড়িয়ে দিয়েছে, ভয়ার্ত চোখ মেলে এখনো আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে কোন ফাটল। জল তার গা ডুবিয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে। গোঙাচ্ছে বাতাইল—আস্তাবলে এমনি গোঙানির পর স্তব্ধ হয়ে গেছে আর আর ঘোড়াগুলো। এ এক ভয়াবহ মৃত্যু। বেচারী বৃদ্ধ পশু—ক্ষতবিক্ষত বন্দী সে—মাটির মার বুকে এই তার শেষ মুক্তি সংগ্রাম—। দিনের আলো থেকে কত দূরে সে পড়ে আছে। তার গোঙানি থামল না। জল এবার কোমর অবধি উঠে এল, তখনো চলছে একটানা গোঙানি। মুখ তুলে সে গোঙাচ্ছে—ভাঙা তার স্বর। তারপরে অন্তিম ঘড়ঘড়ানি শুরু হয়ে গেল। এ যেন পিপে ভরতি করার সময়ের কলকল শব্দ, তারপর নিস্তব্ধতা।

ক্যাথেরিন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, হেই ভগমান, মোরে নাওনা কেনে! ডরে তো মরে যাব। মরতে তো চাই না। মোরে যেথা হয় নে যাও গো, নে যাও!

মৃত্যু সে দেখেছে। স্যাফট পড়ে গেছে, খনিতে বন্যা বয়ে চলেছে, এতে সে ভয় পায় নি। কিন্তু বাতাইলের এই মৃত্যু-যন্ত্রণা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সে যেন অহরহ শুনতে পাচ্ছে, কানে বাজছে। তার হাড়মাস অবধি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নে চল, মোরে নে চল!

এতিয়েঁ তাকে তুলে নিলে। সময়ও হয়ে এল। চোঙের পথে উঠে এল। কাঁধ অবধি ভেজা। ক্যাথেরিনকে ধরে তুলতে হ'ল, রোলা ধরে আঁকড়ে থাকতেও পারছে না মেয়ে। তিন-তিনবার মনে হ'ল, সে বুঝি হাত ফসকে পড়েই গেল। নিচে তো অতল সমুদ্র। সেখানে ঢেউ গর্জন করে চলেছে। যাহোক, পয়লা কাঁথিতে এসে ওরা হাঁক ছাড়বার সময় পেল। এখানে এখনো জল ঢোকে নি। কিন্তু জল ধেয়ে আসতে দেরি হ'ল না। ওরা আরো উপরে উঠতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল ওঠার পালা। বন্যার জল স্তর থেকে স্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। উপরে, আরো উপরে উঠে আসতে ওরা বাধ্য হ'ল। ছ'নম্বর স্তরে এসে বিশ্রাম মিলল। জলের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। আশায়, উত্তেজনায় ওরা অধীর। কিন্তু সে তো ক্ষণিকের জন্য। গতি আরো বেড়ে গেল হঠাৎ। সাত নম্বর স্তরে এসে উঠল। তার পরে আট। আর একটি স্তর বাকি। সেটিতে উঠে ওরা চারিদিকে আশঙ্কায় তাকিয়ে রইল। জল বেড়েই চলেছে। যদি না থেমে যায় জলের গতি, তাহলে তো মৃত্যু অনিবার্য। ঐ বুড়ো ঘোড়ার মতোই ছাদে আছড়ে পড়ে ওরা মরবে। ওদের ফুসফুসে ঢুকবে জল!

প্রতি মুহূর্তে নতুন করে ধস্ নামছে। প্রতিধ্বনি উঠছে। গোটা খনিটাই নড়ে-নড়ে উঠছে। তার পাকস্থলী তো বহু জল পান করেছে, এখন তো বন্যার ধারায় পেট ফেটে মরছে। কাঁথিগুলির শেষ প্রান্তে হাওয়া এখন বন্ধ হয়ে গুম গুম করে উঠছে, কয়লার পাথরে পাথরে আছড়ে পড়ছে, পিষে যাচ্ছে—আবার বিস্ফোরণে ফেটে পড়ছে টুকরো টুকরো পাথর আর মাটি ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরের বিপর্যয়ে এক ভয়ঙ্কর আর্তনাদ উঠছে। যখন প্রলয়পয়োধি জলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে ছিল সেই পুরাকালের সংগ্রামেরই এ যেন প্রতিধ্বনি। পর্বত চূড়া সেদিন প্রান্তরের নিচে ভূগর্ভে নিয়েছিল আশ্রয়।

ক্যাথেরিন এই পতনের আবেগে থরোথরো, হতচকিত। সে হাত জোড় করে অবিরাম বলে চলেছে, মরতে তো চাই না গো, মরতে তো চাই না!

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এতিয়েঁ বললে, জল আর ছুটে আসছে না। ওরা পুরো ছ'ঘণ্টা ধরে ছুটছে। এবার তো উদ্ধারের সময় আগত। না জেনেই ও ছ'ঘণ্টা বললে। সময়ের হিসেব তো ওরা হারিয়ে বসে আছে। আসলে গিয়োম স্তর পার হয়ে আসতে আসতে গোটা দিনটাই কাবার হয়ে গেছে।

সারা গা ভিজে গেছে। ঠকঠকিয়ে কাঁপছে ওরা শীতে। এবার ওরা বসে পড়ল। ক্যাথেরিনের সরম নেই। সে পোষাক খুলে ফেলে নিঙড়ে নিয়ে আবার পরলে কাঁচুলি আর পাজামা। এখন গায়ে-গায়েই শুকোবে পোষাক। পা ওর খালি। এতিয়েঁ তাকে জোর করে নিজের গোড়তোলা জুতো পরিয়ে

দিলে। এখন ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা চলতে পারে। বাতির পলতে দিয়েছে কমিয়ে। শুধু এখন আলোর রেখাই দেখা যায়। এ যেন অন্ধকারে আলোর ফুলকি। এতক্ষণ পর্যন্ত খিদে পায়নি, এবার তো পেটে যেন হুল ফোটানো শুরু হ'ল। ওরা টের পেল, খিদের জ্বালায়ই মারা পড়বে। প্রাতরাশের আগেই এই বিপর্যয় শুরু হয়, এখন তো পুঁটলি খুলে দেখলে মাখন রুটি জলে ভিজে ফুলে উঠেছে—সে যেন এক কাই। এতিয়েঁকে তারই ভাগ নিতে কত সাধা-সাধি। শেষে ক্যাথেরিন রেগেই উঠল। খেয়ে-দেয়ে ক্যাথেরিন ঠাণ্ডা মাটিতে ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিলে। এতিয়েঁর ঘুম নেই। নিদ্রাহীনতা তাকে গ্রাস করেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দুহাতে চেপে ধরে আছে কপাল।

কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে ? কে বলবে। সে তো জানে না। শুধু জানে, সামনে বন্যা এসে দেখা দিয়েছে। যে গর্ত দিয়ে ওরা উঠে এল সেই গর্ত দিয়ে সামনে বন্যা—কৃষ্ণ, সঞ্চরমান জীব যেন—তার পিটটা ফুলে ফুলে উঠছে। ঐ কুঁজটা বুঝি এখুনি তাদের ছুঁয়ে ফেলবে। প্রথমে তো ছিল সরু একটা রেখা, এক লীলাচঞ্চল সাপ—নিজেকে বিছিয়ে দিয়েছিল অলস শয়ানে; তার-পরে সেই সাপ বেড়ে উঠল। এবার যে এক ভয়ংকর শ্বাপদ হয়ে উঠেছে, গুঁড়ি মেরে মেরে চলেছে। ওদের নাগালও সে পেয়ে গেল। ঘুমন্ত মেয়ের পা ডুবে গেল জলে। সে ভেবে পেল না ওকে জাগিয়ে দেবে কিনা। ওকে এই বিশ্রাম থেকে জাগিয়ে দেওয়া তো নিষ্ঠুরতা—এযে এক রমণীয় বিস্মৃতি। হয়তো ও এখন স্বপ্ন দেখছে উন্মুক্ত প্রান্তরের সূর্য করোজ্বল উদার জীবনের। তা ছাড়া, ওরা যাবেই বা কোথায় ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল এতিয়েঁর, এখানকার চানক বা স্তর ঢালু হয়ে গিয়ে পরের চানকে মিশে গেছে। বেরুবার সেইটেই পথ। কিন্তু ক্যাথি যতক্ষণ পারে ঘুমিয়ে নিক। সে তো জলের দিকে চেয়ে বসে আছে। আসুক, ওদের তাড়া করুক ঐ জলের স্রোত। বহুক্ষণ পার হয়ে গেল। জলের স্রোত এবার কাছে, আরো কাছে। ও তাড়াতাড়ি ক্যাথিকে তুলে নিলে কোলে। হঠাৎ কেঁপে উঠল মেয়ে।

হেই ভগবান ! আবার শুরু হল ?

ক্যাথেরিনের মনে পড়ে গেছে। মৃত্যুকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে চিৎকার করে উঠল।

এতিয়েঁ কানে কানে বললে, না, না, তুমি একটু বসতো লক্ষ্মীটি। আমরা ঠিক পার হয়ে যাব।

ঢালু জায়গা বেয়ে ওরা নুয়ে পড়ে চলতে লাগল। আবার কাঁধ-অবধি জলের স্রোতে ডুবে যাচ্ছে। খানিকটা পরে শুরু হ'ল লড়াই। কিন্তু এখানে বিপদ আরো বেশি। সুড়ঙ্গটা এখানে একশো মিটার লম্বা। আগাগোড়া কাঠ দিয়ে ঘেরা। তার ধরে ওরা পরখ করে দেখতে চাইলে গাড়িগুলো উপরে ঠিক আছে কিনা। যদি না থাকে, তাহ'লে ওঠার সময়ে হুড়মুড় করে গাড়ি-গুলো পড়ে ওদের পিষে ফেলবে। কিন্তু তার ধরে টানতেও কিছু হ'ল না। বোধহয় কিছু একটা বিগড়ে গেছে। তাই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই উঠতে হ'ল। তার ধরে ওঠারও আর সাহস নেই। কাঠ ধরে উঠতে গিয়ে নখ ভেঙে যাচ্ছে। উঃ, কি পালিশ আর পিছল কাঠ ! সামনে এগিয়ে চলেছে ক্যাথেরিন, হাত ছড়ে যাচ্ছে। পিছনে এতিয়েঁ, তাকে ধরে আছে। হঠাৎ ওরা এসে এমন

এক জায়গায় হাজির হ'ল, যেখানে একটা কড়ি-বরগা ভেঙেপড়ে পথ আটক করে রেখেছে। মাটির ধস্ নেমেছে সঙ্গে সঙ্গে—উপরে যাবার আর পথ নেই। বরাত ভাল, একটা পথ পাওয়া গেল। ওরা গিয়ে হাজির হ'ল একটা কাঁথিতে। সামনে বাতির ঝলকের আভাস পেয়ে ওরা তো অবাক।

কে একটা লোক চেঁচিয়ে উঠল।

তাহলি মোর মত হাঁদাও আছে!

ওরা চিনে ফেলল। লোকটা সাভাল। সেও উপরের চানক থেকে নামা ধসে আটক পড়ে গেছে। যে দুটি সাথী তার সঙ্গে রওনা হয়েছিল, তারা এখন পথে পড়ে আছে—চুরমার হয়ে গেছে মাথার খুলি। সে নিজেও জখম হয়েছে, কনুয়ে লেগেছে চোট। তবু সাহস আছে লোকটার, হামাগুড়ি দিয়ে ওদের কাছে ফিরে গিয়ে বাতি দুটো আর মাখনরুটি ক'টা নিয়ে এসেছিল। তারপর পালাতেই আবার ধস নামে। কাঁথির পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

ওদের দেখেই সে ভাবলে, এই যে দুটো লোক উঠে এল—ওদের সে খাবারের ভাগ কিছুতেই দেবে না। তার চেয়ে ওদের মাথায় বাড়ি মেরে সাবাড় করে দেবে! এবার সে চিনতে পারলে ওদের। রাগ আর নেই, বরং এক শয়তানী উল্লাসে ও হেসে উঠল।

আরে, ক্যাথি যে। তাহলি ছুটে এয়েছিস মাইরি! নিজের মরদটাকে বুঝি ভুলতে পারলি নারে! বহুৎ আচ্ছা! আয়—আবার আগের মতো থাকি!

এতিয়েংকে যেন দেখেও দেখেনি। এতিয়েং এই আঘাতে অভিভূত। সে এই কুলি-কামিনটাকে বাঁচাতে চায়। সেও ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ পরিস্থিতি এড়ানো যায় না। বন্ধুর মতোই সে শুধালে?

কি দেখলে? ঐ চানকটায় কি যাওয়া যাবে সাঙাৎ?

যাবে? না, না, ধস্ নামল যে! এখন তো দুধারে দুই দেয়াল, মাঝখানে ফাঁদে মোরা আটক। তা তোমার যদি তাকত থাকে তো চানকে যাও না!

কথাটা সত্য। এখনো জলের স্রোত বাড়ছে। ছলছল কলকল শব্দ উঠছে। পেছু হটবার পথ নেই। এ এক ইঁদুর-ধরা ফাঁদ। পাথর পড়ে কাঁথির দুই মুখই এখন বন্ধ। বেরুবার পথ নেই। তিনজনেই চার দেয়ালে বন্দী মানুষ।

সাভাল ঠাট্টা করে উঠল, তাহলি থাকাই ঠিক করলে সাঙাৎ? তা ছাড়া উপায় কি! মোরে না ঘাঁটালি, আমি তোমাদের সাথে কথাটি কইব না। দু'জন মরদের ঠাঁই এখেনে আছে। তারপরে দেখি, কে আগে সাবাড় হয়। এরই মধ্যে কেউ যদি বাঁচাতে আসে তো ভাল। তবে সে আশা নেই।

এতিয়েং বললে, পাথরে আমরা যদি টোকা মারি, কেউ শুনতে তো পারে।

আমি তো হন্দ হয়ে গেনু।

টোকা মারার নিকুচি করেছে! তুমি একবার পরখ করে দেখ না সাঙাৎ!

এতিয়েং এক টুকরো বালি পাথর তুলে নিলে। পাথরখানা ভেঙেছিল সাভাল। ঠুকে ঠুকে এরই মধ্যে অর্ধেক খইয়ে ফেলেছে। সে পাথরখানা নিয়ে এক প্রান্তে গিয়ে খনির মজুরের সংকেত পাঠাতে লাগল। বিপদের সময় এমনি সংকেত পাঠিয়ে খনির গোলামরা নিজেদের হদিস জানায়। পাথরে কান পেতে আছে এতিয়েং—পাথরের উপর পাথর দিয়ে ঠুকছে বার বার। কিন্তু জবাব তো এল না।

এরই মধ্যে সাভাল ঘর-সংসার সাজাতে লেগে গেছে। নিজের বাতি তিনটে এক সারে সাজিয়ে রাখলে দেয়ালের ধারে। একটা বাতিই শুধু জ্বলছে। অন্যগুলো এখন নেবানো। দরকার পড়লে জ্বালানো হবে। এবার একখানা কাঠের উপর দুটো টুকরো মাখনরুটি সাজিয়ে রাখলে। এই দু'খানাই বাকি আছে। এই ওর তাক। একটু গুছিয়ে চললে, দুদিন ঐ দুখানায়ই দিব্যি চলে যাবে। সে ফিরে তাকিয়ে বললে,

হেই ক্যাথি, তোর ভুখ্ লাগলি আধখানা পাবি!

মেয়েটি চুপচাপ। আবার দুই পুরুষের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের ভরা তার পূর্ণ হ'ল।

শুরু হ'ল এক ভয়াবহ জীবনধারা। সাভাল আর এতিয়েং মাটিতে বসে আছে কাছাকাছি, মুখে তাদের রা নেই। সাভাল একটা মন্তব্য করতেই এতিয়েং তার বাতিটা নিবিয়ে দিলে। সত্যই এ এক বৃথা ব্যয়—বিলাসিতারই নামান্তর। আবার দুজনেই চুপচাপ। ক্যাথেরিন তার পুরানো প্রেমিকের চাউনি দেখে কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। তাই এতিয়েং'র গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। জলের স্রোত বাড়ছে। তারই ছলছল কলকল শব্দ। আর মাঝে মাঝে দূরাগত ধস্ নামার শব্দ, তারই প্রতিধ্বনি এসে বাজছে কানে। খনি বুঝি এবার একেবারে ধ্বসে পড়ল। বাতি নিবে গেল এবার। ওরা আর একটা জ্বালাতে গেল। ফায়ারড্যাম্পের কথা ভেবে এল মুহূর্তের দ্বিধা। কিন্তু অন্ধকারে পচে মরার চেয়ে একেবারে উড়েপুড়ে যাওয়াটাই ওদের এখন ভাল। কিন্তু গ্যাসের হিস্‌হিসানি তো উঠল না, বিস্ফোরণের শব্দও না। আবার ওরা শুয়ে পড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে চলল।

একটা শব্দে চমকে উঠল এতিয়েং আর ক্যাথেরিন। মুখ তুলে তাকালে। সাভাল এবার কিছু খাবে। এক টুকরো মাখনরুটি কেটে নিয়ে চিবুচ্ছে ধীরে ধীরে—একেবারে গিলে ফেলবার লোভ সামলাচ্ছে। ওরা তাকিয়ে আছে, খিধেয় জ্বলছে।

ক্যাথেরিনকে একটু উস্‌কে দেবার জন্যে বললে, তাহলে তোর চাই না রে? কিন্তু ভুল করলি।

ক্যাথেরিন চোখ নামিয়ে নিলে। কি জানি যদি নিজেরই অজান্তে রাজী হয়ে যায়। পাকস্থলীতে ফুটছে ক্ষুধার হুল, চোখে তাই জলের ধারা। কিন্তু ঐ সাভাল কি চায় সে জানে। সকালে তো ওর গলার কাছে ওর নিঃশ্বাস ক্যাথেরিন টের পেয়েছিল। আবার আর-এক পুরুষের কাছে ওকে দেখে ওর সেই পুরানো বর্বর কামনা চাগিয়ে উঠেছে। ওকে ডাকছে চোখের ইশারায়—সে ইশারায় যে সংকেত তা ওর জানা। সে তো ঈর্ষা আর ক্রোধের সেই পুরানো শিখা। এমনি যখন জ্বলে উঠত চোখ, সাভাল তো ওর উপর পড়ে এলোপাথাড়ি কিল-ঘুষি চালাত। আর বলত ওর মার ভাড়াটের সঙ্গে ওর কেলেঙ্কারির কথা। কিন্তু সে ওর কাছে যাবে না। কি জানি, হয়তো ঐ সরু গুহায় দু'জনে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। সবাই তো এখন মরণের মুখোমুখি। এখন কি এসব চলে? কেঁপে উঠল ক্যাথেরিন। হেই ভগমান—ওরা কি দোস্তি পাতাতেও পারে না?

এতিয়েং'র পণ—সে উপোস করে মরবে—তবু সাভালের কাছে এক টুকরো

রুটি মাগবে না। নীরবতা ক্রমে ভয়াল হয়ে উঠছে। ছড়িয়ে পড়ছে ওদের সম্মুখে চিরন্তনতায়। একঘেয়ে মুহূর্তগুলি একে একে পড়ছে খসে নিঃশব্দে, নিঃসহায়ে। পুরো একদিন এমনি আছে ওরা। দোস্‌রা বাতিটাও এখন নিবু নিবু। ওরা তাই তিন নম্বরেরটা জেবলে নিলে।

সাভাল এবার মাখনরুটির দ্বিতীয় টুকরোটা খাচ্ছে।

আয় না হাঁদা, চলে আয় না! চেঁচিয়ে উঠল সাভাল।

ক্যাথেরিন শিউরে উঠল। এতিয়েঁ মুখ ফিরিয়ে নিলে। ও যাক না, গিয়ে খেয়ে নিক না! কিন্তু নড়ছে-চড়ছে না মেয়ে। সে চাপা স্বরে বললে,

যাও না লক্ষ্মীটি।

এতক্ষণ চেপে রেখেছিল, এবার অঝোরে ঝরল চোখের জল। বহুক্ষণ ধরে কাঁদল। উঠে দাঁড়াবার শক্তি তার নেই। সে যে উপোসী, সে কথাও ভুলে গেছে। দুঃসহ ব্যথায় অধীর, সারা দেহ ছেয়ে আছে ব্যথা। এতিয়েঁ উঠে দাঁড়াল। এবার পায়চারী করছে। সংকেত পাঠাচ্ছে। বৃথা সংকেত। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এতিয়েঁ। •জীবনের শেষ মুহূর্ত ক'টা কি এই ঘৃণ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আটক থেকে তাকে কাটাতে হবে! মরবার জন্যেও কি আলাদা ঠাঁই মিলবে না! দশ পা এগোন যায় না, অমনি ফিরে তাকাতে হয়। আর ঐ লোকটার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অত্র এই বেচারী মেয়ে—মাটির গর্ভে—এই গহবরে এখনো ওরা ওরই জন্য করছে লড়াই! যে জীবিত থাকবে, সে হবে তারই ভোগ্যা। সে যদি আগে মারা যায়, ঐ লোকটা তার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নেবে। এর আর শেষ নেই। প্রহরের পর ভেসে আসছে প্রহর। এযেন এক এলোমেলো জীবনধারা—প্রতিমুহূর্ত এর বিষাক্ত হয়ে উঠছে নিজেদের বিশ্রী নিঃশ্বাসে, দৈহিক প্রয়োজন ওরা মেটাচ্ছে পরস্পরের সম্মুখে। বিদ্রোহী হয়ে উঠছে মন। দু-দুবার সে পাথরের দেয়ালের দিকে ধেয়ে গেল। ঘুষি মেরে বুঝি দুভাগ করে ফেলবে।

আর-এক দিন ফুরাল। সাভাল এসে বসেছে ক্যাথেরিনের পাশে। রুটির শেষ টুকরোখানা ভাগাভাগি করে খাচ্ছে তার সঙ্গে। চিবুতে ক্যাথেরিনের কষ্ট হচ্ছে, তবু চিবুচ্ছে। রুটির টুকরোর দাম আদায় করছে সাভাল তার গালে চুমু খেয়ে। তার সংকল্প ঈর্ষায় আরো দৃঢ়ীভূত, ঐ পুরুষটার সম্মুখেই সে ক্যাথেরিনকে গ্রহণ করবে, মরবার আগেই গ্রহণ করবে। ক্যাথেরিন অবসন্ন, সেও যেন রাজী হয়ে এল বলে। কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে যেতেই সে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল।

মোর লাগে, মোরে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!

ভাবাবেগে উদ্বেলিত এতিয়েঁ। এতিয়েঁ কাঠের রোলার উপর মুখ ঠুসে ছিল। দেখবে না, দেখতে সে চায় না। কিন্তু আর পারলে না। রাগে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল,

এই হাত নামা বলছি!

সাভাল খেঁকিয়ে উঠল, তোর কি রে? মোর মাগীর সাথে যা মন চায় তাই করব—তোর কি? না তোর হুকুম নিতি হবে?

আবার চেপে ধরেছে ক্যাথেরিনকে, আঁকড়ে ধরেছে দু হাত দিয়ে। নিছক বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে নিজের গোঁফসুদ্ধু মুখ ওর মুখের উপর চেপে ধরল।

মোরা একা থাকব। মানে মানে সরে পড় সাঙাৎ!

এতিয়েঁর মুখ ফ্যাকাশে, সে চিৎকার করে উঠল,

যদি ওকে ছেড়ে না দিস তো তোর টুঁটি টিপে নিকেশ করে দেব।

সাভাল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সাথীর স্বর শুনে বুঝেছে, ও যা বলছে, তাই-ই করবে। মৃত্যু যেন ঢিমে চালে এগুচ্ছে, তাই একজনকে আর-একজনের পথ সাফ করে দিতে হবে। আবার শুরু হয়ে গেল সেই পুরানো বিবাদ এই মাটির নিচে—গহ্বরের গভীরে। এখানে আর কিছুক্ষণ পরে তো ওরা পাশা-পাশি বিভোর হয়ে যাবে চির নিদ্রায়। সংকীর্ণ গুহা—মুঠো-পাকানো হাত তোলা দায়। হাত ছড়ে যাবার ভয় আছে।

সাভাল চিৎকার করে উঠল, দ্যাখ্ না, এবার তোকে কি করি!

এতিয়েঁ ক্ষেপে গেল। তার চোখ যেন ডুবে গেছে রক্ত কুয়াশায়, মগজে ছুটে এল রক্তধারা। সেই রক্ত-তৃষা আবার পেয়ে বসেছে। দৈহিক প্রয়োজনের মতোই এর জোর তাগিদ। এ যেন কাশিরই দমক, উঠেছে কণ্ঠনালীতে—কাশতে তো হবেই। তাগিদ বাড়ছে, তার ইচ্ছাশক্তি ভেসে গেছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রোগের প্রচন্ড আক্রমণে। দেয়ালের একখানা পাথর ধরে জোরে নাড়া দিলে, খসিয়ে আনলে। জবর পাথর—যেমনি চওড়া তেমনি ভারি। তার পরে দুহাতে দশটা মানুষের শক্তি জড়ো করে ছুঁড়ে মারলে সাভালের মাথায়।

লাফিয়ে এড়িয়ে যাবার সময় পেলে না সাভাল। লুটিয়ে পড়ে গেল। মাথার খুলি ভেঙে গেছে, থেঁতলানো মুখ। কাঁথির মেঝেয় মগজের ঘী ছড়িয়ে পড়েছে, আর শতমুখ থেকে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে। এ রক্তের ধারার বিরাম নেই—যেন অবিরাম ঝরণাধারা। দেখতে দেখতে নদী হয়ে গেল, বাতির ধোঁয়াটে তারাটা তারই ভিতরে ছায়া ফেলছে নিজের। চারিদিকে দেয়াল-ঘেরা গহ্বরে অন্ধকার দিয়েছে হানা, নিচে মাটিতে পড়ে আছে লাশটা। দেখে কয়লার স্তূপ বলে মনে হয়।

এতিয়েঁ ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেল। তার চোখ বিস্ফারিত। তাহলে শেষ হয়ে গেছে; সে খুন করলে! তার বিগত সংগ্রামের দিনগুলি চেতনায় সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। তার দেহে যে বিষ লুকিয়ে ছিল, তার বিরুদ্ধে বৃথাই সে যুঝেছে! রক্তে পুরুষের পর পুরুষ ধরে জমা হচ্ছিল য়্যালকোহলের বিষ—সেই বিষের ক্রিয়া আজ দেখা দিলে। কিন্তু এখন তো মাতাল নয়, তবে যদি উপোসে মাতাল হয়ে থাকে। না, না, তার মা-বাপের নেশাই বুঝি যথেষ্ট। ভয়ে কাঁটা দিয়েছে চুল, তার শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিবাদ করে উঠেছে, তবু তো মন আনন্দে দ্রুত স্পন্দিত। এতদিনের পিপাসা তৃপ্ত হল। তারই পাশব আনন্দে মত্ত মন। আর গর্ব—শক্তিশালীর গর্ব। হঠাৎ মনে ঝলক দিয়ে গেল সেই তরুণ সিপাহীর গলা কাটার দৃশ্য। ছোট ছেলেটা ছুরি বসিয়ে দিলে! এবার তো সেও খুন করলে! সেও খুনি!

ক্যাথেরিন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল, আই ভগমান ও মরে গেল!

এতিয়েঁ নির্দয়, নিষ্ঠুর। শুধালে, দুঃখ হলো বুঝি?

ক্যাথেরিন বোবা হয়ে গেছে, যেন কি সব বলে গেল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে,

মোরেও খুন কর। মোরা দু'জনে একসাথে মরে যাই!

আঁকড়ে ধরে আছে এতিয়েংকে, গলা ধরে ঝুলছে। এতিয়েংও তাকে জড়িয়ে ধরলো, দুজনেরই আশা—ওরা এমনি করেই মরে যাবে। কিন্তু মরণ তো দ্রুত এলো না। বাহুবন্ধন খসে পড়ল। চোখ দুটো ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল ক্যাথেরিন, এতিয়েং হতভাগ্যকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢালু জায়গাটা দিয়ে গড়িয়ে দিলে। সংকীর্ণ এ ঠাঁই, এখানে ও লাশটার জায়গা হবে না। ওদের এখনো এখানে বেঁচে থাকতে হবে। ঐ লাশটাকে নিয়ে বাঁচা তো অসম্ভব। লাশটা ফেনার সাগরে ছিটকে পড়ল। শব্দ উঠল। ছড়িয়ে পড়ল ফেনা। গহ্বরে এরই মধ্যে জল ছাপিয়ে উঠছে তাহলে? ওরা দেখলে, এবার জল এসে ঢুকছে কাঁথিতে।

আবার নতুন করে লড়াই শুরু হয়ে গেল। শেষ বাতিটা জ্বালিয়ে নিলে। বাতির তেল পুড়ে-পুড়ে চলেছে, ওরা দেখছে জল বাড়ছে ধীর নিষ্ঠুর গতিতে। প্রথমে পায়ের পাতা ভিজে উঠল, তার পরে হাঁটু। উপরে উঠে গেছে চানক, ওরা গিয়ে শেষ প্রান্তে দাঁড়ালে। তবু ক'ঘণ্টা সময় মিলবে। কিন্তু জলস্রোত ওদের ধরে ফেললে। এবার কোমর অবধি জল। পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ওরা দেখছে। জল বাড়ছে তো বাড়ছেই। মুখ-অবধি যখন উঠবে জল, তখন তো সব শেষ। বাতিটা ওরা ঝুলিয়ে রাখলে। ছোট ছোট ঢেউয়ের উপরে হলদে আলোর ছোপ। আসছে বন্যা এগিয়ে, আর হলদে ঢেউ আসছে নাচতে-নাচতে। আলো এবার কমজোরি হয়ে এল। এখন শুধু আঁচ করা যায়, এক দ্রুত সংকীর্ণায়মান অর্ধবৃত্ত—অন্ধকার আর জলধারা তারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। আলোটা শেষবারের মতো জ্বলে উঠে হঠাৎ নিবে গেল। এবার ঘিরে এল অন্ধকার। এখন পূর্ণ রাত্রি, নিরন্ধ্র রাত্রি, মাটির উপরে নেমে এসেছে ঘন রাত্রি। এখানে ওরা ঘুমিয়ে পড়বে। আর তো দিনের আলো দেখবে না।

চাপা স্বরে এতিয়েং বলে উঠল, এবার তো নরক গুলজার!

ক্যাথেরিন আরো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ যে ছায়ার সার, ওরা বুঝি ওকে ছিনিয়ে নেবে। সে খনির মজুরদের কুসংস্কারেরই ধুয়ো তুললে ফিসফিসিয়ে।

মরণ বাতি নিবিয়ে দিলে গো!

নিয়তির মুখোমুখি ওরা, তবু প্রকৃতিগত লড়াই তো থামে নি। বাঁচার ইচ্ছে তাদের যোগাচ্ছে প্রেরণা। বাতির আঙটা দিয়ে সে পাথরের গর্ত খুঁড়তে লেগে গেল, নখ দিয়ে আঁচড়ে যতটুকু পারলে সাহায্য করলে ক্যাথেরিন। এবার একটা উঁচু ধাপ তৈরি হয়েছে চানকে। দুজনেই তার উপর উঠে পড়ল। পা ঝুলিয়ে বসেছে, কুঁজো হয়ে। বরফ-গলা জল এখন ওদের পায়ে এসে লাগছে। এবার পাতা ভিজল, তার পরে হাঁটু। অবশ্যম্ভাবী গতি জলের স্রোতের—সন্ধি সে করবে না। ধাপটা মসৃণ নয়, এবড়ো খেবড়ো; ভেজা, পিছল —শক্ত করে ধরে আছে—কখন পিছলে পড়ে কে জানে! সে তো হবে সমাপ্তি। আর কি আশা! এই ছোট্ট খোঁড়লে কি করে ওরা থাকবে। এখানে তো নড়া-চড়ার উপায় নেই। তাছাড়া ওরা ক্লান্ত, উপবাসী—ওদের খাবার নেই, আলো নেই—কিছু নেই। অন্ধকারে তো আরো কষ্ট—মরণ আসছে, কিন্তু তার

আগমন তো ওরা জানতে পারছে না। গভীর নীরবতা। খনি এখন জলে টৈটম্বুর, স্পন্দনহীন। ওদের পায়ের নিচে এখন শুধু সাগরের অনুভূতি ফুলে উঠছে নিঃশব্দ তরঙ্গে—তরঙ্গ ছুটে আসছে কাঁথির পর কাঁথি থেকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। তেমনি অন্ধকার। সময়ের হিসেব নেই। হিসেব রাখতে ভুলে গেছে, তালগোল পাকিয়ে গেছে। মুহূর্ত তো এখন আর ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে চলে না, নির্যাতনের তাগিদে এখন তাদের গতি দ্রুত। দুদিন আর এক রাত বুঝি কেটে গেছে এই ওদের ধারণা। কিন্তু আসলে পুরো তিন দিন গত হয়ে এল বলে। আর উদ্ধারেরও কোন আশা নেই। কেউ তো জানে না, তারা এখানে আছে। কেউ এদিকে আসতেও বুঝি পারবে না। বন্যার জল যদি বা অরাজী হয়, উপোসে উপোসেই ওরা শেষ হয়ে যাবে। শেষবারের মতো ওরা সংকেত জানাবে। কিন্তু পাথরখানা তো জলে ডুবে গেছে। আর তাছাড়া শুনবেই বা কে?

ক্যাথেরিন হতাশ। মাথাটা দেয়ালে এলিয়ে দিয়ে বসে আছে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে বললে, ঐ শোন!

এতিয়েঁ প্রথমে ভাবলে, ও বুঝি জলের শব্দ শুনতে বলছে। তাই সে মিথ্যা বলে ওকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলে,

না, না, আমি পা দোলাচ্ছি। ও জলের শব্দ নয়।

না, না, তা বলি নি। ঐ শোন—ওপাশে—

কয়লার স্তরে কান পেতে রইল ক্যাথেরিন। এতিয়েঁও বুঝলে। সেও তাই করলে। কয়েক মুহূর্ত ওরা রুদ্ধ-নিঃশ্বাস। তারপরে টোকা শুনতে পেলে। একটার পর একটা নয়। এক-একটার পরে দীর্ঘ বিরতি। বড় মৃদু সুদূরাগত শব্দ। কিন্তু তবু তো বিশ্বাস হতে চায় না—কানে বাজছে শব্দ। নয় তো কয়লার চানকে চিড় ধরেছে। ওরা ভেবে পেল না, কি দিয়ে জবাব দিবে।

এতিয়েঁর মাথায় ফন্দি এল।

আমার জুতো জোড়া আছে না তোমার পায়ে! খুলে গোড়ালি দিয়ে ঘা মারো।

ক্যাথেরিন তাই করলে। খনির মজুরদের নিজস্ব সংকেত টোকায় টোকায় ঝরে পড়লো। ওরা কান পেতে রইল। আবার সেই তিনটি দূরাগত শব্দ। বারবার টোকা দেয়, বারবার জবাব আসে। কেঁদে ফেললে দুজনে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলে। পড়েই যাবে বুঝি। অবশেষে সাথীদের হদিস মিলল—ওরা আসছে। আনন্দে ওরা বিহ্বল, প্রেমে ওরা পাগল—তাই তো দীর্ঘ প্রতীক্ষার কষ্ট ভুলে গেল, ভুলে গেল ব্যর্থ সংকেতের হতাশা। মনে হ'ল, শুধু বুঝি আঙুল দিয়ে খসিয়ে দিলেই হবে দেয়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা বেরিয়ে পড়বে।

ক্যাথেরিন আনন্দে দিশেহারা। খলখলিয়ে হেসে উঠলো খুশিতে, দ্যালে ঠ্যাস দিনু বলে তো করাত খুললো। এতিয়েঁ বললে, হ্যাঁ, জোর কান যে তোমার।

এবার থেকে পালা করে শোনা আর জবাব দেওয়া চলল। একজন না একজন কান পেতে আছেই, একটু সংকেত পেলেই জবাব দেবার জন্যে সে তৈরী। গাঁতির শব্দ এসে কানে বাজছে। কাঁথি কেটে পথ তৈরী হচ্ছে, ওরা

এগিয়ে আসছে। প্রতিটি শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। একে অপরকে ভুলিয়ে রাখবার বৃথা চেষ্টা করছে; হতাশা জুড়ে বসছে মনে। দীর্ঘ আলোচনা শুরু হ'ল প্রথমেই; রিকুইলারের দিক থেকেই সাথী এগিয়ে আসছে। কাঁথিটা ওখানে একেবারে চানকে গিয়ে মিশেছে। হয়তো কয়েকটা কাঁথি কাটা চলছে। তিনখানা গাঁইতির শব্দ তো শোনা গেল। দীর্ঘ আলোচনা এবার মন্দীভূত, তারপরে নীরবতা। এবার মনে মনে চলছে আলোচনা। খতিয়ে দেখছে, একজন মজুর ক'দিন কাটলে অতবড় দেয়ালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে পারে। সময়মতো কি আর ওরা পারবে—তার আগেই তো ওরা বিশবার মরে যাবে। মন উদ্বেগে আকুল, তাই মুখে কথা নেই। শুধু জুতোর গোড়ালী দিয়ে সংকেতের জবাব দিয়ে চলেছে। আশা নেই। এ যেন স্বভাবের খোদ্‌কারী তাগিদ,—সাথীদের জাগাতে হবে এখনো তারা বেঁচে আছে।

এমনি করে একদিন গেল, দুদিন গেল। মাটির নীচে ছ'দিন কেটে গেল। জল হাঁটু অবধি এসে গেছে—আর বাড়েও না, কমেও না। ঠান্ডা জলে পা দু'খানি অবশ—মনে হয় যেন গলে গেছে। পা তুলে নিতেও পারে, কিন্তু কতক্ষণ অমন অস্বাভাবিক ভাবে থাকবে। পায়ে তো খিল ধরবে। তাই ওরা তুলে নিয়েই আবার ঝুলিয়ে দিচ্ছে। দশ মিনিট অন্তরই পিছল পাথরের উপর সামলে বসতে হচ্ছে। এবড়ো—খেবড়ো কয়লার দেয়াল পিঠে ফুঁড়ে দিচ্ছে; তাছাড়া এখানে ছাদ নীচু, তাই মাথা নুইয়ে থেকে-থেকে শিরদাঁড়া একেবারে বেঁকে গেল। আবহাওয়া ক্রমাগতই অসহ্য হয়ে উঠলো। দম বন্ধ হবার যোগাড়। জলের তোড়ে হাওয়া একটা গোলাকার বলে পরিণত, আর সেই আবহাওয়ায় ওরা এখন বন্দী। কথা বললে, সংক্ষুব্ধ শব্দ ওঠে—যেন দূর বহুদূর থেকে ভেসে আসে। মগজেও পাগলা ঘণ্টী বেজে উঠছে, বুঝিবা একপাল জন্তু শীলাবৃষ্টির মধ্যে চলছে ঊর্ধ্বশ্বাসে অবিরাম ছুটে।

প্রথমে খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল ক্যাথেরিন। বার বার চেপে ধরছিল বুকখানা—নিশ্বাস গোঙানি হয়ে ঝরছিল। পাকস্থলী যেন কে সাঁড়াশি দিয়ে বার করছিল টেনে। এতিয়েঁরও সেই একই যন্ত্রণা। সে খ্যাপার মতো হাতড়াতে লাগল অন্ধকারে। শেষে একখানা পচা কাঠ পেল, হাত দিতেই কাঠখানা ভেঙে দুখানা হয়ে গেল। ক্যাথেরিনকে সে একটা টুকরো দিলে। ক্যাথেরিন লোভীর মতো গিলে খেলে সেই কাঠ। দুদিন ঐ পচা কাঠ-কুটরো খেয়ে কেটে গেল। সবখানিই খেল, তাদের ঐ খাবার ফুরিয়ে যেতে আবার এল হতাশা। আরো কাঠের খোঁজ পড়ে গেল। কিন্তু সেগুলো তখনো মজবুত—তাদের আঁশে আঁশে তখনো প্রতিরোধ শক্তি। জ্বালা বাড়ছে। নিজেদের পোষাকের কাপড় চিবুতে পারছে না বলে ওরা খেপে গেছে। এতিয়েঁর কোমরে ছিল একটা চামড়ার পেটি। সেই পেটিটা ওদের খানিকটা স্বস্তি দিলে। কামড়ে কামড়ে এতিয়েঁ টুকরো টুকরো করে ফেললে কোমর-বন্ধটা। তারপর সেই টুকরোগুলো চিবুতে লাগল ক্যাথেরিন। কোনরকমে গিলেও ফেললে। চোয়ালের কাজ তো চলতে লাগল, ওরা খাবার না পাক—খাওয়ার মোহে, চিবুবার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। কোমরবন্ধটাও যখন শেষ হয়ে গেল, এবার কাপড় নিয়ে পড়ল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চুষতে আর চিবুতে লাগল কাপড়।

শীগ্গীরই ক্ষুধার এ উন্মাদনা থিতিয়ে এল। এখন তো বুভুক্ষা এক গভীর ব্যথা মাত্র। ভোঁতা হয়ে গেছে তার ধার, শুধু একটা মৃদু অনুভূতি। ওদের শক্তি নিঃশেষে চুইয়ে নিচ্ছে। ওরা হয়তো অনেক আগেই মরতো, কিন্তু যত খুশি জল খেয়ে-খেয়ে এখনো বেঁচে আছে। শুধু ঝুঁকে পড়লেই হ'ল, তারপর আঁজলা ভরে তোল জল, পান কর। ওরা বারবার তাই করলে। পিপাসায় যেন গলা শুকিয়ে যাচ্ছে—এই বিরাট জলস্রোত পান করলেও বুঝি সে তৃষ্ণা মিটবে না।

সাত দিনের দিন ঝুঁকে পড়ে জল খেতে যাবে, এমন সময় ক্যাথেরিনের হাতে কি-একটা ঠেকল। একটা কি সুমুখ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

সে বললে, দেখ, দেখ! কি একটা ভাসছে?

এতিয়েঁ অন্ধকারে অনুভব করলে।

কি জানি ঠাহর পাচ্ছি না। মনে হয় একটা কোনো দরজা।

জল পান করলে ক্যাথি, কিন্তু আবার হাতে ঠেকল। সে তীব্র চিৎকারে ফেটে পড়ল,

আয় বাপ, ঐ-ঐ!

কে?

উই মরদটা! ওর গোঁফ হাতে লাগল।

সাভালের লাশটা আবার জলের তোড়ে ঢালু জায়গাটা দিয়ে ভেসে এসেছে ওদের কাছে। এতিয়েঁ হাত বাড়িয়ে গোঁফ জোড়া ঠাহর পেল, থেঁতলানো নাকও মালুম হয়। ভয়ে ঘৃণায় সে কাঁপছে। মাথা ঘুরছে ক্যাথেরিনের, সে মুখের জল উগরে দিলে। তার মনে হ'ল, সে রক্ত পান করেছে। তার সুমুখে গভীর জলরাশি যেন ওরই রক্ত—ঐ মরদটার রক্ত।

এতিয়েঁ বলে উঠল, এক মিনিট সবুর কর, ওটাকে ঠেলে দিই।

লাশটায় লাথি মেরে সরিয়ে দিলে। ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু শীগ্গীরই আবার ওদের পায়ে এসে ঠেকল।

দোহাই তোর, ভাগ্—ভাগ!

তিন-তিনবার এমনি হ'ল। ঠেলে দেয়, আর স্রোতে পায়ের উপর এসে আছড়ে পড়ে। এতিয়েঁ এবার আর লাথি মেরে সরিয়ে দিলে না। সাভাল যাবে না; সে ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে; এযে ভয়ংকর সাথী; তার পচা গন্ধে হাওয়া যে বিষাক্ত করে দিল। সারাদিন ওরা জল পান করলে না। তৃষ্ণার বিরুদ্ধে শুরু হ'ল সংগ্রাম। মরবে সেও ভাল, তবু জল খাবে না। কিন্তু পরদিন তাদের তৃষ্ণারই জয় হ'ল। লাশটা ঠেলে দিলে বারবার আর আঁজলা পুরে জল পান করলে। ঠেলে দেয়, আর গণ্ডুষ গণ্ডুষ জল খায়। ও যদি একগুঁয়ের মতো বারবার ওদের মাঝখানে এসে দেখাই দেবে, যদি ঈর্ষাই ছড়াবে, তাহলে ওকে খুন করতেই বা গেল কেন? মৃত্যুতেও তার শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই! ওদের মিলনের পথে সে তো এখনো বাধা হয়েই আছে। আর শেষ পর্যন্ত তা থাকবেও।

একদিন কেটে গেল। আবার আর এক দিন। ছোট ছোট ঢেউ ফণা তুলে ধেয়ে আসে আর এতিয়েঁ যাকে সে খুন করেছে, তারই স্পর্শ অনুভব করে।

শুধু একটু স্পর্শমাত্র। কিন্তু সে যে আছে সেকথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিবার স্পর্শে সে শিউরিয়ে ওঠে। তাকে সে দিবারাত্র দেখে চোখের সামনে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে মুখ, পচে বিবর্ণ হয়ে গেছে—থেঁতলানো মুখে তবু এখনো আছে লালচে গোঁফ জোড়া। এবার স্মৃতিও ছলনা শুরু করে দিলে। হয় তো ও তাকে খুন করতে পারেনি। সাভাল সাঁতরে বেড়াচ্ছে, এখুনি বুঝি এসে কামড়ে দেবে। ক্যাথেরিন তো এখন কেঁদেই কাটায়। কাঁদে আর কাঁদে, তারপরে যেন হতচেতন হয়ে পড়ে। শেষের দিকে তো শুধু ঝিমিয়ে কাটাচ্ছে। এ তন্দ্রা তো অবশ্যম্ভাবী। মাঝেমাঝে ওকে জাগিয়ে দেয়, কিন্তু ও শুধু দু-চারটে অসংলগ্ন কথা বলে, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। একটি বার চোখও খোলে না। ও যাতে জলে পড়ে না যায়, তাই ও একখানা হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে থাকে। সংকেতধ্বনি এগিয়ে আসছে কাছে, ঠিক পিছনে এসে হাজির—তার জবাব দেয় এতিয়েঁ একা। কিন্তু তারও তাকত শেষ হয়ে এসেছে, আর টোকা মারতে ইচ্ছে করে না। সে শক্তিও বুঝি আর নেই। ওরা যে এখানে আছে, একথা তো সাথীরা জানে; তাহলে শুধু শুধু হয়রানি হয়ে লাভ কি? ওরা আসুক-না-আসুক তাতেও তার কিছু আসে যায় না। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় সে হতচেতন; কেন যে প্রতীক্ষা করছে তাই-ই ভুলে গেছে।

তবু একটা স্বস্তি; জল কমে গেছে—সাভালের লাশটাও গেছে সরে। ন'দিন ধরে চলছে তাদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা। তারা নিজেরাও আজ এই প্রথম কাঁথির ভিতরে কয়েক পা এগিয়ে চলল। এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে লুটিয়ে পড়ল ওরা। একে অপরকে খুঁজতে লাগল—পাগলের মতো জড়িয়েও ধরল। কি ব্যাপার জানলে না, বুঝলে না—শুধু বার বার মনে হ'ল—আবার শুরু হয়েছে বিপর্যয়। আর তো কোন সাড়া শব্দ নেই, গাঁইতির ঘাও থেমে গেছে।

দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি বসে রইল। হঠাৎ চাপা হাসির শব্দ। ক্যাথেরিন হাসছে।

বাইরেটা এখন দিব্যি সোন্দর। এস না মোরা হোথা চলে যাই।

এতিয়েঁ বুঝতে পারল, এ প্রলাপ। প্রলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এযে ছোঁয়াচে রোগ, তার সুস্থ মাথাটাও কেমন ঘুরে গেছে, বাস্তবের চেতনা হারিয়ে ফেলছে। যেন এলোমেলো হয়ে গেছে সব। ক্যাথেরিনের তো আরো বেশি। জ্বরের ঘোরে কাঁপছে মেয়ে, আবোল-তাবোল বকছে, আকুলি-বিকুলি করছে। সে ছুটে বাইরে যেতে চায়। সেই বুঝি তার স্বস্তি। তার মগজে এখন নদীর কলকল্লোল, পাখীর গুঞ্জন উঠছে; দলিত তৃণের উগ্র গন্ধে ভরে গেছে নাক; চোখের সুমুখে দুলছে হরিদ্রাভ বন্যা। ক্যাথেরিনের মনে হচ্ছে, ও বেরিয়ে এসেছে ঘর ছেড়ে বাইরে, খালধারে; গ্রীষ্মের পরম রমণীয় দিনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রান্তরে।

এখানে বড় গরম না? মোরে লাওনা লাগর, মোরা তো একসাথে থাকব—থাকব।

এতিয়েঁ তাকে জড়িয়ে ধরল। ওর দেহে গা এলিয়ে দিয়ে বসে রইল ক্যাথি, আনন্দে উচ্ছল শিশুর মতোই কথা বলে চলেছে,

দেখ তো কি বোকামিটাই মোরা কন্নু! এদ্দিন সবুর করে করে হেদিয়ে গেনু গো! তোমাকে দেখেই তো মোর রঙ লেগেছিল, তুমি তো বুঝলে না,

গোমড়া হয়ে রইলে। মোদের ঘরে সেই রাতগুলোর কথা মনে পড়ে? নিদ তো আসে না পোড়া চোখে—শুধু নাক বার করে থাকি—আর শুনি—কার নিশ্বেস পড়ল গো! আর এ ওর জন্যি ছটফট করে মরি।

ক্যাথেরিনের উচ্ছলতা ছোঁয়াচে। এতিয়েঁও সংক্রামিত হ'ল। ওদের না-বলা প্রেমের স্মৃতি নিয়ে চলছে রঙ্গ—রোমন্থন।

তুমি তো আমাকে চড় মেরে বসেছিলে। মারনি গা? দু'গালে দুই য়্যায়সা চড়!

অস্ফুট স্বরে ক্যাথেরিন বললে, রং ধরেছে বলেই তো চড়-চাপড় দিনু। আশনাইয়ে যে তখন মন ভরা। তবু মনকে বলি—তোমার কথা আর ভাবব নি। তোমার সাথে মোর সব চুকে বুকে গেছে। তবু জানতাম, একদিন মোদের মিল হবেই। বরাতটা একটু যদি ভাল হয়, তখন আর কে ঠেকাবে। তাই না গো?

...এতিয়েঁ ভয়ে কেঁপে উঠল। এ স্বপ্ন থেকে তো ওকে জাগিয়ে তুলতে হবে, নিজেকে মুক্ত করতে হবে। সে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলে স্বপ্ন। আস্তে আস্তে বললে,

কিছুই তো ফুরোয় নি। তুমি চাঙ্গা হয়ে ওঠ, দেখবে আবার সব ফিরে পাবে।

তাহলে মোরে তুমি রাখতে চাও, আর তো মোদের ছাড়াছাড়ি হবে নি? মূর্চ্ছায় যেন এলিয়ে পড়ল ক্যাঁথি। বড় দুর্বল, ক্ষীণ স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভয়ে তাকে বুকের উপর তুলে নিলে এতিয়েঁ।

কি হয়েছে? অসুখ?

অবাক হয়ে ক্যাথেরিন বললে,

না গো, না। ওকথা শুধালে কেনে?

স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল ক্যাথেরিন। অন্ধকারে চারিদিকে তাকাচ্ছে, হাত মোচড়াচ্ছে। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল,

ওমা, মা গো—একি ঘুরঘুট্টি আঁধার গো!

আর তো সে প্রান্তরের স্বপ্ন নেই, নেই সুগন্ধি তৃণের ঘ্রাণ, চাতকের গান আর সেই সোনালী রোদ। সে আবার ফিরে এসেছে বন্যাপ্লাবিত পিটে—পূতিগন্ধ অন্ধকারে। এখানে শুধু টুপটাপ করে ঝরে জল—বিষণ্ণতা বেজে বেজে ওঠে গহ্বরের অন্ধকারে। আর দিনের পর দিন ধরে ওরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে এখানে। ক্যাথেরিনের মোহ যেন এই গহ্বরকে আরো ভয়াল করে তুলেছে; সে চলে গেছে তার ছেলেবেলায়। খনির গভীরে দেখছে সেই কাল-পুরুষকে। যেসব কুলি-কামিন নষ্ট হয়ে যায়, তাদের ঘাড় মটকে দিতে ওতো কবরখানা থেকে উঠে উঠে আসে।

ঐ শোন! শুনছ?

না তো।

হ্যাঁ, ঠিক বনু গো—ঐ সেই কালপুরুষ। দ্যাখ না—ধেয়ে এল যে! মাটির মা, তার শিরা দিলে কেটে, তার শোধ তো তুলবে। দেখ না, কেমন ফিনিক দিয়ে ছুটছে গো! আর ঐ তো কালপুরুষ—দেখছ না? রাতের চেয়েও কালো। মোর বড় ডর করে, বড় ডর করে।

চুপ করে গেল। ভয়ে কাঁপছে। তার পর অস্ফুট স্বরে বললে,

না গো, না। ও সেই—

কার কথা বলছ ?

ঐ যে মোদের পেছু নিয়েছে। ঐ যে মড়াটা।

সাভালের আত্মা যেন ওকে ভর করে আছে, শুধু তার কথাই বলছে। অসংলগ্ন কথার তোড় বয়ে চলেছে! ওর সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের জীবন সে কাটিয়েছে। শুধু জাঁ-বার্তের সেই দিনটায়ই যা একটু ভাল ব্যবহার পেয়েছিল। আর আর দিনগুলো তো ভয়ংকর। সোহাগের পরেই আসতো কিল-ঘুষির পালা। মেরে আধমরা করে তারপর জড়িয়ে ধরে করতো সোহাগ। সোহাগেও সে আধমরা হয়ে যেত।

ঐ যে ও আসছে। সাঁচ বলছি ও আসবে, মোদের দুটিকে একসাথে থাকতে দেবে না। ও যে বড় হিংসুটে। ওকে তাড়িয়ে দাও নাগর, শক্ত করে ধর—মোরে ছিনিয়ে না নে যায়। হঠাৎ উদ্বেল হয়ে ক্যাথেরিন ওর গলা জড়িয়ে ধরল, মুখ তুলে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মুখ, তারপর উন্মাদের মতো নিজের মুখখানা তার মুখের উপর চেপে ধরল। অন্ধকার হঠাৎ আলো হয়ে গেল, ক্যাথেরিন বুঝি দেখতে পেলে সূর্য। হেসে উঠল প্রেমময়ী নারী। স্নিগ্ধ প্রেমের হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। তার অর্ধনগ্ন তনুখানির আভাস পাচ্ছে ছেঁড়া পোষাকের ভিতর দিয়ে—নিজের দেহখানি আনন্দ লিপ্সায় কেঁপে কেঁপে উঠল। আবার জেগে উঠল তার উর্বরতা—তার পুরুষত্ব। ওদের বিবাহের রাত্রি এল এই সমাধি মন্দিরে, এই পঙ্কের শয্যায়। আনন্দের আস্বাদ না পেয়ে, পরিতৃপ্ত না হয়ে ওরা তো মরবে না—মরতে পারবে না। ওরা মুহূর্তের জন্য বেঁচে উঠবে। অন্তিম মুহূর্তে পাবে জীবনের সন্ধান। মৃত্যুর অন্ধকারে ওরা উন্মাদের মতো পরস্পরকে ভালবাসবে।

তারপর তো আর কিছু রইল না, উপসংহারও না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই কোণে বসে রইল এতিয়েং; ক্যাথেরিন তেমনি এলিয়ে পড়ে আছে ওর হাঁটুতে মাথা দিয়ে। বুঝি বা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু নাকে হাত দিতেই চমকে উঠল এতিয়েং। গা তো নয়, হিম যেন পাথর। মৃত। কিন্তু তবু একটু নড়তে-চড়তেও পারছে না, কি জানি যদি ওর ঘুম ভেঙে যায়। ভাবাবেগে উদ্বেল এতিয়েং; সে-ই তো প্রথম পুরুষ যে ওর নারীত্বের আস্বাদ পেলে। ও তো এখন গর্ভের গহ্বরে তার সন্তানের বীজ ধারণ করতে পারবে। আরো ভাবনা এসে জুড়ে বসলো মনে—আবছা ভাবনা—শুধু ভ্রূর উপরে পড়ল তাদের ছোঁয়া —এ যেন ঘুমের স্পর্শ। ওর সঙ্গে সে এই মৃত্যুপুরী থেকে চলে যাবে—তারপরে কত কি করবে। আহা সে কেমন হবে ভাব তো! দুর্বল হয়ে পড়ছে এতিয়েং, এখন ধীরে ধীরে হাত-পা নাড়তে পারে। হাতড়ে দেখলে ক্যাথেরিন এখনো তারই পাশে আছে। সে নিশ্চিন্ত হ'ল। যেন ঘুমন্ত শিশু—কিন্তু কেমন যেন ঠাণ্ডা, শক্ত। সব কিছুই তাহলে শেষ! ডুবে গেল, উড়ে পুড়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল। এখন তো তার আর অস্তিত্ব রইল না—সে তো অসীম বিস্তারের ঊর্ধ্বে, সে তো এখন কালের অতীত কিন্তু তবু মগজে এসে বাজছে টোকা—আবার জোরালো হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু তবু বড় ক্লান্ত, জবাব দেবার ইচ্ছেও নেই। এখন তো আর চেতনা নেই। শুধু স্বপ্ন দেখছে, ক্যাথি চলেছে তার আগে আগে—আর সে কান পেতে শুনছে তার গোড়তোলা জুতোর

হাল্‌কা খুটখুট আওয়াজ। দু'দিন এমনিভাবেই কেটে গেল। কিন্তু ক্যাথেরিন তো তবু জেগে উঠল না। তবু এতিয়েং তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ও তার কাছে আছে, এতেই সে নিশ্চিন্ত।

এক প্রচণ্ড আঘাত এসে যেন পড়ল দেহে, অনুভূত হ'ল আলোড়ন। বিভিন্ন-স্বর বেজে উঠছে, পাথর পড়ছে খসে খসে। তার পরে বাতির আলো। এতিয়েং কেঁদে ফেললে। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল প্রথমে, কিন্তু ঐ লাল শিখাটির দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আলো অতি ক্ষীণ, অন্ধকার দূর হয়নি। এখনো যেন জমাট বেঁধে আছে। ওর সাথীরা এসে ওকে ধরাধরি করে নিয়ে চলল, কয়েক চামচে সুরুয়া ঢেলে দিলে তার দাঁতকপাটি লাগা মুখে। রিকুইলার কাঁথিতে এসে সে তার সুমুখে দাঁড়ানো লোকটাকে ঠাহর পেলে। ইঞ্জিনিয়ার নিগ্রেল। তারা পরস্পরকে করেছে ঘৃণা—একজন উদ্ধত মজুর আর একজন ব্যঙ্গময় সন্দিগ্ধ মালিক। কিন্তু আজ একি হ'ল? দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনের বুকে—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওদের হৃদয়ের মানবতা বুঝি আজ তুফান তুলেছে—তাইতো ওরা ভাবাবেগে উদ্বেল। ওদের বিরাট দুঃখের ভারে বুঝি মিশে আছে যুগ-যুগান্তের দুর্দশা। মানুষের জীবনে তার তো সীমা-পরিসীমা নেই।

উপরে মেয়ু-বৌ তার মৃত ক্যাথেরিনের পাশে আছড়ে পড়ে কাঁদছে। অঝোরে ঝরছে কান্না—বিরামহীন কান্না—গোঙানি। আরো কয়েকটা লাশ এরই মধ্যে তুলে এনে সার দিয়ে রাখা হয়েছে মাটিতে। সাভালও আছে তাদের মধ্যে। সবাই ভেবেছে, ধস চাপা পড়ে ও মারা গেছে, একজন খালাসী আর একজন মালকাটাও পিষে গেছে। ওদের মাথার খুলি ভাঙা--মগজ নেই। আর পেট জলে ঢোল হয়ে আছে। ভিড়ে মেয়েরা যেন ক্ষেপে গেছে। ঘাগরা ছিঁড়ছে, নখ দিয়ে মুখ আঁচড়াচ্ছে। এতিয়েংকে উপরে আনা হ'ল। এখন সে আলোয় অভ্যস্ত; কিছু খাওয়ানো হ'ল তাকে। তার গায়ে যেন আর মাংস নেই, শুধু হাড়; চুল সব সাদা হয়ে গেছে। তাকে দেখে সবাই কেঁপে উঠল, মুখ ফিরিয়ে নিলে। মেয়ু-বৌও স্তব্ধ হয়ে বড় বড় চোখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

ছয়

ভোর চারটে। এপ্রিলের শীতল রাতের পরে উষ্ণ দিন আসন্ন হয়ে এল। নির্মেঘ আকাশে তারারা নিবুনিবু। পূব আকাশ ঊষার রক্তরাগে লাল। ঘুমন্ত কালো কয়লার দেশে প্রাণের অস্পষ্ট স্পন্দন। আবার নতুন জীবনে, নতুন দিনে তারা জেগে উঠবে—তারই মৃদু সাড়া।

এতিয়েং ভান্দাম রোড ধরে চলেছে লম্বা পা ফেলে। ছ' সপ্তাহ তার মঁতসুতে কেটেছে হাসপাতালের বিছানায়। এখনো ফ্যাকাশে তার মুখ, আর কাহিলও খুব, তবু একটু জোর পাচ্ছে শরীরে। তাই হেঁটেই চলেছে। কোম্পানি এখনো তার পিটের নিরাপত্তার জন্য থরহরি কম্পমান। পরপর বরখাস্ত করেই চলেছে। তাকেও নোটিস দেওয়া হয়েছে, আর তাকে রাখা চলবে

না। তার সঙ্গে আছে একশো ফ্রাঙ্ক। বৃত্তির মঞ্জুরি। পিতৃসুলভ বাৎসল্য-রসে জড়ানো পরামর্শও আছে! খনির কাজ সে ছেড়ে দিক; তার শরীরে আর এ ধকল সইবে না। সে একশো ফ্রাঙ্কের বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। এরই মধ্যে প্লুচার্তের কাছ থেকে এসেছে চিঠি—প্যারীতে সে তাকে ডেকেছে রাহা খরচও দিয়েছে। তার সেই পুরানো দিনের স্বপ্ন বুঝি সম্ভব হবে। আগের রাতে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে বোঁ-জ্যোতে বিধবা দেসিরের ওখানে আস্তানা গেড়ে ছিল। উঠেছে আজ খুব ভোরেই। একটা কাজ এখনো বাকি—মার্সিয়েনেয় গিয়ে গাড়ি ধরবার আগে সাথীদের কাছে বিদায় নিতে হবে।

উষার গোলাপী আলোয় সে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। বসন্ত এসেছে, বিশুদ্ধ বায়ু। দিনটি আজ সুন্দর হয়ে উঠবে—তারই সংকেত দেখা দিয়েছে। ক্রমে আলোয় আলো হয়ে উঠছে চারিদিক, পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনধারাও ক্রমে বাড়ছে। সূর্যের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ। আবার চলতে শুরু করল এতিয়েঁ। হাতের লাঠিটা জোরে ঠুকতে ঠুকতে চলল। দূরে প্রান্তরের দিকে তার [illegible] প্রান্তর জেগে উঠছে রাত্রির কুয়াশা থেকে। কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। মেয়ু-বৌ একদিন হাসপাতালে এসেছিল। হয় তো আর আসতে পারে নি। কিন্তু সে জানে, দুশো চল্লিশ নম্বর ধাওড়ার সবাই আবার জাঁ-বার্তে গিয়ে কাজে নেমেছে। এমন কি মেয়ু-বৌও কাজে ভিড়ে গেছে।

ধীরে ধীরে শূন্য পথঘাট ভরে উঠছে মানুষে, খনির মজুরের দল চলেছে তার পাশ দিয়ে, রক্তহীন তাদের মুখ—তারা নীরব। ওরা বলছে, কোম্পানি না কি নিজেদের জয়লাভের সুযোগ নিচ্ছে। আড়াই মাস ধর্মঘটের পর ওরা ফিরে এসেছে পিটে। বুভুক্ষার কাছে ওরা হার স্বীকার করেছে; তাই মেনে নিতে হয়েছে রোলার দাম। এ এক চোরা-গোপ্তা মজুরি কাটার চাল—এখন তো মালিকের এই বৃত্তি আরো ঘৃণ্য বলেই মনে হয়। সাথীদের রক্তে এ তো রাঙা। এক ঘণ্টার মজুরি কাটা গেল। ওরা যে হার মানবে না সে প্রতিজ্ঞাও তো ভেসে গেল; এই মিথ্যা এখন যেন ওদের গলায় বিষ হয়ে আটকে আছে। সব জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গেছে মিরুতে মাদেলিনে, ক্রেভকুরে—ভিক্তরে—সব-জায়গায়। ভোরাই কুয়াশায় ছায়াছন্ন পথে ওরা চলেছে। হেঁট ওদের মাথা, ওরা যেন কষাইখানার পথে খেদিয়ে নিয়ে-যাওয়া জন্তুর পাল। পাতলা পোষাকে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে, হাতে হাত ঘষে গরম করে নিচ্ছে, পাছা দুলিয়ে, কুঁজিয়ে চলেছে। পাইকারিভাবে কাজে ফিরে চলেছে বোবা কালো ছায়ার সার। মুখে হাসি নেই, পাশেও ফিরে তাকাচ্ছে না। তবু ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলে অনুভব করা যায় চোয়াল ওদের ক্রোধে দৃঢ় সংবদ্ধ, হৃদয়ে ওদের অপরিসীম ঘৃণা। ওরা লুটিয়ে পড়েছে উপবাসের তাড়নায়। পেটের তাগিদে ওরা করেছে আত্মসমর্পণ।

পিটের যত কাছে আসছে, তত ওদের সংখ্যা বাড়ছে। কেউ বা একা চলেছে, কেউ বা চলেছে দল বেঁধে। এখুনি ওরা ক্লান্ত, নিজেদের সম্বন্ধে হতাশ। এক বুড়োকে দেখা গেল। চোখ তো নয় জ্বলন্ত আঙরা—ফ্যাকাশে মুখে জ্বলছে। আর এক ছোকরা রাগে গুমরে মরছে—যেন সংক্ষুব্ধ ঝড়। অনেকের হাতেই খনির গোড়তোলা জুতো। পুরু পশমের মোজা পরা পায়ের শব্দ শোনা যায় না। এ স্রোত যেন অনন্ত—চলেছে তো চলেছেই—এক বিধ্বস্ত

বাহিনীর বাধ্যতামূলক যাত্রা যেন। অবনত মস্তকে চলেছে, কিন্তু আছে পুনরায় সংগ্রামের ভয়ংকর সংকল্প—প্রতিশোধের দুর্জয় পণ।

এতিয়েং জাঁ-বার্তে এসে পৌঁছল। ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে খনি। এখনো ভারায় বাঁধা লণ্ঠন জ্বলছে দিনের আলোয়। অন্ধকার বাড়িটা থেকে উঠছে ধোঁয়া। পালকের মতো সাদা ধবধবে ধোঁয়া—কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কারমাইনের (একরকম লাল রঙ) কলঙ্ক। শেডের সিঁড়ি ভেঙে সে উঠে এল রিসিভিং রুমে।

নীচে নামা শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে মানুষ শেড থেকে আসছে। এক মুহূর্ত সে গোলমালের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টব গাড়ি চলেছে ধাতব মেঝেয় ঝঙ্কার তুলে। ড্রাম ঘুরছে, তার গুটিয়ে আনছে, আবার খুলে যাচ্ছে। আর বাজছে চোঙের ভিতর দিয়ে হুকুম। ঘণ্টির ঘণ্টা, আর সাংকেতিক হাতুড়ির আওয়াজ। আবার ঐ দানবটা তার বরাদ্দ নরমেধ গ্রাস করছে। কেজের পর কেজ উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে অতলে। মানুষে [illegible] বোঝাই। অবিরাম গ্রাস করছে ঐ অতৃপ্ত দানব। দুর্ঘটনার [illegible]ক। ওটাকে সে ভয় করে, তার স্নায়ু চঞ্চল হয়ে ওঠে। [illegible]জগুলো নামতে দেখে তার পাকস্থলীতে ওলট-পালট শুরু [illegible] গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিতে হ'ল। আর তো দেখা যায় না।

বিরাট হলঘর। এখনো অন্ধকারের গাম্ভীর্য সেখানে বিস্তৃত। নিবন্ত বাতির আলো। [illegible]টি বন্ধুর মুখও খুঁজে পেলে না। মজুরেরা দাঁড়িয়ে আছে খালি পায়ে[illegible]। হাতে বাতি। ওর দিকে তাকাচ্ছে আর চোখ নামিয়ে নিচ্ছে—কখনো বা [illegible]লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছে। ওকে নিশ্চয়ই তারা চেনে; ওর বিরুদ্ধে ঘৃণাও আর তাদের নেই; বরং এখন ওকে তারা ভয়ই করে। ভীরু বলে গাল দেবে—সেই লজ্জায়ই ওরা মরে যাচ্ছে। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে বুকখানা ব্যথায় দুলে উঠল। সে ভুলে গেল এই হতভাগার দল একদিন তাকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। আবার স্বপ্ন শুরু হয়ে গেল। সে ওদের বীর-নায়কে পরিণত করে দেবে, ওদের চালিয়ে নিয়ে যাবে। সে হবে এই অন্ধ শক্তির নেতা—ওরা তো শক্তি উজাড় করে দিচ্ছে মালিকের পায়ে।

একটা কেজে লোক উঠছে। মিলিয়ে গেল কেজটা। আবার অন্যদল আসছে। এবার ধর্মঘটের একজন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যোগ্য কর্মী, মরবে বলে শপথ করেছিল।

ব্যথাভরা মন, বিড়বিড় করে বললে—তুমিও শেষটায় এলে?

সহকর্মীর মুখ পাঁশুটে, ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠল; তার পরে কৈফিয়ত দিলে,

কি করব বল? মোর ঘরে জরু আছে।

শেড থেকে আবার এল আর-এক নতুন দল। সে তাদের সবাইকেই চিনল। তুমিও! তুমিও! তুমিও!

সবাই অপ্রতিভ, সঙ্কুচিত—ধরা গলায় বলছে,

কি করব সাঙাৎ, ঘরে মা আছে। ঘরে বাচ্চাকাচ্চা। রুটি তো চাই—রুজি তো চাই।

কেজ উঠে আসছে না। ওরা ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে তারই প্রতীক্ষায়।

পরাজয়ে ওরা অভিভূত, তাই কারো চোখের দিকে তাকাবার সাহস নেই। স্যাফট-এর দিকে তাকিয়ে আছে।

এতিয়েঁ শুধালে—আর মেয়ু-বৌ ?

উত্তর নেই। একজন ইশারায় জানালে, সেও আসছে। কেউ বা হতাশ হয়ে মাথা নাড়লে। বলতে চায়—আহা বেচারী! কি ধকলটাই গেল ওর উপর দিয়ে! নিস্তব্ধতা। এবার বিদায় নেবার সময়। এতিয়েঁ হাত-বাড়িয়ে দিলে। সবাই করমর্দন করছে। ওদের নিঃশব্দ হাতের মুঠোয় ফুটে উঠছে পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি—আর বুঝি আছে প্রতিশোধের উদ্দীপ্ত কামনা।

কেজ এবার উঠে এল। ওরা একে একে উঠে পড়ল; গহ্বরের গ্রাসে তলিয়ে গেল।

পিয়েরোঁ এবার এসে হাজির। চামড়ার টুপির সঙ্গে সর্দারের লাঙা বাতিটা ঝোলানো। এক হপ্তা হ'ল সে সর্দার হয়েছে। কুলিরা ওকে দেখলে এখন সরে যায়। পদোন্নতির গর্বে ওর আদব-কায়দায় এখন মালিকানা ফুটে ওঠে। এতিয়েঁকে দেখে ও বিরক্তই হ'ল। কাছে এসে যখন শুনলে, সে চলে যাচ্ছে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তার। বাত্‌চিত্‌ও একটু আধটু না হ'ল এমন নয়। পিয়েরোঁ-বৌ এখন প্রগ্রেস বারের দেখাশুনো করে। ওখানকার ভদ্দর আদমিরা সবারই তার উপর নেকনজর আছে। কথায় ছেদ পড়ল মাঝখানে। বুড়ো মোকেকে একটা বক্তৃতাও ঝাড়লে। সময় মতো সে তার ঘোড়া এনে হাজির করে না—এই তার বিরুদ্ধে নালিশ। বুড়ো মাথা নীচু করে শুনে গেল।

গালাগাল খেয়ে বুড়ো রাগে জ্বলছে। তাই নীচে নামবার আগে এতিয়েঁর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় জোরে চেপে ধরল। তার হাতের স্পর্শে অবদমিত ক্রোধের আবেগ আর তার সঙ্গে আছে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতি। এতিয়েঁ ওর হাতের স্পর্শে অভিভূত হয়ে গেল, কেঁপে উঠল। তার ছেলে মারা গেছে, কিন্তু তার জন্যে এতিয়েঁর উপর তার তো আক্রোশ নেই। সে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখলে, বুড়ো মিলিয়ে যাচ্ছে।

পিয়েরোঁকে এবার সে শুধালে, মেয়ু-বৌ আজ ভোরে আসে নি ?

পিয়েরোঁ যেন বোঝেনি প্রথমে এমনি ভান করলো। মেয়ু-বৌয়ের নাম উচ্চারণ করলেও বরাত খারাপ হবে বলে তার বিশ্বাস। কি-একটা হুকুম দিতে হবে এই অজুহাতে সে সরে পড়ছিল। হঠাৎ কি ভেবে বললে,

কে ? মেয়ু-বৌ ? ঐ তো আসছে।

হ্যাঁ, আসছেই তো! বাতিঘর থেকে বাতি হাতে নিয়ে আসছে। পরনে ট্রাউজার গায়ে কোট, মাথায় টুপি। কোম্পানির এ এক দুর্লভ দাক্ষিণ্য। এই অভাগী স্ত্রীলোকের নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্যে করুণায় তারা বিগলিত—তাই তাকে চল্লিশ বছর বয়সে নিচে নামবার মঞ্জুরি দিয়েছে। আর ওকে দিয়ে এই বয়সে খালাসীর কাজ করানো যায় না। একটা হাতে-ঘোরানো ভেন্টিলেটরে ওকে জুড়ে দিয়েছে। উত্তরের কাঁথিতে বসে ও এখন সেই কলের চাকা ঘোরায়। লা তার্তারেতের জাহান্নমে সে এলাকা। হাওয়া একেবারে নেই। গনগনে গরম সুড়ঙ্গের ভিতরে বসে চাকা ঘোরায়। সেখানে আছে একশো ডিগ্রি তাপ। তার জন্যে মজুরি পায় তিরিশটা সু।

মরদের পোষাকে ওকে দেখে মনটা করুণায় ভরে গেল। বুক আর পেট

কাটিং-এর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ফুলো। অবাক হয়ে গেল এতিয়েঁ। বুঝিয়ে বলতে গেল, সে চলে যাচ্ছে; তার আগে এসেছে বিদায় নিতে। ওর কথা শুনছে না মেয়ু-বৌ, মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অবশেষে আপন জনের মতোই বললে,

তাই না কি গা? মোরে দেখে তাক্ লেগে গেছে? তা সাচ্চা জবান আমার, মোর পেটের ছা যারা খনিতে নামবে, তাদের গলা টিপে মেরে ফেলাব বলে কত শাসানু আর সেই লোকই কিনা এখন পিটে নারছে! নিজের ঘাড় মটকানোই তো উচিত। তা সাঙাৎ, আপনা ঘাড় কি আর আস্ত থাকতো, ঐ বুড়ো হাবড়া আর বাচ্চাকাচ্চার জন্যিই তো এই হাল হ'ল!

চাপা স্বর, ক্লান্ত স্বর। গেয়ে চলেছে দুঃখের পাঁচালী। কৈফিয়ত নেই—শুধু বলে যাচ্ছে নিজের কথা। উপোসে আধমরা হয়ে পড়েছিল, শেষে ও এই ঠিক করলে। ধাওড়া থেকে ওদের সরিয়ে না দেয়, তাই কাজে ভিড়ে গেছে।

বুড়ো কেমন আছে? এতিয়েঁ শুধাল।

বুড়ো তো তেমনি চুপচাপ। কিন্তু মাথাটাত একেবারে গোলমাল হয়ে গেছে। জান, ওকে ওরা দোষী করে নি। পাগলা গারদে পুরতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তো নারাজ। সুরুয়ায় কি এক ফোঁটা ঢেলে দিয়ে ওরা ওকে নিকেশ করে দেবে। কিন্তু মোদের ভোগান্তির আর শেষ নেই—ওরা ওকে ভাতা দেবে না। এক ভদ্দর নোক তো বললে, ওকে ভাতা দেওয়া নাকি পাপ।

জাঁলিন কাজ করছে?

হ্যাঁগো, ভদ্দর নোকেরা ওকে খনির বাইরে কাম দিয়ে দিয়েছে। বিশ সু করে পায়। না নালিশ করব নি, মোর উপরে ওদের খুব দয়া। ছোঁড়াটার বিশ আর মোর তিরিশ—এই তো পঁচাশ হ'ল—ছ-ছটা পেট না থাকলে এতেই চলে যেত। মাই ছেড়েছে এস্তেল, এখন তো সবই গিলছে। আর পোড়া বরাতের কথা বল কেন, লেনোর আর আঁরির এখনো কামে নামতে পুরো পাঁচটি বছর দেরি।

এতিয়েঁ শত চেষ্টা করেও উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারলে না,

কি—ওরাও কামে ভিড়বে?

মেয়ু-বৌয়ের ফ্যাকাশে মুখে রং ধরল, চোখ চকচকে। কাঁধ দুখানা নুয়ে পড়েছে, যেন নিয়তির চাপে ভারাক্রান্ত।

আবার কি করব? আর সবাই যেমন গেছে, ওরাও যাবে। সব্বাই তো কামে গিয়ে লাশ রেখে এল, এবার তো ওদেরও পালা।

কয়েকজন কুলি টবগাড়ি ঠেলে নিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। মেয়ু-বৌ থেমে গেল। কালো ঝুল ভরা জানালার ভিতর দিয়ে দিনের আলো চলকে পড়ছে! ভোরের ধূসর আলোয় রাত্রির আলো আরো নিষ্প্রভ—অনিশ্চিত। প্রতি তিন মিনিট অন্তর ইঞ্জিন ঘস্ ঘস্ শব্দ করে উঠছে, তার খুলে যাচ্ছে। আর কেজ মানুষকে গ্রাস করছে।

এই কুঁড়ের ধাড়িরা, জলদি চল্—জলদি চল্! পিয়েরোঁ চেঁচিয়ে উঠল। উঠে পড়্—উঠে পড়; এমন কুঁড়েমি করলে আজ আর কাম হবে নি, রোজও মিলবে নি!

মেয়ু-বৌয়ের দিকে তাকিয়ে আছে পিয়েরোঁ। কিন্তু সে অনড়।

তিনটে কেজ নেমে গেল। হঠাৎ যেন জেগে উঠল মেয়ু-বৌ, এতিয়েঁর পয়লা কথাটা স্মরণ হ'ল।

তাহলি চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ, আজ সকালেই যাব।

ঠিক কাম করেছ আর কোথা চলে যাও। দেখা হ'ল, খুশি হলাম। তুমি তো জান তোমার ওপর মোর রাগ নেই। এক সময়ে হাতের কাছে পেলে তোমাকে খুন করতাম। ঐ হাঙ্গামার পরে কি আর কান্ডজ্ঞান ছিল! কিন্তু মানুষ তো ভাবে—তাই না? সব-কিছু খতিয়ে দেখা যায়, মানুষের দোষ নেই। না, না, তোমার কি দোষ? মোদের সব্বার দোষে এমনধারা হ'ল।

শান্তভাবে বলে গেল তার পরিবারের মৃত্যুর কথা—তার মরদ, জাচারি, ক্যাথেরিন—সবাই মরল। আলঝিরের নাম উচ্চারণ করতেই চোখ বেয়ে ঝরল জল। আবার সেই আগেকার শান্ত বুদ্ধিমতী গৃহিণী। কান্ডাকান্ড জ্ঞান আছে। সে বললে, এই যে বুর্জোআরা এমন করে গরীব-গুর্বোদের খুন করলে —এতে ওদের ভালাই হবে না। এর জন্যে একদিন না একদিন শাস্তি পাবে। দেনা ওদের চুকিয়ে দিতেই হবে। এর জন্যে কিছু করারও দরকার নেই—সব উড়েপুড়ে ভেঙেচুরে যাবে। ওদের এই সাজানো দুনিয়া কি আর থাকবে! কুলিদের যেমন গুলি করে মারলে সিপাহীরা—তেমনি করে একদিন ওদের মালিকদেরও মারবে। চির দাসত্বে সে আবদ্ধ, ওয়ারিশানসূত্রে প্রাপ্ত তার নিয়মানুবর্তিতা—তারই চাপে সে নুয়ে পড়েছে—তবু তারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বিশ্বাস, গড়ে উঠেছে এই মতবাদ—অবিচার-অত্যাচার চিরদিন থাকে না—যদি আর ভগবান না-ই থাকেন, আর-এক ভগবান জেগে উঠবেন, দলিত-পিষ্ঠ মানুষের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন।

মৃদু তার কথা, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পিয়েরোঁ কাছে আসতেই জোরে বললে, তাহলে চলে যাচ্ছ! ঘরে গিয়ে মালপত্তর গোছগাছ করে নিয়ো। দুটো কামিজ, তিনখানা রুমাল আর দুজোড়া পাজামা আছে।

এতিয়েঁর একটা জিনিসও বাঁধা পড়ে নি। কিন্তু ওগুলো নিয়ে যেতে তার মন সরে না।

না, না, ওগুলো দিয়ে কি হবে! বাচ্চা-কাচ্চাদের কামে লাগবে। প্যারী গিয়ে আমি কিনে-কেটে নোব।

আরো দুটো কেজ নেমে গেল। পিয়েরোঁ এবার ঠিক করলে, ওকে সোজা-সুজি বলবে।

এই শোন, তোমার জন্যি দেরি হচ্ছে। তোমার বাতচিত্ হল?

পিছন ফিরে দাঁড়াল মেয়ু-বৌ। ঐ বেইমানটা এত উৎসাহ কোথায় পেল? কারা নামছে, সেদিকেও তার খেয়াল নেই। তার চানকে যারা কাজ করে, তারা তাকে ঘৃণা করে। মেয়ু-বৌ বাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে গরম, কিন্তু এখানে ঠান্ডা। সে কালিয়ে উঠছে।

আর বলবারও কিছু খুঁজে পেলে না ওরা দু'জনে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। বুক ওদের উদ্বেল। বলতে চাইলে, কিন্তু কথা যে যোগায় না।

শেষে মেয়ু-বৌ কথা বললে, এ যেন বলার জন্যেই বলা।

জান, লেভাক-বৌয়ের আবার পেট হয়েছে। লেভাক তো জেলে, ব্যতেল্পটা ওর জায়গা দখল করে বসেছে।

ওঃ, তাই নাকি !

আর একটা কথা বলিনি ? ফিলোমেন পালিয়েছে।

কোথা পালাল ?

পাস্ দ্য কালের এক কুলির সাথে। ভয়ে তো আমি সারা, বাচ্চা দুটো বুঝি মোর ঘাড়ে পড়ল। যাহোক আপদ গেছে, বাচ্চা দুটোকেও নিয়ে গেছে। ভাব দিকি একবার সাঙাৎ-রক্ত কাশছে, যে কোন দিন পটল তুলবে—আর সেই ছুঁড়ী কি না পালাল !

একটু ভেবে নিয়ে আবার বলতে লাগল,

ওরা তো যত আ-কথা-কুকথা বলে। তোমার মনে পড়ে, ওরা না রটালে তুমি না কি মোর সাথে শুয়েছ। তা মোর সোয়ামী মারা যেতে এমন তো হতেও পারত। বয়েসটা চ্যাঙড়া হলে ঠেকত না—তাই না ? তা অমন কাণ্ড যে হয়নি, আমি খুশী। তাহলে তো পরে দু'জনেই পস্তাতাম।

হ্যাঁ, পস্তাতে হোত বই কি, এতিয়েঁ বললে।

এই তাদের শেষ কথা। কেজ থেমে আছে, অপেক্ষা করছে। মেয়ু-বৌয়ের উপর হুকুম—হয় কেজে ঢুকবে, নয় তো জরিমানা দেবে। ও এবার মন স্থির করলে, এতিয়েঁর হাত চেপে ধরল। এতিয়েঁ অভিভূত; এখনো ওর দিকে তাকিয়ে আছে। রোগা, হাড় জিরজিরে মানুষ, রক্তহীন মুখ, জট পাকানো চুলের রাশ নীল টুপির নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে। দেহখানা যেন অতি বিয়োনো মাদী জন্তুর মতো। ট্রাউজার আর কাঁচুলির নিচে বড়ই বেঢপ। শেষ-বারের মতো হাতে হাত মেলাল ওরা। এতিয়েঁ অনুভব করলে সাথীর নিঃশব্দ সহানুভূতি, ভালবাসা—আর এক নীরব প্রতিশ্রুতি। কি সে প্রতিশ্রুতি ? আবার যেদিন লড়াই শুরু হবে, এখানে সে টিকে থাকবে। মেয়ু-বৌয়ের চোখে সেই স্থির, অবিচল সংকল্পের দৃঢ়তা। তাহলে বিদায়, বিদায় সাথী ! আবার শীগ্গীরই দেখা হবে—সেইদিন ওরা হানবে শেষ আঘাত।

যত সব কুঁড়ের ধাড়ী ! আবার খেঁকিয়ে উঠল পিয়েরোঁ।

টবগাড়িতে কোনরকমে গিয়ে উঠে পড়ল মেয়ু-বৌ। সঙ্গে আরো চারজন। সংকেত-রজ্জু টানা হ'ল—এবার মাংসের আহুতি পড়বে। কেজ খুলে এল আঙটা থেকে, অন্ধকারে তলিয়ে গেল। এখন শুধু তারের ওঠা-নামা।

এতিয়েঁ এবার পিট থেকে বেরিয়ে পড়ল। স্ক্রীনিং শেডের নিচে দেখলে, একটা লোক কয়লার স্তূপে পা ছড়িয়ে বসে আছে। সে জাঁলিন। বড় কয়লা-গুলো বাছাই করাই ওর কাজ। হাঁটুর উপর তুলে নিয়েছে একটা কয়লার চাঙড়, হতুড়ির ঘা মেরে শ্লেটের গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলছে। সূক্ষ্ম গুঁড়োয় ডুবে গেছে—এযেন কয়লার বন্যা—যদি ছেলেটা নিজের বাঁদুরে মুখ-খানা না তুলে তাকাত—এতিয়েঁ তো ওকে চিনতেই পারত না। মুখ তুলতেই চেনা গেল—ঠিক তেমনি মুখ—কান বড় বড় আর কুঁতকুতে সবজে রঙের চোখ। সে ওকে দেখে হেসে উঠল। কয়লার চাঙড়ের উপর পড়ল ঘা। কালো ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল জাঁলিন।

বাইরে এসে ভাবনায় বিভোর হয়ে চলতে লাগল এতিয়েঁ। কত ভাবনা

মগজে গুনগুনানি তুলেছে। নির্মল বায়ুতে সে নিঃশ্বাস ফেলছে, উপরে তার উদার আকাশ। দিগন্তের মহিমায় সমুজ্জ্বল সূর্য উঠল। সারা অঞ্চলে আনন্দের সাড়া জাগছে। প্রান্তরের অসীম বিস্তারে সোনালী বন্যা পূব থেকে পশ্চিমে বয়ে যাচ্ছে। জীবনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে যৌবনের চঞ্চল স্পন্দনে। তারই ভিতরে ধ্বনিত হয়ে উঠছে মাটির দীর্ঘশ্বাস, পাখীর গান, বন আর নদীর ফিসফিসানি আর কলকল্লোল। বাঁচার মত কি জিনিস আছে! পুরানো পৃথিবী আবার বসন্তে বেঁচে উঠতে চায়। আর-এক বসন্ত সে টিকে থাকবে এই তার সাধ।

এতিয়ে'র মনেও সেই আশার ছোপ লাগল। শ্লথ হয়ে এল গতি। ডানে-বাঁয়ে চোখ্ চলে গেল—নতুন ঋতুর উৎসব সে দেখলে চোখ ভরে। নিজের কথা ভাবছে, বুকে নতুন বল; খনির নীচের অভিজ্ঞতায় সে মজবুত। তার শিক্ষা সাঙ্গ, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সে চলে যাচ্ছে, সে তো এখন বিপ্লবের সংগ্রামী প্রচারক। সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে—তাকে সে জানে চেনে আর ঘৃণা করে। আবার প্লুচার্তের সঙ্গে মিলবে এই তার আনন্দ। প্লুচার্তের মতোই সে হবে নেতা—তার কথা শুনবে মানুষ। সে মনে মনে বক্তৃতার মক্স শুরু করলে—কথার পর কথা গেঁথে চলল। কাজের ব্যাপক খসড়া করছে মনে মনে। মধ্যবিত্ত-সুলভ সংস্কৃতির সে ভাগীদার, তারই দৌলতে সে নিজের শ্রেণীর উপরে উঠে এসেছে। আর সেই জন্যেই মধ্যবিত্তের উপর তার এত ঘৃণা। সে অনুভব করলে—এই শ্রমিকদের মহিমা ঘোষণা করতে হবে। ওদের দারিদ্র্যের দুর্গন্ধ ওর নাকে গিয়ে লাগে, ওকে পীড়া দেয় বটে, কিন্তু তবু সে দেখাবে ওরা কত মহান, ওরা কত নিষ্পাপ—ওরাই দুনিয়ার একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়—একমাত্র শক্তির উৎস—মানবতা যেখানে অবগাহন করে শুদ্ধি হতে পারে। সে যেন নিজেকে দেখতে পাচ্ছে শাসকের আসনে—জনগণের বিজয়ে সে অংশ গ্রহণ করছে। জনগণ যদি তাকে গ্রাস না করে ফেলে তাহলে এ কামনা তো তার পূর্ণ হবে।

উপরে আকাশে একটা চাতক পাখী গান গেয়ে উঠল জোরে, এতিয়েঁ মুখ তুলে তাকালে। রাতের শেষ কুয়াশা মিলিয়ে গেল আকাশের নীলিমায়। সুভেরিন আর রাসেনারের আবছা মুখ দুখানি মনে পড়ল। যখন প্রতিটি মানুষ নিজের জন্য সর্বময় ক্ষমতা দাবি করে বসে, তখন তো সব নষ্ট হয়ে যায়। বিখ্যাত আন্তর্জাতিকের কর্তব্য ছিল পুরানো পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলা—কিন্তু তা তো হ'ল না। তার বদলে অন্তঃসংঘর্ষে এই বিরাট সেনা-বাহিনী টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। তাহলে কি ডারউইনই অভ্রান্ত? এ দুনিয়া কি এক রণাঙ্গণ—সেখানে কি সৌন্দর্য আর বংশগতি বজায় রাখার তাগিদে সবল দুর্বলকে গ্রাস করবে? এই প্রশ্ন তাকে বিব্রত করে তুলল। সে বিজ্ঞের মতোই তার সমাধানও খুঁজে পেল। এক ভাবধারা সমস্ত সন্দেহ নিঃশেষে মুছে দিলে, তাকে মুগ্ধ করে দিলে—যখন সে প্রথম বক্তৃতা করবে সে তো তার পুরানো মতবাদের মূল কথাটাই তুলে ধরবে তাদের কাছে। যদি কোন শ্রেণীকে গ্রাস করতে হয়, তাহলে এই প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ, নতুন মানুষের দল কেনই বা আলসে-বিলাসে উপভোগে ক্ষীণ মধ্যবিত্তশ্রেণীকে গ্রাস করবে না? নয়া সমাজ-ব্যবস্থায় নতুন মানুষ চাই। আর-এক দল বর্বর এসে হানা

দেবে, পুরানো দুনিয়ার ক্ষয়িষ্ণু জাতিগুলিকে দেবে নবজন্ম—তারই আশায় সে বসে আছে। আসন্ন বিপ্লবের প্রতি তার অটল বিশ্বাসও এর থেকেই সৃষ্টি। এবারে আসবে আসল বিপ্লব, তার আগুন এই যুগের ভস্মাবশেষকে জ্বালিয়ে দেবে। সে আগুন তো উদিত সূর্যের সোনালী আলো। দিগন্তে সে দেখতে পাচ্ছে সেই রক্তিম আভাস।

স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে চলতে লাগল, পাথর ঠুকতে ঠুকতে চলেছে লাঠি দিয়ে। এবার চারিদিকে তাকালে। জায়গাগুলো তার চেনা। ঐ যে আই-বুক্—ওখানে সে সেই হানার দিনে মিছিলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। আজ আবার শুরু হয়ে গেছে সেই বর্বর, মৃত্যুর শামিল শোষণ, সেই কম মজুরির কাজ। মাটির নীচে, সাতশো মিটারের তলায় সে যেন অবিরাম গাঁইতির চাপা শব্দ শুনতে পাচ্ছে। যারা এইমাত্র নিচে নেমে গেল, সেই কালো সাথীদের দল এখন ঘা মারছে নিঃশব্দ আক্রোশে। হ্যাঁ, হার ওদের হয়েছে বটে! সম্বল যা ছিল গেছে, বহু জীবনও নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তবু কি প্যারী ভুলতে পারবে লা-ভোরোর এই গুলীর ব্যাপার? সাংঘাতিক সে ক্ষত—সে তো আরাম হবে না—সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তি ঐ ক্ষত দিয়ে নিঃশেষে চুইয়ে পড়বে। এমন কি এই শিল্প সংকটও যদি দূর হয়, আবার একে একে কারখানাগুলোর দরজা খুলেও যায়, তাহলেও তো শান্তি ফিরে আসা অসম্ভব। ঘোষিত হয়েছে যুদ্ধ—শান্তি এখানে কোথায়! খনির গোলামের দল সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে, শক্তির পরীক্ষাও হয়ে গেছে; তাদের ন্যায়ের জিগিরে জেগে উঠেছে সারা ফ্রান্সের মজুরের দল। তাই তো বর্তমান এই পরাজয়ে কেউ খুশী হতে পারে নি, মঁতসুর বুর্জোয়ারা তো একেবারেই না। বিজয়ের আনন্দে মিশে গেছে ভীতির বিষ। ধর্মঘটের দিন ভোরবেলা এমনি অস্থিরতাই ওদের পেয়ে বসেছিল—আজও তা বজায় আছে। ওরা বারবার পেছনে ফিরে দেখছে, এই যে অশুভ নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল—ওখানেই বুঝি ওদের নিয়তি লুকিয়ে আছে। ওরা জানে, আবার নতুন করে জেগে উঠবে বিপ্লবী শক্তি—হয় তো কালই শুরু হয়ে যাবে সাধারণ ধর্মঘট। সব মজুরের ভিতরে সমঝোতা হয়ে যাবে। তাদের সংগ্রামী-তহবিল মাসের পর মাস ধরে প্রতিরোধের শক্তি যোগাবে, খাবার দেবে। পুরানো, ধ্বংসোন্মুখ সমাজ-ব্যবস্থা এবার চোট খেয়েছে, বুর্জোয়ারা টের পেয়েছে, তাদের পায়ের নীচের মাটিতে ধরেছে ফাটল। আরো আঘাত হানা হবে, আসবে ধাক্কার পর ধাক্কা—যতদিন না ঐ পুরানো প্রাকার চুরমার হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়, ততদিন এমনিধারা চলবে। লা-ভোরোর মতোই শেষে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অতলে তলিয়ে যাবে।

এতিয়েঁ বাঁ দিকে জয়সেল রোড ধরে চলল। মনে পড়ল এইখানেই সে মিছিলকে গাস্ত-মারির দিকে যেতে বাধা দিয়েছিল। ঝলমল করছে রোদ, বহু পিটের চোঙ দেখা যাচ্ছে। ডানে আছে মিরু, মাদলিন আর ক্রেভকুর তো পাশাপাশি। সব জায়গায় চলছে কাজ; মাটির গভীর থেকে উঠে আসছে গাঁইতির আঘাত। সে আঘাত এখন-বুঝি প্রান্তরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। ওর তো তাই মনে হয়। এই মাঠঘাট, পথ, গাঁ রোদে হাসছে, এরই নিচে একটার পর একটা পড়ছে হাতুড়ির ঘা। কয়লার কারায় বন্দী মানুষের দল পাথরের বিরাট চাপে দলিত-পিষ্ট হয়ে কাজ করছে। ওখানে

কি হচ্ছে কেউ কি বুঝতে পারে? বুঝতে হলে কান পেতে শুনতে হবে ওদের বেদনা-মথিত দীর্ঘশ্বাস। কানকে তার জন্যে তৈরি করতে হবে। কেন যেন মনে হ'ল, অহিংসায় হয়তো সাফল্য আসবে না। তার কাটা, লাইন উপড়ানো, বাতি ভাঙা—এসব তো বৃথা! তিন হাজার মানুষ ধ্বংসোন্মাদনায় মেতে ছুটোছুটি করলে কোন কাজই হবে না। এ তো বৃথা শক্তি ক্ষয়! মনে হয়, আইন সংগত উপায়েই একদিন ভয়ংকর হয়ে উঠবে। অন্ধ ঘৃণার পালা শেষ, অনেক বুনো জৈ ছড়ানো হয়েছে—এবার বুদ্ধি তার পরিণত হ'ল। হাঁ—মেয়ু-বৌ ঠিকই বলেছে! বুদ্ধি আছে তার। সেইদিন আসবে, যখন বৈধভাবেই ওরা জমায়েতে জড়ো হবে—ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে কাজ করবে। কি করছে তাও বুঝতে পারবে। তার পর এক প্রভাতে, নিজেদের শক্তির উদ্দীপনায় কোটি কোটি মজুর এসে দাঁড়াবে কয়েক হাজার বিলাসীর মুখোমুখী—নিজেদের হাতে ক্ষমতা তারা কেড়ে নেবে—তারা হবে মনিব—মালিক। আহা সে কেমন দিন! সত্য আর ন্যায়ের রাজ্যের উদ্বোধন হবে সেই দিন। আর কি হবে সেই ওত পেতে-থাকা, তৃপ্ত ভূরিভোজী ভয়ংকর দেবতার? সে তো গোপন গুহা-মন্দিরে লুকিয়ে আছে, সর্বহারারা মেদের ডালি দিয়ে সেই অদৃশ্য দেবতাকে তৃপ্ত করছে। সেদিন কি হবে তার? সে সেদিন পাবে চরম আঘাত, লুটিয়ে পড়বে দেবতা—মরে যাবে।

এতিয়েঁ এবার ভান্দাম রোড ছেড়ে সদর সড়কে এসে পড়ল। ডান দিকে মঁতসু মিশে গেছে উপত্যকায়। উল্টো দিকে লা-ভোরোর ধ্বংসাবশেষ। এক অভিশপ্ত গহ্বর এখন ঐ পিট, তিনটে পাম্প অবিরাম চলছে সেখানে। দিগন্তে আর-আর পিটগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ভিক্তার, সাঁ-তমাস-ফিউৎরি কাঁতেল। উত্তরে দেখা যায় ব্লাস্ট ফার্নেসের লম্বা চোঙের সার। কয়লার চুল্লি থেকে ধোঁয়া উগরে পড়ে ভোরাই হাওয়ায়। আটটার গাড়ি যদি ধরতে চায়, তাহলে তাকে তাড়াতাড়ি ছুটতে হবে। এখনো অনেকটা পথ।

সে চলল। তার পায়ের নীচে বাজছে গাঁইতি আর শাবলের আঘাত গভীর, উদ্ধত আঘাত। তার সাথীরা সবাই ওখানে। তার পায়ের শব্দ তারাও বুঝি শুনতে পাচ্ছে। এই যে বীটের ক্ষেত, এরই নীচে ঐ মেয়ু-বৌ না? নুয়ে পড়ে কাজ করছে, চাকা ঘোরাচ্ছে ভেন্টিলেটরের, ঘন ঘন পড়ছে নিঃশ্বাস। আর সেই নিঃশ্বাস বুঝি ভেসে এল ভেন্টিলেটরের ঘূর্ণায়। সত্যি, ও মেয়ু-বৌ না? ডানে-বায়ে-দূরে ঐ শস্যের আড়ালে, ঝোপে ঝাড়ে, গাছের তলায় ওর সাথীর দলকে যেন ও চিনতে পারছে। এপ্রিল মাসের সূর্য এখন আকাশে উঠে এসেছে—আপন মহিমায় সে আলো ছড়াচ্ছে। গর্ভবতী মাটিকে সে ঢেলে দিচ্ছে উত্তাপ। তারই উর্বর গর্ভকোষ থেকে জীবন গজিয়ে উঠছে। কুঁড়ি থেকে সবুজ পাতা ফেটে বেরুচ্ছে, আর প্রান্তর ছেয়ে ছেয়ে গেল সবুজ ঘাসে। চারিদিক বীজ স্ফীত হয়ে উঠছে, নিজেদের প্রসারিত করে দিচ্ছে, উত্তাপের তৃষ্ণায় প্রান্তরকে তো ফাটলে ফাটলে ভরে দিলে। ওদের চাই তাপ, চাই আলো। চারা গাছ মাটি ফুঁড়ে উঠছে ঝাঁকে ঝাঁকে—তাদের ফিসফিসানি শুনতে পাও। জীবনের বীজ দল মেলে দিচ্ছে চুমায় চুমায়। আর তার সাথীরা হানছে আঘাত, হানছে আঘাত। যেন ওরাও মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। এই তরুণ প্রভাতে, সূর্য ঢালছে অগ্নিকণা—সমস্ত অঞ্চল শব্দে

মুখরিত—, মানুষ জাগছে, সম্ভব হচ্ছে—মানুষের দল। ওরা তো এক প্রতিশোধে উন্মত্ত কৃষ্ণ বাহিনী, লাঙলের খাতে খাতে ওরা আস্তে আস্তে সম্ভূত হচ্ছে। আগামীর ফসল হিসেবেই ওরা গজিয়ে উঠছে। ওদের সম্ভাবনায় শীঘ্রই মাটি ফেটে যাবে, চৌচির হয়ে যাবে। ওলট-পালট হয়ে যাবে।